

পালকি



©Tarun Chakraborty; Palki Magazine; 2012

প্রারম্ভিক মুখব্যাদান'

পালকি সম্পাদকমণ্ডলী

পালকির প্রিয় সহযাত্রীরা,

আপনারা ইতিমধ্যে রীতিমত খড়াহস্ত হয়ে আছেন আমাদের উপর, তা বলাই বাহ্যিক। এটুকুই বলতে পারি, যে বিলম্বাধিকের সঙ্গে এমন কি আমাদের প্রচ্ছদের তরঙ্গীও ভারী বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। তাই আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি যাতে দ্রুতই বৃহত্তম এই পালকির ঘোড়শোপচারে গিয়ে পড়ে, তার জন্য দরকারি কথাটুকু বলে নিয়েই সম্পাদকীয়কে অলমিতি বিস্তারণ করে ফেলছি।

আপনাদের উৎসাহে ও আগ্রহে পালকিতে আগত লেখার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, যা খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু তার ফলে সীমিত লোকবল নিয়ে আমাদের একই গতি বজায় রাখা দুরস্থ হয়ে পড়ছে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, যে এবার থেকে পালকি আবার বছরে দু'বার প্রকাশিত হবে, বিগত বছরের তিনবারের তুলনায়। আর এবার অধিকমাত্রায় দেরি হয়ে পড়ায় আমরা ইতিমধ্যে আসা লেখাগুলিকে পরের বারের জন্য অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাইনি, তাই সব মিলিয়ে এই সংখ্যার কলেবর বেশরকম বৃদ্ধি পেয়েছে – আরো অনেক ভালো ভালো লেখা আর সুন্দর সুন্দর ছবি এবার আমরা সাজিয়ে দিতে পেরেছি, দীর্ঘ বিলম্বের এটুকু সাত্ত্বনা।

কিছু আনন্দ সংবাদ চট করে শুনিয়ে যাই –

পালকি ১০-য়ে প্রকাশিত পথিক গুহের সাক্ষাৎকারটি দেখে ‘কথা তো বলার জন্যই’ নামের একটি বাংলা ব্লগের কিছু উৎসাহী বন্ধু আগ্রহী হয়েছিলেন তাঁর আরেকটি সাক্ষাৎকার নিতে, যেটি হবে বিষয়ের দিক থেকে আমাদের আলোচনাটির চেয়ে অনেকটাই ভিন্নধর্মী। তাঁদের সাইটে^১ সুপাঠ্য সেই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে, পালকির পাঠকদেরও হয়ত ভালো লাগবে সেটি।

পালকির দীর্ঘদিনের লেখক-বন্ধু শ্রী অনিলগু সেন সম্প্রতি ‘আশানদী’ নামে তাঁর প্রথম বাংলা ছোটগল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন। তাতে পালকিতে প্রকাশিত ওনার কয়েকটি গল্পও স্থান পেয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

নানাবিধ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই পালকির বহুকালের সহযাত্রী ও মদতদাতা রোদুর, পিয়াস ও জ্যোতিক্ষকে। আর বরাবরের তুলনায় বেশ একটু অন্যরকম এই প্রচ্ছদটি এঁকে দেওয়ার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা শিল্পী শ্রী তরং চক্রবর্তীর প্রতি।

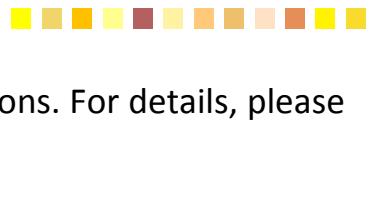
নিন, আর দেরী নয়, ওই এসে পড়ল আমাদের পালকি, হৃহম্ না, হৃহম্ না, হৃহম্ না রে হৃহম্ না...

আর হ্যাঁ, যেতে যেতে অবশ্যই মনে করিয়ে দিই, পালকি এখন ফেসবুক-এও, যেখানে আপনারা পালকি-সংক্রান্ত সব সংবাদ পেতে পারেন - www.facebook.com/palkimag

ওছোওছো

১ – ‘প্রারম্ভিক মুখব্যাদান’ শব্দটির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এবং শিক্ষাবিদ শ্রী তপন রায়চৌধুরী মহাশয়ের কাছে ('রোমস্তন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তির পরচরিতচর্চা', আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, আগস্ট ২০০৩, পৃঃ ১১)

২ – লেখাটি পাওয়া যাবে এইখানেঃ kothatobolarjonyei.blogspot.com/2011/09/pathik-guha.html



About Palki 13:

Palki 13 release date to be announced; we are now accepting submissions. For details, please check the Palki website.

Statutory Disclaimers:

- The views opinions and ideas expressed by the authors in their submissions are exclusively their own.
- The copyright of the submissions rests with the authors, while Palki assumes the first publishing rights. It is understood that authors have the necessary permissions for their use of copyrighted materials in their work.
- Submissions have been considered solely on the basis of their creative merit, not subject to any editorial censorship.
- However, the acceptance of any particular submission for publication in Palki does not constitute any express endorsement whatsoever of the author's viewpoints by Palki, calcuttans.com, calcuttaglobalchat.net or any of their family of websites.

Official Details for Palki 12

- Website Owner: Ankan Basu
- Joint Editors: Shrabanti Basu, Kaustubh Adhikari, Kausik Datta
- Email for Enquiry/submissions: palkisubmissions@gmail.com
- Rules for submissions: <http://calcuttans.com/palki/submissions>

সূচীপত্রঃ

সাক্ষাৎকার

Kaustubh Adhikari	কৌষ্টভ অধিকারী	অধ্যাপক ড্যানিয়েল ডেনেট-এর সাথে কথোপকথনে	1
গদ্য / বাংলা গল্প			
Abhishek Mukherjee	অভিষেক মুখার্জি	বাতিক	11
Amit Kumar Majhi	অমিত কুমার মাঝি	পোষ্য	18
Aniruddha Sen	অনিলগন্ধি সেন	প্রেম অবিনশ্চর	21
Binod Ghosal	বিনোদ ঘোষাল	বৈঁদে	24
Debashish Bhattacharya	দেবাশিস ভট্টাচার্য	কাশী'স্	26
Himadri Banerjee	হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়	একদিন হঠাত	30
Himadri Shekhar Dutta	হিমাদ্রী শেখর দত্ত	ই এম আই	38
Kaustubh Adhikari	কৌষ্টভ অধিকারী	জুড়ি	45
Musharraf Khan	মোশাররফ খান	বটবৃক্ষে তেলাপিয়া	49
Pratap Sen Chowdhury	প্রতাপ সেন চৌধুরী	সেই ছেলেটা	53
Santwana Chatterjee	সান্তুনা চট্টোপাধ্যায়	বেচারা	58
Saswati Bhattacharya	শাশ্বতী ভট্টাচার্য	চাঁদের হাট কিংবা গঙ্গাসাগর মেলা	64
Shakuntala Khan Bhaduri	শকুন্তলা খাঁ ভাদুড়ী	কোজাগরী	73
Subrata Mazumder	সুব্রত মজুমদার	তিলোত্তমা	76
Sugata Sanyal	সুগত সান্যাল	ইডেন গার্ডেন এবং ডাইনোসর	79
Sukti Dutta	শুক্তি দত্ত	বাকি কথা	85
Tapas Kiran Ray	তাপস কিরণ রায়	আলো-আঁধারি	89

বাংলা কবিতা

Abhik Das	অভীক দাস	সূতি	95
Akashleena	আকাশলীনা	আষাঢ়	96
Amit Kumar Majhi	অমিত কুমার মাঝি	বইছে	97
Arnab Chakraborty	অর্ণব চক্রবর্তী	দীর্ঘতার শেষে	98
Bandana Mitra	বন্দনা মিত্র	পাখি হওয়ার গল্প	99
Dipa Pan	দীপা পান	ডুবসাঁতার	100
Jyotishka Datta	জ্যোতিশ্ক দত্ত	কবিতা লেখার ইচ্ছে	101
Krishna Kumar Gupta	কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত	বিদ্যায়	102
Mayuri Bhattacharyya	ময়ূরী ভট্টাচার্য	অপারমিতা	103
		এক চিলতে	103
		বিমুখ	103
		মায়া	103
Ramit Dey	রমিত দে	এই আমি সরে দাঁড়ালাম	104
Ramprasad Kar	রামপ্রসাদ কর	কালো বিড়াল	105
Saikat Goswami	সৈকত গোস্বামী	পরীক্ষা শেষের ঘন্টা	106
Sambunath Karmakar	শঙ্কুনাথ কর্মকার	একান্ত অলকানন্দা	107
		স্পর্শ নিও	107

Sharabajaya Mukhopadhyay	সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়	নাড়ী	108
Shibakali Gupta	শিবকালী গুপ্ত	সমর্পিতা	109
Sudipta Biswas	সুদীপ্তি বিশ্বাস	শিল্পী শিব	110
Sumanta Pal	সুমন্ত পাল	কাঠের বাড়িতে, সুপ্রভাত	111
Swagata Tripathi	স্বাগতা ত্রিপাঠী	স্বগতেত্তি	112
Swati Mitra	স্বাতী মিত্র	কেউ কথা রাখে নি	113
Tapas Kiran Ray	তাপস কিরণ রায়	কবিতার পাঁজি লেখা?	114

Prose

Aniruddha Sen	Hope	115
Barnali Saha	A Time to Love	117
Ratan Lal Basu	The Cursed Idol	127

Poetry

Arunava Mukherjea	Translating Rabindranath	138
Indrajit Sensarma	Beautiful	139
Shoumika Ganguli	Finding Happiness	140
Sudipta Biswas	Oyster life	142

বাংলা প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী

Aroop Chaudhuri	অরূপ চৌধুরী	সুন্দরবনের ভূত	143
Indira Mukerjee	ইন্দিরা মুখার্জি	চেনা পথ, অচেনা কথা	147
Sabyasachi Mukhopadhyay	সব্যসাচি মুখোপাধ্যায়	পত্রের পাঁচালি	155

Essay/Article

Kumar Som	Space Travel for Last Fifty Years	158
Prabir Ghose	West Bengal in the throes of change	163

Photography

Abhik Das	অভীক দাস	Village Vignettes	164
Abhiruk Lahiri	অভীরুক লাহিড়ী	Mountain Vignettes	167
Chitralekha Sarkar	চিত্রলেখা সরকার	Earth Vignettes	170
Pablo	পাবলো	Human Vignettes	172
Parthasarathi Mitra	পার্থসারথি মিত্র	Random Vignettes	175
Pratap Sen Chowdhury	প্রতাপ সেন চৌধুরী	Seaside Vignettes	176
Sharabajaya Mukhopadhyay	সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়	Vital Vignettes	177
Tirthankar Ghosh	তীর্থঙ্কর ঘোষ	Random Vignettes	178

Artwork

Chitralekha Sarkar	চিত্রলেখা সরকার	Moonlight; boat	180
--------------------	-----------------	-----------------	-----

Kids

Debarchana Bhattacharya	দেবার্চনা ভট্টাচার্য	নীড় কলরব	181
Santwana Chatterjee	সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়	ঠাকুর যাবে বিসর্জন	182
Sudipta Biswas	সুদীপ্তি বিশ্বাস	মা তুই থাকবি কতক্ষণ মেঘের মেয়ে লোকাল ট্রেন পরীর দেশে	182 183 184 184

185
188
189

Sukti Dutta

শুক্তি দত্ত

শেষের সেই ডাক

Sourajit Mitra Mustafi

সৌরজিত মিত্র মুস্তফী

শেষের কবিতা

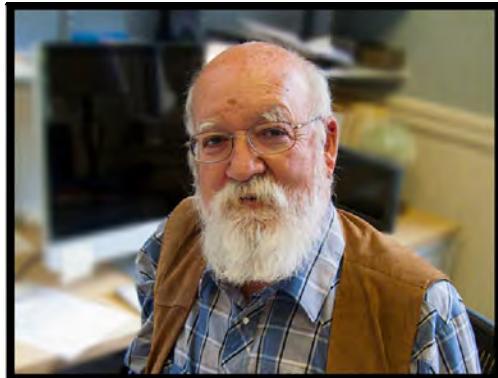
Recitation**Contributors**

Contributors to Palki 12

লেখক পরিচিতি

সাক্ষাৎকারঃ বিজ্ঞান-লেখক ও গবেষক ডঃ ড্যানিয়েল ডেনেট

পালকির তরফ থেকে – কৌন্তভ অধিকারী



পালকিতে এই প্রথম আমরা বাংলার বদলে ইংরাজি ভাষার কোনো লেখকের সাক্ষাৎকার পেয়েছি। তাই পাঠকেরা যাঁরা ডঃ ডেনেট-এর সম্পর্কে অবগত নন, তাঁদের জন্য জানাই, প্রফেসর ড্যানিয়েল ডেনেট বস্টন শহরস্থিত টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কগনিটিভ সাইন্স’ গবেষণাবিভাগের প্রধান, এবং একজন সুবিদিত বিজ্ঞান-লেখক। বিবর্তনের উপর ‘ডারউইন’-স ডেঙ্গুরাস আইডিয়া’ (১৯৯৫) বইটি লিখে ইনি প্রচুর জনপ্রিয়তা পান। আর এনার সর্বাধিক ‘বিতর্কিত’ বইটি হল ‘ব্রেকিং দা স্পেল – রিলিজিয়ন অ্যাজ এ ন্যাচারাল ফেনোমেন’ (২০০৬), যাকে আধুনিক নাত্তিকতা-চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বলে মনে করা হয়, এবং যা লিখে ইনি ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স, আমেরিকান সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচেস, ও আমেরিকান নিউরোসাইন্স গবেষক স্যাম হ্যারিসের সাথে ‘ফোর হর্সমেন অফ নিউ এথেইজম’ বলে খ্যাতি পান। খুব সম্প্রতি ইনি তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে ‘ইনসাইড জোকস: ইউজিং হিউমার টু রিভার্স-ইঞ্জিনিয়ার দা মাইন্ড’ (২০১১) বলে আরেকটি বই প্রকাশ করেছেন।

অতএব এনার সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ পেয়ে একটি ‘বিগ ফিশ’-কে ধরার আনন্দই পেয়েছি বলা চলে। আর এই বিশালদেহী শ্বেতশুশ্রুত অমায়িক ভদ্রলোক যে কেবল নির্ধারিত আধিঘন্টার বদলে আমায় প্রায় ঘন্টাখানেক প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়েছিলেন তাই-ই নয়, সানন্দে একটি বইতে অটোগ্রাফ করে দেন, ওনার সেক্রেটোরিকে বলে ওনার সঙ্গে একটা ছবি তুলিয়ে দেন, এবং আসার সময় ‘অগ্রণী যুক্তিবাদী’ দের একটি পোস্টারও উপহার দিয়েছিলেন।

প্রথমেই প্রশ্ন করি, আপনি কি কখনও ভারতে গিয়েছেন?

না, আমি যাইনি! সত্যি বলতে, ওটাই একমাত্র প্রধান দেশ যেখানে আমার যাওয়া হয়নি।

তাহলে আশা করব, ভবিষ্যতে কখনও নিশ্চয়ই যাবেন...

আমিও তাই আশা রাখি! মুশকিল হল, দু-তিনদিনের ঝটিকাসফর আমি করতে চাই না; ওখানে গেলে হাতে কিছু সময় নিয়ে ঘুরতে চাই, কিন্তু জানেনই তো, মাসখানেক সময় বের করা খুবই কঠিন...

আপনি কী ছেট থেকেই নাত্তিক ছিলেন?

ছেটবেলায় আমিও গির্জার ‘সানডে স্কুল’-এ যেতাম অন্য অনেকের মতই। আমার পরিবার তেমন একটা ধার্মিক ছিল না – আমার মা আমাদের সঙ্গে চার্চে যেতেন না, তিনি অন্য একটা চার্চে যেতেন যার পাদ্রীর কথা তাঁর বেশি ভালো লাগত। তাই বলতে গেলে আমি প্রথাগত প্রোটেস্ট্যান্ট শিক্ষাই পেয়েছি, বাইবেল পড়েছি, চার্চের কয়ারে গেয়েছি... কিশোরবয়সে অন্য অনেকের মতই ধর্মে বেশ আগ্রহী ছিলাম খানিকটা সময়। কিন্তু একসময় আমার মনে হল, ‘এসব কিছুই তো আসলে আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না!’

তা এক সাধারণ অবিশ্বাসী থেকে কখন আপনি একজন প্রকাশ্য, সরব নাত্তিক হয়ে উঠলেন?

তুলনায় সম্প্রতি। মনে হয় এটা আমেরিকার ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান আপত্তিকর কাজকর্মের জন্য, বিশেষত তাদের বাড়তে থাকা রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে। সেটাই আমাকে নাড়া দেয়, এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে আমার যে চুপ করে বসে থাকা উচিত নয় তা মনে করিয়ে দেয়।

এর সূত্রপাত এইভাবে – নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় আমি একটা উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলাম, ‘আইটস’-দের উপর।

রিচার্ড ডকিন্স আমাকে এই ‘ব্রাইটস’ ধারণাটার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটা লেখা দিয়েছিলেন এ বিষয়ে, আর আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়। লেখাটা প্রকাশিত হয়েছিল জুলাই ২০০৩-এ, আর সেটা অভাবনীয় সাড়া পায়। আমি সারা দেশ থেকে শয়ে শয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া পাই। তাঁদের অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, একবার যখন এই বিষয়টা ধরেছি, তখন এখানেই যেন থেমে না যাই।

নাস্তিকতার উপর একটা বই লিখব, এমন কখনই ভাবিনি। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে প্রায়শই ভাবনাচিন্তা করতাম বলে, একটা বই লেখার ইচ্ছা হয়েছিল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন আর ধর্মকে একটা সাধারণ, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখিয়ে। তখনই ‘ব্রেকিং দা স্পেল’ লেখায় মনস্তির করি।

এক অর্থে সেটা আমার মূল ‘কগনিটিভ সাইন্স’ গবেষণার থেকে অনেকটাই ঘুরপথ। তাই আমার গবেষণার জ্ঞানকে আমি ওই পরিপ্রেক্ষিতে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। তাও, এ নিয়ে আমাকে অনেকটা দূর চলে আসতে হয়। এতে আমার কোনো ক্ষেত্র নেই, তবে আমি আমার মূল বিষয়, মনস্তির সচেতনতার তত্ত্ব, নিয়ে কাজের মধ্যে ফেরত আসার চেষ্টা করছি।

খ্যাতিমান নাস্তিক-যুক্তিবাদীদের প্রায় সবারই নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে, সেখানে তাঁরা ব্রগও লিখে থাকেন। আপনি মাঝেসাবে সংবাদপত্রে কিছু উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেও, এই নিয়ে আপনার তেমন কোনো সাইট তো নেই?

তা ঠিক। কিন্তু যদি তেমন কিছু করতাম, তাহলে আমার কাজের পিছনে আরো কম সময় দিতে পারতাম! রিচার্ড ডকিন্স অবসর নিয়ে নিয়েছেন, হিচেন্স তো একজন সাংবাদিকই, লেখালিখি তাঁর পেশা, আর স্যাম হ্যারিস বয়সে তরুণ, তার উৎসাহ অনেক বেশি, আর তাই সে তার নিউরোসাইন্স কাজের পাশাপাশি এসবে অনেকটাই সময় দেয়। এদের পক্ষে এতে সময় দেওয়া সম্ভব, কিন্তু আমার হাতে অনেকগুলো প্রজেক্ট...

তবে একেবারেই সম্পর্কবিযুক্ত আছি, তা নয়। লিন্ডা লাক্সোলা’র সাথে আমরা যে প্রজেক্টটা করছি, অবিশ্বাসী হয়ে পড়া পাদ্রীদের সাথে বিশদ গোপনীয় ইন্টারভিউ নিয়ে, সেটা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তার পিছনে আমায় অনেকটাই সময় দিতে হয়! আর এই কাজটার সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

তাহলে ওই বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক। পরিসংখ্যানের ছাত্র হিসাবে একটা প্রশ্ন করি। এই নিয়ে প্রথম প্রবন্ধটি আসে ২০১০ সালে, যেখানে আপনারা বলেছিলেন যে এই অবঙ্গ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এমন অনেকেই আছেন সারা দেশ জুড়েই, তবে ঠিক কতজন, সে বিষয়ে কোনো এস্টিমেট আমাদের হাতে নেই। তা প্রজেক্ট যখন আরো অনেকদূর এগিয়েছে বলছেন, ওই বিষয়ে কোনো আন্দাজ পাওয়া গেছে?

আমরা এই কাজের দ্বিতীয় স্তর প্রায় শেষ করে এনেছি। লিন্ডা আরো অনেক লোকের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন, আমরা আমাদের জ্ঞান আরো অনেকটাই বাড়াতে পেরেছি। এখনও অবশ্য কিছু কিছু অংশ আছে যাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব হয়নি – অনেক প্রটেস্ট্যান্টদের পেলেও তেমন বেশি ক্যাথলিকদের পাইনি, অবশ্য কিছু মরমন পেয়েছি। আমরা কোনো ‘ইমাম’কে পাইনি – সহজবোধ্য কারণেই কোনো মুসলিম নেই আমাদের প্রজেক্টে – অমন যে কেউ তাদের মধ্যে নেই তা নয়, কিন্তু তা স্বীকার করতে গেলে তো তাদের প্রাণসংশয় হয়ে পড়বে।

আর এখনও অবধি ফলাফল খুবই উৎসাহজনক। লিন্ডার রিপোর্ট লেখা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। আমাদের কাছে এখনও মোট সংখ্যার কোনো এস্টিমেট নেই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে এমন লোক মুষ্টিমেয় নয় – যে সব চার্চের পদাধিকারী লোকজন এই প্রজেক্টের সমালোচনা করেছে, তারা কিন্তু কেউই বলে নি, ‘না না,

এ সব বানানো কথা, দুয়েকজনের ব্যাপারকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করা...” – তারাও সবাই জানে যে এরকম প্রায়ই ঘটে।

তৃতীয় স্তরে হয়ত আমরা কোনো ন্যাশনাল সার্ভের পরিকল্পনা করব, যাতে কিছু এস্টিমেট পাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।

দ্বিতীয় স্তরে কতজন লোককে পেয়েছেন?

পাকা সংখ্যাটা মনে নেই, তবে প্রাথমিক স্তরে যত জনকে পেয়েছিলাম তার দ্বিগুণেরও বেশি।

আর এর থেকে দ্বিতীয় একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে যার সঙ্গে আমি সরাসরি জড়িত নই – কারণ তা সম্ভব নয় – সেটার নাম ‘দ্য ক্লার্জি প্রজেক্ট’; আর আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তার ওয়েবসাইটও চালু করে দেওয়া হবে। এটা স্বত্ত্বে সুরক্ষিত করা একটা ওয়েবসাইট, যেখানে প্রাক্তন এবং বর্তমান পাদ্বীরা এসে এই বিষয়ে নিরাপদে আলোচনা চালাতে পারবেন, যাঁরা দোটানার মধ্যে আছেন তাঁদের সাহায্য করতে পারবেন। এবং তাই জন্যেই, আমার মত লোক সেটায় অ্যাকসেস পাবে না।

এটা সীমিত লোকেদের মধ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে চলছে ইতিমধ্যেই, ওই পাদ্বীরাই চালাচ্ছেন। লিঙ্গা এটা তৈরি করতে অনেক সাহায্য করেছেন, কিন্তু আমার মতই তাঁরও সরাসরি অ্যাকসেস নেই, যেহেতু উনি পাদ্বী নন। এটা তৈরি করতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রিচার্ড ডকিন্স ফাউণ্ডেশন, আমিও কিছু সাহায্য করেছি। সব মিলিয়ে পাবলিক সাইট চালু হয়ে যাবে শিগগিরই।

কোনো অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, যেমন প্যাট কন্ডেল-এর ইউটিউব ভিডিও চ্যানেল, এঁদের কাজ দেখেন কি কখনও?

ইমেলের পিছনেই আমার অনেকটা করে সময় চলে যায়! আর আমি ইন্টারনেট-চারী তেমন একটা নই। আমার দুর্দান্ত কিছু সংবাদপ্রেরক আছেন যাঁরা আমাকে বাছা বাছা কিছু জিনিস পাঠান, আর আমি তাঁদের বিচারবুদ্ধির উপরেই ভরসা রাখি। তার উপরে যদি আমি নিজে থেকে নেটে গিয়ে খোঁজখবর করতাম, তাহলে অনেকটা সময় নষ্ট হত, আর ‘ডিমিনিশিং রিটার্ন’ এর ফলে বেশি তেমন একটা লাভও হত না।

ধর্মকে ব্যবচ্ছেদ করে বই লেখার পর কি আপনি কোনো হৃকি-ধর্মকি পেয়েছেন?

বইটা বেরোনোর আগে অনেকেই আমাকে বলেছিল যে আমি অনেক হৃকি পাব, আমার বিপদের আশঙ্কা হবে। আমিও জানতাম যে তা হতে পারে, তাই আমরা ভেবেচিন্তে কিছু প্রাথমিক সতর্কতা রেখেছিলাম। আর আমার একটা ফাইল আছে, যাতে বেছে বেছে ‘হেট-মেল’গুলো রাখা থাকে। তবে খুব বড় কোনো ব্যাপার কিন্তু হ্যানি বলতে গেলে।

কীরকম সতর্কতা নিয়েছিলেন?

প্রথমদিকে যতটা নিয়েছিলাম, এখন আর ততটা নিই না। আমার সফরসূচি আমার ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে না। আমি যেখানে যাচ্ছি তারা আমার বক্তৃতার কথা বিজ্ঞাপিত করতে পারে, কিন্তু কোথায় কবে যাচ্ছি এমন কোনো তালিকা আমি দিই না। তাই কেউ আমাকে ধাওয়া করতে গেলে তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এখন অবশ্য সফরসূচি সাইটে দেওয়ার কথা ভাবছি।

১ – এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ৫ই অক্টোবর। ওই মাসেরই ৭ তারিখ এই প্রজেক্টের ওয়েবসাইট প্রকাশ্যে আসে, www.clergyproject.org ঠিকানায়।

সক্রিয় নাস্তিকদের ‘জঙ্গি নাস্তিক’ আখ্যা দেওয়া সম্পর্কে আপনার কী মত?

যদি আপনি দুনিয়ায় কোনো ভালো কাজ করতে চান, কোনো প্রভাব রাখতে চান, যদি অনাদৃত কোনো বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, তাহলে আপনি যাদের নজর টানতে সক্ষম হবেন তাদের অনেকে তো প্রতিক্রিয়া দেখাবেই – ভালো বা খারাপ প্রতিক্রিয়া – আর যারা খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে তারা তো আপনার নিন্দা, সমালোচনা, চরিত্রহন্ত করার চেষ্টা করবেই।

তাই আমি এতে অবাক হইনি মোটেই। বরং, আমি উৎসাহ পেয়েছি এই দেখে যে, আমরা ‘চার ঘোড়সওয়ার’ হয়ত মোট পাঁচ-ছটা বই লিখেছি, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অগুষ্ঠি বই লেখা হয়ে গেছে! সেগুলোর প্রত্যেকটাই অবশ্য ফালতু, প্রত্যুত্তরের যোগ্যও নয়। কিন্তু এতগুলো বই যে তাদের লিখতে হয়েছে, আমাদের কাজকে যে তাদের একটা বড়সড় সমস্যা বলে মনে হয়েছে, সেটাই বোঝাচ্ছে যে আমরা কোথাও একটা খোঁচা দিতে পেরেছি বটে। আর তাদের এই রক্ষণাত্মক অবস্থানের খুঁতগুলো ধরিয়ে দেওয়ার কাজটা খুবই মজাদার।

প্রথমে ভেবেছিলাম, এটাকে ‘যিশুর জন্য মিথ্যাচার’ নাম দেব। কিন্তু তারপর একটা শব্দ মনে এল যেটা আমার বেশি পছন্দ – ‘ফেইথ-ফিবিং’ বা ‘বিশ্বাসনির্ভর মনগড়া প্রাচার’, কারণ ‘তুমি মনগড়া কথা বলছ’ বলাটা ‘তুমি মিথ্যা বলছ’র মত কড়া অভিযোগ নয়। আমি এর নানারকম নমুনার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা শুরু করি, আর অস্তত একজনের প্রকাশ্য সমর্থন পেয়েছি এই বলে যে, ‘হ্যাঁ, ও ঠিকই বলছে, আমি বিশ্বাসনির্ভর মনগড়া কথাই বলতাম, আমি দুঃখিত।’

এটা একটা প্রচলিত অভ্যাস – তারা তথ্যবিকৃতির ইচ্ছা দমন করতে পারে না, তাই তারা মনগড়া কথা বলে ভ্রান্তি ছড়ায়। আর তখন যেটা করণীয়, সেটা খুব সহজ – স্বেফ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাও, ‘দেখেছ, এদের তথ্যবিকৃতির কেমন অদম্য ইচ্ছা? কেন এরা সরল সত্যটা বলতে পারে না?’

‘ফোর হ্রস্মেন অফ নিউ এথেইজম’ কথাটা কে প্রচলন করেন?

সেটা ঠিক জানি না। তবে কথাটা আমাদের বেশ মনে ধরেছিল।

বাইবেলে মূল কথাটা ছিল ‘ফোর হ্রস্মেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্স’, যারা ধ্বংস, মৃত্যু ইত্যাদির বার্তা বহন করে। এমন খারাপ ইঙ্গিতবাহী কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে আপনার আপন্তি নেই?

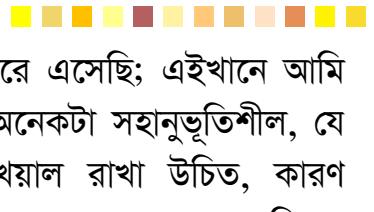
আমার মতে, ব্যাপারটার মধ্যে খারাপ এটাই যে, এতে মাত্র চারজনের জায়গা হয়! আরো অনেক দারুণ যুক্তিবাদী মুক্তিচিন্তক লোকজন আছেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ হয়ত এই স্বীকৃতিটা না পেয়ে ক্ষুরুই হয়েছেন। সেটা অবশ্যই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, সেটা এই নামের দুর্ভাগ্যজনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তাই এই প্রসঙ্গ উঠে এলেই আমি চেষ্টা করি তাঁদের সবাইকেই স্বীকৃতি দিতে, যাঁরা আমাদের মতই কাজ করে চলেছেন, কিন্তু খ্যাতিটা পাননি।

তাহলে এই চারজনের তালিকায় আরো কিছু নাম ঢেকাতে পারলে আপনি কাদের রাখতেন?

আমি ঠিক সেটা করতে চাই না – নতুন যদি এই তিনজনের নাম দিই, তাহলে অন্য তিনজন চটে যাবেন!

আচ্ছা, আপনাদের চারজনের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো কী, বলতে পারেন?

আমরা চারজন আলাদা ধাঁচের কাজ করি, যার প্রতিটাই করা দরকার। ডকিন্স ধর্মের চূড়ান্ত হাস্যকর, অবাস্তর রূপটা তুলে ধরেন চমৎকার ভাবে। হিচেন্স ধর্ম কর্তা ক্ষতিকর হতে পারে সেইটা বোঝাতে দক্ষ। আর স্যামের কাজটাও মোটামুটি হিচেন্সের মতনই।



আর আমি? সচরাচর আমি ‘ব্যাড কপ’ বা দুষ্টু লোকের ভূমিকাটা পালন করে এসেছি; এইখানে আমি ‘গুড কপ’ বা ভালো লোকের ভূমিকাটা পালনের সুযোগ পাই। আমি এই বিষয়ে অনেকটা সহানুভূতিশীল, যে ধর্ম মানুষের খানিকটা উপকার করারও ক্ষমতা রাখে, এবং আমাদের সেটা খেয়াল রাখা উচিত, কারণ আমাদের একটা ধর্ম-সম্পর্কহীন বিকল্প পথ খোঁজা উচিত সেই ভালো কাজগুলো করার জন্য। ক্ষতিকর দিকগুলোর সম্পর্কে আমি ওদের সঙ্গে সহমত অবশ্যই। আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, যে এটা একটা মিশ্র ঘটনা, এবং ভালো দিকগুলোর প্রতিও আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

যদি ভেবে দেখেন যে ধর্ম একটা প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ঘটনা, তাহলে দেখতে পাবেন যে এমন আরো অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা আছে যার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। এই ধরন বন্যা। বন্যায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়, আবার তার উপকারী দিকও আছে। কেউ যদি ছোটবেলায় বড় বেশি পরিষ্কার থাকে তবে তার অপ্পেতেই অসুখে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। তাই আমাদের এটা স্বীকার করা উচিত, যে অনেক সময় ধর্ম অনেক মানুষেরই সাহায্যে আসে। অনেকটা ওষুধের মত – কড়া ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কড়া হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে কড়া ওষুধই প্রয়োজন।

হ্ম, এরকম কথা একজন ‘নাস্তিকতার ঘোড়সওয়ার’-এর মুখে চমকপ্রদই বটে!

এটাও ওই ‘বিশ্বাসনির্ভর মনগড়া প্রচার’-এরই অঙ্গ – তারা যখন আমাদের সমন্বে লেখে, তখন তারা বলে, আমরা কতটা নির্দয়, আক্রমণাত্মক, আমরা কেমন ধর্ম ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হয়ে আছি – আর তারা ডকিঙ্গের লেখা থেকে একটা উদ্ধৃতি দেয়, হিচেসের থেকে একটা, আর হ্যারিসের থেকে একটা, কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে যায়, কারণ আমি তেমন কিছু বলিই নি!

তারা আমাকে উহ্য রাখে, কারণ তাদের চোখে নিন্দনীয় তেমন কড়া কোনো কথা আমি বলি না। তবে তাদের জন্য বলে রাখি, বাকিদের সমালোচনাগুলোর সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ সহমত।

আমেরিকা, যাকে মোটামুটি নাস্তিকতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু বলা চলে, সেখানে ‘নাস্তিকতা’ শব্দটা সবার কাছেই পরিচিত, এবং সবাই জানে যে সমাজে নাস্তিকেরাও রয়েছে, কিন্তু নাস্তিকতার ধারণাটা তেমনভাবে সর্বজনগ্রাহ্যতা পায়নি, যেমন ১৯৮০-৯০’-এর দশকে সমকামিতাকে পরিচিতি দেওয়ার জন্য একটা বড় প্রয়াস হয়েছিল। ২০১১ সালের একটা টেলিফোন-ভিত্তিক ‘গ্যালাপ’ সার্ভের ফলাফল দেখছিলাম, যেখানে বলছে, মাত্র ৫০% আমেরিকান কোনো নাস্তিককে তাদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মেনে নিতে রাজি। অন্যদিকে প্রায় ৭০ শতাংশের কোনো সমকামীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে আপত্তি নেই। মরমন ইত্যাদি তুলনায় অল্পখ্যাত ধর্মীয় দলগুলোরও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। নাস্তিকতার ধারণায় সেই জোরটা আসছে না কেন?

হ্যাঁ, সে জন্যই ‘ব্রাইটস’ ধারণাটা একটা সচেতনতা-আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল, যাতে নাস্তিক, মানবতাবাদী, যুক্তিবাদীরা একটা ভালো ইঙ্গিতপূর্ণ নাম পায়। আমার মনে হয়, এটা একটা খুব বুদ্ধিমান প্রস্তাব ছিল, যদিও তেমন সফলতা পায় নি। ভবিষ্যতে হয়ত বা পাবে।

আগে ‘সমকামী’ শব্দটা যেমন অবাঞ্ছিত ছিল অনেক আমেরিকানের কাছে, এখন নাস্তিক শব্দটাও অনেকটা তেমন। সমকামী আন্দোলনে ‘গে’র মত ভালো অর্থের একটা শব্দকে গ্রহণ করার আইডিয়াটা দারুণ ছিল। ‘ব্রাইট’ শব্দটাও তেমন হতে পারত।

তবে যদি অতটা এখন না-ও হয়ে থাকে, আমরা খানিকটা সফলতা অবশ্যই পেয়েছি – আমরা নাস্তিকতার ধারণাটাকে একটা গোপনীয় অবস্থান থেকে বের করে পরিচিত করে তুলেছি, অনেকটা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। এখন অনেকেই প্রকাশে ‘আমি নাস্তিক’ কথাটা বলছে। আবার অনেকেই ভাবছে, এর

মধ্যে কিছুটা ভালো জিনিস থাকলেও থাকতে পারে। আমার মনে হয়, এটা সবাইকে জানানো দরকার যে, তাদের চারিপাশেই এমন অনেক ভালো মানুষ আছে যারা নাস্তিক। এতে সেলেব্রিটি নাস্তিকরা একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। আর এসবে গোঁড়া মানুষেরা যে উভ্যক্ত হন, এটা একটা ভালো লক্ষণই।

এই বিষয়ে একটা ‘নব্য নাস্তিক’ বনাম ‘নরম নাস্তিক’ বিতর্ক চলে, যাতে অনেকে বলেন যে আজকালকার নাস্তিকেরা বড় ‘চরমপন্থী’ হয়ে উঠছে। এই দুই দলকে কীভাবে একসাথে কাজ করার জন্য মেলানো যায়?

তা জানি না। তবে মনে হয়, অনেকগুলো জিনিস হওয়া দরকার। আমাদের একটা শান্ত, ধীর, স্থির, অবিচ্ছিন্ন, সরল সত্য প্রচার করে যাওয়া দরকার, যে প্রচলিত ধর্মগুলো কতটা হাস্যকর, অর্থহীন, প্রাচীনতম আমলের ধ্যানধারণা, যেগুলো ছেড়ে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার।

আর এইটাও ধার্মিকদের – অনেক ধর্মাচারী নাস্তিকও কিন্তু আছেন – জোর দিয়ে বলা দরকার, যে তাঁরা যতই তাঁদের আচরিত ধর্মকে নিরীহ মনে করুন, ধর্মের একটা বেশ ক্ষতিকর প্রভাব আছে।

ত্রিতীশ লেখক জন গ্রে সম্প্রতি একটা লেখা লেখেন, যার নাম ‘বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখা’ (বিলীভিং ইন বিলীফ), যেটা মনে হয় আমার ‘ব্রেকিং দা স্পেল’ বইটার ‘বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস’ (বিলীফ ইন বিলীফ) অধ্যায়টা থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু, মজার ব্যাপার, সেখানে তিনি বলছেন, “এটাই প্রথাগত ধর্মের সমস্যা, সেটা মূলত ‘বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখা’, কিন্তু ধর্ম আসলে তা নয়।” এক অর্থে উনি ঠিকই বলছেন, আর সেটাই ছিল আমারও বক্তব্য। কিন্তু উনি যেটায় পরোক্ষ সমর্থন দিচ্ছেন, সেটা হল একটা প্রথাগত ভঙ্গামি – “দেখো বন্ধুরা, আমরা আসলে বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখি না, কিন্তু অমন একটা ভান করি কেবল।”

আর সেটাই আমরা ওই প্রজেক্টটায় দেখছি। ডাক্তারিতে যেমন শপথ নিতে হয়, ‘প্রথমত, রোগীর কোনো ক্ষতি কোরো না’, তেমনই ধর্মে মূল কথাটা হল, ‘যারা পবিত্র বইয়ের কথাগুলোকে একদম আক্ষরিক অর্থে নেয়, সেই সরলমতি প্রাচীনপন্থী ভাবনার ভক্তদের বিশ্বাসকেও কিন্তু কখনও খাটো করে দেখো না, আর তাই প্রচার-বেদীতে দাঁড়িয়ে কখনও এমন কিছু বোলো না যা তেমন কাউকে আহত করে।’ এ বিষয়ে আমরা প্রায় সরাসরি উদ্বৃত্তিই পেয়েছি। আর তাই ধর্মপ্রচারকেরা একধরনের দ্বিচারিতা করে চলেন – যারা সরল বিশ্বাসে চলে, তাদের কাছে তাঁরা দারুণ বিশ্বাসী হিসাবেই অবতীর্ণ হন, কিন্তু উদারপন্থী শ্রোতারা বুঝে নেন যে যা বলা হচ্ছে সেগুলো আসলে রূপক। আর তাঁদের এতে আপত্তি থাকে না, যেহেতু তাঁরা তুলনায় বেশি আধুনিকমনক্ষ, তাঁরা সহজেই বুঝে নেন যে এসব রূপক।

কিন্তু তাঁরা কেউই এ নিয়ে কথা বলেন না। আমি তাঁদের কথা বলাতে চাই। আমি এই দ্বিচারিতা নিয়ে সবাইকে সচেতন করতে চাই। আর তার অর্থ, ওই জন গ্রে-র মত লোকেরা আমার সুবিধাই করে দিচ্ছেন। তাই আমি বলতে চাই, “শুনুন, শুনুন! আপনার পাদ্রীকেই সাহস করে জিজ্ঞেস করে দেখুন না? কারণ কেউ তো নিজে থেকেই বেদীর উপর একটা বড় পোস্টার টাঙ্গিয়ে রাখবেন না, যে ‘এসব রূপক!’” কেন নয়? তাঁরা যদি নিজের মনে এমনটাই ভেবে থাকেন, তাহলে প্রকাশ্যেই স্বীকার করুন না!

কর্মরত পাদ্রীদের আসলে শৌখিন, ফ্যান্সি তত্ত্বের জন্য সময় নেই। আর ওইসব ধর্মতাত্ত্বিকেরা আসলে একরকম নাস্তিকই – যে তাত্ত্বিক ঈশ্বর তাঁদের ধারণায় আছে, সেটা প্রচলিত বিশ্বাসীর ঈশ্বরভাবনার থেকে বহু দূর।

ভারতে আমাদের যে মুখ্যত হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি, সেখানে অনেক মানুষই যে ধর্মের পথে ভাবনাচিন্তা করেন বা নানারকম আচার-প্রথা পালন করেন এমন নয়, কিন্তু যারা করে তাদের ভালো চোখে দেখেন, সম্মান করেন – তাঁরা মনে করেন, মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন আছে, এবং তাঁদের সেই প্রয়োজনকে সম্মান দেওয়া উচিত।

এই ধারণাটাকে প্রকাশ করার জন্য একটা ভালো নাম খুঁজছিলাম অনেকদিন ধরে। আপনার বইতে ‘বিশ্বাসে বিশ্বাস করা’ কথাটা পেয়ে তাই খুব আনন্দ হয়েছিল।

হ্যাঁ, এমনটা অনেকেই করে। আমার মনে হয়, এই আচরণটার প্রতি লোকের নজর কাঢ়া দরকার ছিল, ব্যাপারটার একটা নাম দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

এটা অনেক যুক্তিবাদীরাই বলেন, যে শিশুরা তো নাস্তিক, ঈশ্বরভাবনাহীন হয়েই জন্মায়, আর ধর্মের বোঝা চাপিয়ে না দিলে নাস্তিক হিসাবেই বেড়ে উঠত...

যদিও ঠিক ওই কথাটা আমি বলি না, তবে আমিও বলি যে তাদের উপর ধর্মটাকে চাপিয়ে দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক-প্রক্ষালন করে ফেলা উচিত না। তাদেরকে সহজাত চিন্তা-ভাবনা-প্রশ্ন-সন্দেহ নিয়ে বেড়ে উঠতে দাও, নিজেরা বুঝেশুনে যদি তারা নাস্তিক হয় তো হবে, ধার্মিক হলে তাই, কিন্তু সবরকম পথ তো তাদের সামনে খোলা থাকবে।

এই বিষয়ে, আপনি কগনিটিভ সাইন্সের গবেষক বলে, একটা প্রশ্ন করি। গবেষণায় তো দেখা গেছে, শিশুরা যেহেতু খুবই সৃষ্টিশীল এবং কল্পনাপ্রবণ, তারা নিজীব বস্তুতেও প্রায়ই মানবিক গুণাবলী কল্পনা করে নেয়, এবং অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা, যার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা আছে কিন্তু তা শিশুদের ধারণার বাইরে, এমন ঘটনার পেছনে কোনো শক্তি বা ব্যক্তির হাত রয়েছে বলে মনে করে নেয়। সেক্ষেত্রে, এমন কি হতে পারে না, যে তাদের ওই কাল্পনিক ব্যক্তিই তাদের একরকম ঈশ্বরচেতনা?



এই প্রসঙ্গে সেদিন পাওয়া একটা কার্টুনের কথা মনে পড়ে গেল – একটা বাচ্চা তার মায়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছে, আর পাশে একজন ভদ্রমহিলা, যার গলায় যিশুর লকেট, আর পরনে একটা টি-শার্ট, যাতে লেখা, ‘আমি ওনার সাথে আছি’। তা দেখে বাচ্চাটা জিজ্ঞেস করছে, ‘তোমার কি আর এখনও কাল্পনিক বন্ধু রাখার মত বয়স আছে?’ এটা একটা দুর্দান্ত কার্টুন, যেটা ভাবছি পরেরবার কোনো বক্তৃতা দিলে ব্যবহার করব।

প্রশ্নের ব্যাপারে বলি, হ্যাঁ, এটাকে আমি বলি ‘সচেতন অবস্থান’ ('ইন্টেশনাল স্ট্যান্ড'), যেখানে কোনো ব্যক্তি এমন একটা অবস্থান নিচ্ছে যাতে কোনো অচেতন বস্তুকে সে একটা সচেতন জিনিস বলে ধরে নিয়ে সেইমত প্রতিক্রিয়া করছে। এটা একটা ‘অতিক্রিয়াশীল কর্তা নির্ণয় পদ্ধতি’ ('হাইপার-অ্যাস্টিভ

এজেন্ট ডিটেকশন ডিভাইস')। আর এটাই বিবর্তনীয় জীববিদ্যায় ধর্মের উৎস। বিপদ দেখলে যেমন রোম দাঁড়িয়ে যায়, তেমনই প্রতিবর্ত ক্রিয়া এখানে কাজ করছে, কোনো ঘটনার পেছনে দ্রুত কোনো কর্তা বা উৎস খোঁজার প্রয়োজনি, যা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে গেঁথে গেছে। আর তাই সেটা যখন একটু বাড়াবাঢ়ি করে ফেলে, তখন আমাদের উর্বর মস্তিষ্ক ভূত-প্রেত-জীন-পরী দেখতে পায় কল্পনায়।

আপনার ‘ব্রেকিং দা স্পেল’ বইটা পড়ার পরে ইন্টারনেটে যখন তার কিছু সমালোচনা বা রিভিউ পড়ছিলাম, তখন একজনের বক্তব্য বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। তিনি মার্ক্সবাদে আলোচিত ধর্মের উৎপত্তির তত্ত্বকে তুলে এনেছিলেন, যাতে বলা হয়েছে, ধর্মের উত্তর হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, এবং তা বুঝতে গেলে মানুষের সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করা জরুরী।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমরা ইতিহাসে বহুবার দেখেছি, পুরোহিতেরা এবং শাসকেরা, প্রায়শই একসাথে মিলে, ধর্মকে স্বেচ্ছ একটা সুসংগঠিত ব্যবস্থা বা পরিকাঠামো হিসাবে ব্যবহার করেছে, সাধারণ জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য; যারা বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করে তাদের বিধৰ্মী বা পাষণ্ড হিসাবে দাগিয়ে দমিয়ে রাখার জন্য। যার অর্থ, ওই পুরোহিতেরা ধর্মকে সৃষ্টি করেছে একটা আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে নয়, স্বেচ্ছ একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে, আর মানুষ সেই ধর্মকে গ্রহণ করেছে বিশ্বাস থেকে নয় বরং নিরাপত্তার প্রয়োজনে।

ওই সমালোচক, যিনি সন্তুষ্ট কোনো সমাজতাত্ত্বিক সংঘের সদস্য, অভিযোগ করেছেন যে আমেরিকার শিক্ষাস্তরে ('অ্যাকাডেমিয়া') মার্ক্সবাদের আলোচনা থেকে দূরে থাকা হয়, যেটা সন্তুষ্ট ম্যাকার্থি জমানার রয়ে যাওয়া প্রভাব। এবং সজ্ঞানে না হলেও আপনিও তাই ওই তত্ত্বের আলোচনা বাদ রেখেছেন আপনার বইতে।

তার বদলে, সেখানে আপনি অন্য নানারকম তত্ত্বের আলোচনা করেছেন ধর্মের উৎপত্তির বিষয়ে। যে প্রধান তত্ত্বটা তুলে ধরা হয়েছে সেখানে, তা বলে, প্রাচীন লোককথা-ভিত্তিক আদিম ধর্মচর্চার ('ফোক রিলীজিয়ন') থেকে বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ('অর্গানাইজড রিলীজিয়ন') উৎপত্তি। তাতেও ধর্মের এই রাজনৈতিক ক্ষমতার ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু সরাসরি এভাবে নয় যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ধর্মের সৃষ্টি। ওই তত্ত্বের সম্পর্কে আপনার কী মত?

তাহলে, ওনার বক্তব্য যে আমি ফাঁকি দিয়েছি – মাঝীয় তত্ত্বে যেমন গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তা দিইনি?

প্রথমেই স্বীকার করি, ওই দাবিটার পেছনে অনেকটাই সত্য আছে, যে আমেরিকার ওই কমিউনিজম-বিরোধী জমানার প্রভাব এখনও খানিকটা রয়ে গেছে। তাঁর অনুগামীদের অতটা না হলেও, মার্ক্সের লেখা চমৎকার, কিন্তু তা সচরাচর নজরের আড়ালেই রয়ে যায়। আমার মনে হয়, তা বর্তমান শিক্ষাজগতে ফিরিয়ে আনা উচিতই হবে। ওনার কাজ সম্পর্কে আমি খুব অভিজ্ঞ নই, কিন্তু এটুকু জানি যে তার মধ্যে বেশ কিছু ভালো জিনিস আছে। এবং অনেকেই আছেন যাঁরা এ বিষয়ে পারদর্শী, অবশ্য তাঁরা ঠিক মার্ক্সবাদী না, মার্ক্স-বিদ – কান্ট-বিদ'রা যেমন কান্ট-এর বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁরা তেমন মার্ক্স-এর ব্যাপারে।

এবং ওনার এই বিশেষ তত্ত্বটার মধ্যে অনেকটাই সত্যি লুকিয়ে আছে। তবে সেটাকে একবিংশ শতাব্দীর আলোয় আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। মাঝীয় চিন্তাধারার মধ্যে একটা সরল কার্যকারণ-মূলক প্রবণতা বা ফাংশনালিজ্ম আছে, খানিকটা এইমিল দুর্যোগ-এর তত্ত্বের মত, যা বলে যে সামাজিক প্রভাবকগুলো একটা সামগ্রিক জিনিস, যা ব্যক্তির ক্রিয়া হিসাবে ভেঙে দেখা যায় না। এখানে ডেভিড স্লোন উইলসন-এর একটা কথা প্রযোজ্য – উনি বলেন, আমরা এই সামাজিক ফাংশনালিজ্ম-কে গ্রহণ করতে পারি, তবে তা গোষ্ঠীভিত্তিক নির্বাচন ('গ্রুপ সিলেকশন')-এর পরিপ্রেক্ষিতে। আমি বলব, মীম-ভিত্তিক ('মীমেটিক') ও গোষ্ঠীভিত্তিক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে। এটা দরকার যে, এই সামাজিক ব্যবস্থাগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগুলো উপলব্ধি করা, যেটা মার্ক্সের আলোচনায় মেলে না।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, একই কথা ফ্রয়েডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর কিছু দুর্দান্ত প্রস্তাব আছে, কিন্তু সেগুলো একটা শুল্ক তত্ত্বের ভাষায় কঠোরভাবে আবদ্ধ। তাকে অন্যভাবে দেখা, বা অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে তাকে ব্যাখ্যা করা, এসবের অনুমতি নেই। আর এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কারণ ওই শক্ত, ভঙ্গুর খোলস থেকে বের করে আনতে তাঁর চমৎকার কিছু অন্তর্দৃষ্টি বেশ কাজে লাগতে পারত।

কেউ কেউ বলছেন, বর্তমান নাস্তিকতা আন্দোলনের অবস্থা অনেকটা অভিজ্ঞত 'প্রাক্তন-ছাত্র গোষ্ঠী' ('ওল্ড বয়েস্ ক্লাব')-এর মত, যেটা মূলত একদল উচ্চশিক্ষিত সচল শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের একটা সমাবেশ। আপনার কী মনে হয়, এ পরিচয় থেকে এই আন্দোলন কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারে?

হ্যাঁ, এ অভিযোগ আমি শুনেছি। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মহিলা কর্মী বা অ্যাস্ট্রিভিস্টও আছেন – বিজ্ঞান-লেখিকা ন্যাটালি অ্যাঞ্জিয়ার, নারীবাদী ও উদারপন্থী বক্তা আয়ান হিরসি আলি, যাঁকে আমার চমকপ্রদ মনে হয়, এবং অবশ্যই তসলিমা; একটু অন্যরকম একজনও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য – টরন্টোর ইরশাদ মাঝি, যিনি নাস্তিক নন, কিন্তু ইসলামের মধ্যে থেকেই তার প্রথাগুলোর কঠোর সমালোচক।

এখানে খেয়াল করা উচিত, যে ধর্মের অবস্থাও একই রকম – ক'জন মহিলা আর পাদ্রী বা পুরোহিত হন? তবে সেই অবস্থা বদলাচ্ছে – আগে শ্রীষ্টধর্মের অনেক শাখায় মহিলাদের পাদ্রী হওয়া নিষেধই ছিল, এখন সেই আপত্তি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে অনেক যায়গায়। এই পিতৃতাত্ত্বিক অভ্যাস তো এত সহজে চলে যাওয়ার নয়।

আমি কিছু অনুমান করতে পারি, যে কেন আরো বেশি মহিলাদের আমরা দেখছি না, কিন্তু সেগুলো আন্দাজে ঢিল ছেঁড়া-ই হবে, সেগুলোকে আমার চিন্তালন্ধ উপলব্ধি বলে ভাবা ভুল হবে।

তা সেই অনুমানগুলো কী?

এটা অনেকটা, অল্প কিছুদিন আগে অবধিও দর্শনে আফ্রিকান-আমেরিকানদের স্বল্পতার মত ঘটনা। যদি আপনি একজন প্রতিভাবান আফ্রিকান-আমেরিকান হন, তাহলে আপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আছে, দর্শনের কচকচি নিয়ে পড়ে থাকার তুলনায়। আপনার প্রতিভা, আপনার বুদ্ধি, আপনার দক্ষতাকে দরকার, এমন অনেক বড় সমস্যা রয়েছে আপনার সমাজে। আর তেমনই, অনেক মহিলা যাঁরা দুর্দান্ত যুক্তিবাদী তার্কিক হতে পারতেন, তাঁরা তাঁদের কাছে আরো বেশি প্রয়োজনীয় নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তা সেটা অন্যায় কী? আমার তো মনে হয়, খুব বেশি লোকের দার্শনিক হয়ে কাজ নেই, অল্প কয়েকজন দার্শনিক হলেই যথেষ্ট। যদি যেসব মহিলাদের সে দক্ষতা রয়েছে, তাঁদের অন্য কর্মসূচী থাকে – যেমন ধরুণ, তাঁদের যদি রাষ্ট্রপতি হওয়ার লক্ষ্য থাকে, তাহলে তাই হোন! সেটা অনেক বেশি দরকারি – ‘চার ঘোড়সওয়ার’-এর মধ্যে একজন মহিলা হওয়ার চেয়ে দেশে একজন মহিলা রাষ্ট্রপতি হওয়া অনেক বেশি দরকারি। আর বর্তমান অবস্থায়, আপনি আমাদের একজন হলে, আপনার রাষ্ট্রপতি হওয়া সম্ভবই নয়!

ওই ‘প্রাক্তন-ছাত্র গোষ্ঠী’ বিষয়ে আরেকটা কথা – এই দলে এশিয়ার তেমন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় না কেন, যখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা সে মহাদেশেই, আর আমেরিকাতে-ইউরোপেও এশীয়দের সংখ্যা প্রচুর?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে এশিয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম একটা বড় রাজনৈতিক সমস্যা নয়, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। হিন্দু মৌলবাদও একটা বড় সমস্যা, আমি যতটা জেনেছি তা থেকে। আর প্রধান একজন, যাঁর কাজ থেকে আমি তা জেনেছি, তিনি একজন মহিলা – মীরা নন্দা। আপনি কি তাঁর কাজের সাথে পরিচিত? আমি আমার বইটাতে তাঁর উল্লেখ করেছি। তবে সত্যিই, আমি জানি না, এশিয়া থেকে আরো বেশি অ্যাস্ট্রিভিস্ট উঠে আসছেন না কেন।

হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে জানতে চাইব, নাস্তিক গোষ্ঠীতে শ্রীষ্টধর্ম বা ইসলামের যেমন তীব্র সমালোচনা হয়, হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের তেমন হয় না কেন?

এটা হয়ত এই সরল এবং লজ্জাজনক কারণের জন্য যে, প্রধান আলোচক যাঁরা আছেন তাঁরা ওই ধর্মগুলোর বিষয়ে তেমন একটা অবগত নন। এটা আমার বিষয়ে সত্যি তো বটেই। আমার এ নিয়ে তেমন পড়াশোনা করা হয়ে ওঠেনি, তাই জঙ্গি হিন্দুত্ববাদ নিয়ে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত।



আরেকটা কারণ কি এই, যে এই ধর্মগুলো খানিকটা নরমপন্থী?

আমারও তেমনই ধারণা। তবে আমার অতটা জ্ঞান নেই যে আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে পারি।

সম্প্রতি মন্তিক্ষের উপর স্যাম হ্যারিস এবং অন্যরা কিছু এফ-এম-আর-আই স্টাডি করেছেন, নানারকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা নানারকম কাজ করার সময় মন্তিক্ষের কোন কোন অংশ সক্রিয়তা দেখায়, তা নিরীক্ষণ করে মন্তিক্ষের বিভিন্ন অংশের সাথে নানা ইমোশন বা ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে। হিউমার বা রসিকতার সঙ্গেও অমন মন্তিক্ষের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা তো করা যেতেই পারে। এই নিয়ে আপনি কতটা উৎসাহী?

বইয়ে আলোচিত হিউমারের ওই তত্ত্বটা মূলত ম্যাথু হার্লি-র। আমার আগেকার বই ‘কনশাসনেস এক্সপ্লেইনড’ (১৯৯১)-এর সাথে এর অনেকটা মিল আছে – এতে উপস্থাপিত চিন্তাগুলো নতুন, উদ্ভাবনী, এবং আমরা চাই না যে তাদের শুরুতেই নিউরো-অ্যানাটমির একটা প্রাথমিক, খসড়া মডেলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হোক – তাতে সেই মডেলটা বর্জিত হলেই তত্ত্বগুলোও বর্জিত হবার ভয় থাকে।

আমার বেশ কিছু প্রারম্ভিক অনুমান আছে, যে কীভাবে মন্তিক্ষের চেতনার ‘বহু খসড়া তত্ত্ব’ ('মালিটপ্ল ড্রাফট্স্ মডেল') কর্তৃক ও থ্যালামাসের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে, কিন্তু সেটাই মূল কথা নয়। সেই আন্দাজগুলো ভুলও হতে পারে ভবিষ্যতে। তাই থ্যালামাসের কেবল একটা প্রাথমিক, অপরিণত ধারণা থেকে এখনই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে চাই না।

‘কনশাসনেস এক্সপ্লেইনড’ বইটা লেখার পর এই গত কুড়ি বছরে যা ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছে, তা আমার উল্লেখিত থিয়োরির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমি এখন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারি, এবং সেটা আমার একটা পরিকল্পনা, যে মন্তিক্ষের বর্তমান মডেলের সঙ্গে অন্তর্নিহিত স্নায়বিক ধারণার সম্পর্ক নিয়ে বিশদ গবেষণা করা।

একই কথা ওই জোকস-এর বইটার ব্যাপারেও খাটে। ম্যাথু, আমি ও রেজিনাল্ড ভাবনাচন্তা করেছি, আমাদের থিয়োরিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার, এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যয়িত করার জন্য। ডেভিড হিউরন যেমন সঙ্গীতের উপর বিশ্লেষণমূলক গবেষণা করেছেন, সেইরকম। এখানে আরো অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। তাই ঠিক এই মুহূর্তেই কিছু বলে ফেলা সম্ভব না।

রসিকতাকে নাস্তিকতা আন্দোলনের একটা হাতিয়ার হিসাবে কি দেখা চলে? ডাবলিনের সম্মেলনে ডকিন্স বলেছিলেন, “ধার্মিকেরা যে বিশ্বাসটা আঁকড়ে বসে থাকেন, সেটা চূড়ান্ত হাস্যকর, আর সেই রূপটা উদ্ঘাটন করে দেওয়া জরুরী। তাই আমাদের দরকার ব্যঙ্গ, দরকার রসিকতা, ... দরকার বাকচাতুর্য।”

হা হা হা! অবশ্যই, অবশ্যই! একটা জিনিস ধর্মের সম্পর্কে সবাই লক্ষ্য করে, যে ধর্মের কোনো রসিকতাবোধ নেই। ধর্মে রসিকতার কোনো স্থান নেই – ধর্মের গান্তীর্যপূর্ণ পরিবেশের ঠিক বিপ্রতীপ হলো রসিকতা। ওখানে প্রয়োজন একনিষ্ঠ, ভক্তিপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান, আর রসিকতা এসব নিয়ম-শৃঙ্খলার ঠিক উলটো। আর তার মানে, এটা একটা দারুণ অস্ত্র।

আবার এটাও একটা দারুণ ব্যাপার যে আমেরিকাতে, ইউরোপে, ঈশ্বর বা স্বর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে কিন্তু বেশ অনেক হাস্তিটাই আছে। আর ধার্মিক লোকেরাও কিন্তু তাতে মজাই পান। তাহলে, সেসব কেন লোকের কাছে আপন্তিকর নয়? আমার মনে হয়, একমাত্র উত্তর এটাই, যে সবাই জানে ওসব আসলে গালগল্পই!

শেষ প্রশ্ন – আপনার পরবর্তী বইটা কী বিষয়ে?

ওটা হবে ‘মাইন্ড টুলস’ এর উপর।

বাতিক

অভিষেক মুখাজ্ঞী

শেষ অবধি অ্যামেরিকা আসা হল!

বাপ্রে বাপ, আসা তো নয়, যুদ্ধ!

ভিসার জন্য পাখিপড়া? করেছি।

শীতের সকালে এম্ব্যাসিতে দাঁড়ানো? করেছি।

কুয়রিয়রের ভরসায় না থেকে ওম টাওয়ার্সে গিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে আসা? করেছি।

গজকুমারে গিয়ে দেশে ফিরে ইহজীবনেও পরব না এমন খান-চল্লিশ গরমজামা কেনা (ওখানে মাইনাস চলছে, মরে যাবি!)? করেছি।

শাশুড়ির চোখ এড়িয়ে স্যুটকেসের একদম নিচে গোটাকয়েক “ইয়ে” জামা পুরে নেওয়া (বাঃ, চেক-ইন করেই এয়ারপোর্টের বাথরুমে ঢুকে হল্টার-স্প্যাগেটি পরে অ্যামেরিকান সাজতে হবে না?)? করেছি।

বলরামে অর্ডার দিয়ে সন্দেশকে ফ্লাইটের জন্য স্পেশাল ডবল-প্যাক করা? করেছি।

ক্যারিঅন ব্যাগে নতুন সানন্দা আর আনন্দলোক ভরে নেওয়া? করেছি।

তারপর এয়ারপোর্ট। তার আগে অবিশ্য পাসপোর্ট-টিকিট গোছানোর পর্ব; বিগ্রহ একটা বেল্টব্যাগ আছে (জানি, আরো নানারকম নাম আছে, কিন্তু বেল্টব্যাগ শুনতে ভালই লাগে); সেটা ও সাতান্ত্রবার মিলিয়ে দেখেছে। পাশের বাড়ি থেকে ওজন নেওয়ার যন্ত্র নিয়ে এসে প্রত্যেকটা ব্যাগের ওজন মিলিয়ে দেখলাম (সঙ্গে নিজেরও – কত, সেটা আর বলছি না)।

লুফথান্সার চেক-ইন কাউন্টারের মেয়েটার সঙ্গে বিগ্রহের ফ্লার্ট করা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলাম (আহারে, ওখানে গিয়ে অনেক খসাব, বেচারা একটু করে নিক)।

তারপর অপেক্ষা।

বোর্ডিং।

“চিকেন অর পাস্তা”র উত্তরে “চিকেন” বলা (বেচারা বিগ্রহ চিকেন অ্যান্ড পাস্তা চেয়েছিল)।

মাইক্রোওয়েভে বারোশো ডিগ্রি বা ঐরকম কোনো তাপমাত্রায় মুরগি-আলুসেদ্ধ-কড়াইউঁটি-গাজর একাকার করে বানানো ঘ্যাঁট গলাধঃকরণ করা।

ফ্রাঙ্কফুর্টে নেমে পানীয় জলের জন্য হাহাকার, আর তিন ইউরো দাম দেখে আঁতকে ওঠা।

আবার ফ্লাইট।

আবার ঘ্যাঁট।

পেছনের সিট থেকে জাপানী শিশুর লাথি।

সামনের সিট থেকে ব্রিটিশ বাচ্চার ফ্লুট লূপ খাওয়ার বায়না।

হাঁটু নাড়াতে না পারা নিয়ে বিগ্রহের ঘ্যানঘ্যানানি।

তার মধ্যেই ঘুম, আর তারপর... অনেক ঘণ্টা, অনেক বছর অপেক্ষার পর... অ্যামেরিকা। অবশেষে।

আগেই বলে রাখি, আমার এই অ্যামেরিকা-ফ্যান্টাসি অনেকদিনের। আমি কসিন্কালেও ইংরেজি বই পড়তাম না বা হলিউডি সিনেমা দেখতাম না, কিন্তু তাই বলে অ্যামেরিকা আসার স্বপ্ন তৈরি হবে না? জি আর

ই দিয়েছিলাম, বেশ বাজে ক্ষেত্র হল, কাজেই একটা সফটওয়্যারের ছেলে দেখে ঝুলে পড়েছিলাম। কায়দা করে জেনে নিয়েছিলাম, অনসাইট যেতে হয় কিনা, কোথাও। ছেলেটা বুদ্ধিমান, ফরদিন খানের মত হ্যান্ডসাম, টাকা আছে বেশ, অনসাইটে আসে, সিএনবিসি দেখে, পার্টিতে গেলে দিব্য শেয়ারমার্কেট নিয়ে কথা বলতে পারে, কয়েকটা বড় বড় ক্লাবের মেম্বর, অতএব দিব্য প্রেমে পড়া যায়। পড়লাম, আর বিয়েও করে ফেললাম। এবার, অ্যামেরিকা।

এবারেরটা অবিশ্য অনসাইট নয়। এমনিই বেড়াতে আসা। তার মানে এই নয় যে হোটেলে থাকব। বিগ্রহের মাসির বাড়ি এডিসন, বেশ বড় বাড়ি। মাসি নিঃস্তান, আর বেশ বড়লোক, আর বিগ্রহকে এতটাই ভালোবাসে যে না এলে রীতিমত সেন্টু খাওয়ার সন্তান। হাতে-হাতে কাজ করতে হবে ঠিকই, কিন্তু এই, অনেকগুলো টাকার সাশ্রয় হবে, ফিরে এসে একটা তনিশ্ক মেরে দেব সেক্ষেত্রে বিগ্রহকে পটিয়ে। ওখানেই থাকব, আর গাড়ি ভাড়া করে বা এন জে ট্রান্সিটে চড়ে নিউইয়র্ক-ফিলাডেলফিয়া-নায়াগ্রা-অ্যাটলান্টিক সিটি বীচ ঘুরে বেড়াব।

কাস্টমস পেরিয়ে পাঁচ ডলারের শ্রান্ক করে ট্রলি নেওয়ার পর বিগ্রহ বলল, “মনে আছে তো?”

“কি?”

“মাসির কথা?”

“কি?”

“একি, বললাম তো...”

“ওঁ, সেই বাতিক? আরে হ্যাঁ, ভাবিস্না, ম্যানেজ করে নেব।”

“না, তুই বুঝছিস্না...”

“চিল।”

বিগ্রহ মেসো বেশ অমায়িক গোলগাল লোক। গোল মুখ, গোল মসৃণ টাক, গোল সলিড ভুঁড়ি, গোল চোখে গোল চশমা, গোল আঙুলে গোল নখ, গোলগলা টিশার্ট, এমনকি গোল গোল জুতোও। আমাদের দেখে একগাল হেসে বললেন, “বাঃ, তোমাদের বেশ কম লাগেজ তো!”

বিগ্রহ বলল, “হ্যাঁ, তবে সোমদত্তাকে তো চেনোনা, ফেরার সময় এই পাঁচটা ব্যাগ ন'টা হয়ে যাবে।”

এবার কিছু না বললেই নয় – “সেই; পাঁচটা ব্যাগের চারটে তো তুই ভরিয়েছিস্ম।”

“ও, তোর পুরো কস্মেটিক্স রেখে এসেছিস্ম?”

বাড়ত নির্ধাত। মেসো নিজেই লাগেজ বুট-এ (ডিকি নয়, বুট: আমাকে পইপই করে শেখানো হয়েছে) তুলতে শুরু করায় আমরা হাত লাগাতে বাধ্য হলাম। বড় অডি ভ্যান (আমি নিশ্চিত যে মেসো অডির লোগো দেখে লোভ সামলাতে পারেননি) – স্কর্পিও-কোয়ালিস ভুলে গেলাম এক নিমেষে।

“ইয়ে, সোমদত্তা, বিগ্রহ তোমাকে কি বলেছে জানি না, কিন্তু তোমার মাসির একটু অঙ্গুত স্বভাব আছে; আমি সঙ্গে থাকি, ব্যাপারগুলো জানি। তুমি তো জানো না, তোমার অঙ্গুত লাগতে পারে।”

“আপনি এইভাবে বলছেন কেন? উনি একটু পরিষ্কারভাবে থাকতে ভালবাসেন – তা সে তো অনেকেই চায় পরিষ্কার থাকতে।”



“না, ওর ব্যাপারগুলো একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যায় মাঝেমধ্যে।”

“যেমন?”

উনি মুচকি হেসে একটা গোল বাব্লগাম মুখে দিলেন। আমাদের অফার করলেন, তারপর বললেন,
“চলো, দেখবে।”

ওয়ালমাট্টের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। আমরা চুকলাম পেছন পেছন। বললেন, “বাড়িতে পরার জুতো
নাও।”

ঘাবড়ে গেলাম। “কেন? আমাদের তো আছে।”

বিগ্রহও দেখলাম রীতিমত ঘাবড়েছে – “এখানে আবার বাড়িতে আলাদা জুতো পরে নাকি কেউ?”

মেসো এবার হেসেই ফেললেন, একটা সবে-তো-শুরু গোছের হাসি।

কিনলাম। বিগ্রহর খুব খিদে পেয়েছিল, আর ভেতরেই ম্যাকডনাল্ড’স, তাই খেতে চুকলাম। মেসো
দেখলাম ডিক্যাফিনেটেড কফি খেলেন, নন-ডেয়ারি হোয়াইটনার আর শুগার-ফ্রি সুইটনার দিয়ে। ব্যাপারটা
লক্ষ্য করে আমার বেশ হাসি পেল। উনি বুবালেন, বুঝে নিজেও হেসে ফেললেন।

জিজ্ঞেস করলাম, “মাসির জন্য কিছু নেব না?”

“না।”

“কেন?”

“ও ম্যাকডনাল্ড’স-এ খায় না।”

অঙ্গুত লাগল। “কেন?”

“১৯৯৬-এ একজন ওয়েব্রেস প্লাভস না পরে সার্ভ করেছিল। তারপর থেকে।”

বিগ্রহর মাসি বেশ সুন্দরী ছিলেন এককালে। মানে, বেশ ট্র্যাডিশনাল ধরনের; ফরসা, ধারালো চোখমুখ,
পাতলা ফ্রেমের চশমা। অস্বস্তিকর ব্যাপারটা হল, ভুরু সবসময়ে কুঁচকেই থাকে, আর মুখ হাসলেও চোখ হাসে
না।

আমরা ব্যাগ নামালাম; গেট অবধি নিয়ে গেলাম। দেখি, দরজার ঠিক মুখে বিশাল তিনতলা ট্রলি
অপেক্ষা করছে, প্রত্যেকটা তাক প্লাস্টিকে মোড়া। একটু ঘাবড়ালাম।

মেসোর দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখ টিপে হাসছেন। বললেন, “এটা এবাড়ির সিস্টেম – বাইরের কেউ
থাকতে এলে ব্যাগ ট্রলিতে তোলা হয়, তারপর তার ঘর অবধি নিয়ে যাওয়া হয়। লাগেজের চাকার ধূলো
বাড়ির মেঝেতে লাগে না।”

বিগ্রহর দিকে তাকিয়ে দেখি, নার্ভাস হাসি হাসছে। লাগেজ তুললাম। ততক্ষণে মাসি প্যাকেট খুলে নতুন
জুতো বাড়ির ভেতরে রেখেছেন। মেসোর চটিও রেডি, উনি বাইরের জুতো বাইরে খুলে অঙ্গুত কায়দায় লাফ
দিয়ে সোজা বাড়ির চটির ওপর ল্যান্ড করলেন।

আমি অত বুঝিনি। জুতো ছেড়ে হেঁটে চুকলাম ভেতরে। মাসি গন্তব্যীর।

“দেখো সোমদত্তা, এই বাড়ির একটা নিয়ম আছে। বাইরের পায়ে তুমি ভেতরে চুক্তে পারো না।
বাইরে যাও, আবার হেঁটে ঢোকো।”

ঘাবড়ে গিয়ে পেছোলাম, কয়েক পা। মাসি ভেতরে গেলেন। তখনও বুঝিনি, কি হতে চলেছে। এলেন, মিনিটদুয়েক পর। একহাতে টয়লেট রোল, অন্যহাতে একটা বড় শিশি। ওপরে লেখা লাইসল।

লাল কার্পেট পাতা হতে দেখিনি কখনো। তবে কিভাবে হয়, জানলাম। টয়লেট পেপার বিছিয়ে দিলেন মাসি, আমার পা থেকে আমার বাড়ির চটি অবধি (তখনও জানিনা, ওদের ফ্লিপফ্লপ বলে), আর গুছিয়ে অনেকটা লাইসল ঢাললেন।

“এবার এসো।”

“ট্রলি তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও। আনপ্যাক করো, কিন্তু ব্যাগসমেত ট্রলি ঘরের বাইরে বের করে দাও।”

দিলাম, কিন্তু কৌতুহলবশতঃ গেলাম দেখতে, ব্যাগেদের কি গতি হয়।

বিশাল বাড়ি, যাকে অরংগোদয় “প্রাসাদোপম” বলত (আমার প্রথম প্রেমিক, বাংলায় লেটার পেয়েছিল, কিন্তু চাকরি পেতে দেরি করে ফেলল – বেচারা!) – অনেকগুলো গেস্টরুম। তার একটায় ট্রলি ঢুকল, আমাদের লাগেজ সমেত। আমরা অবাক বিস্তায়ে দেখলাম, মেসো ব্যাগগুলো বাথটাবে রাখলেন, আর বাথটাব জল দিয়ে ভরতি করে লাইসল ঢাললেন।

“এগুলো থাক এখন। ঘন্টাখানেক পর শুকিয়ে নেব। তোমাদের ঘরে লন্ড্রি ব্যাগ আছে, জামাকাপড় ওখানেই ছাড়বে। ওয়াশিং মেশিন দেখিয়ে দিচ্ছি।”

এত বড় ওয়াশিং মেশিন আমার চোদগুষ্ঠিতে কেউ দেখেনি। “কমার্শিয়াল,” বিগ্রহ বলল। মেসো বললেন “হ্যাঁ, কিন্তু তাও পঁয়ত্রিশ মিনিটই নেয়। তোমাদের কোনো ধারণা নেই আমাদের ইলেকট্রিক বিল কত আসে।”

“এটা চালায় কে?”

“তোমাদের মাসি। দেখে বুঝতে পারবে না, কিন্তু ওর গায়ে বেশ জোর। অনেক ভারি কাজ এই বয়সেও একাই করে।” আবার মুচকি হাসি।

মেসোকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল আমার, ইতিমধ্যেই। যেকোনো মানুষের পক্ষেই এই শুচিবায়ুগ্রস্ত মহিলার সঙ্গেই থাকা বেশ কঠিন, তাও চুয়ালিশ বছর ধরে; আর ইনি যে শুধু আছেন তাই নয়, সেন্স অফ হিউমেরও অক্ষুণ্ণ আছে। ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। আমি হলে কোন্কালে...

“বিগ্রহ?”

“ম্ম্ম্ম?”

“এখানেই থাকতে হবে, নারে?”

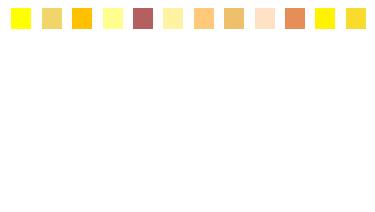
“তুই হোটেলে থাকতে চাস্?”

“টাফ না, এখানে?”

“টাফ তো বটেই। কি করবি, কাল শিফট করে যাবি?”

“না, থাক, অনেকগুলো টাকার ব্যাপার। কটাই বা দিন? আর ওঁরা তো লোক ভালই। থেকেই যাই, একেবারে না পারলে দেখা যাবে নাহয়।”

“শিওর?”



“হ্রঁ।”

“তাহলে এখন?”

“এখন দেখব, যে তোর নাম রেখেছে, ঠিক রেখেছে, না ভুল।”

“মানে?”

“মানে, তোর নামের শুরুতে বিগ আর গ্রো কেন?”

“উফফ, এতটা জার্নি করে এলি, তোর কোনো ক্লান্তি নেই?”

“তুই ঐ শুয়েই থাক। বিগ্রহ হয়ে।”

“এই, সোমদত্তা?”

“হ্যাঁ মাসি?”

“ছাটা ডিম স্ক্র্যাব্সল করে দিবি?”

“দিচ্ছি।”

এ ক’দিনে বেশ অভ্যন্তর হয়ে গেছি, মাসির রান্নাঘরে। ছেচলিশ বোতল লাইসল দেখার শক কেটে গেছে। অ্যাপ্রন, গ্লাভস, লাইসল, সবেতেই। ডিশওয়াশার থেকে প্যান বের করলাম, ডিম ফেটালাম।

“ডিমগুলো ফেলে দে।”

“ফেলে দেব? মানে?”

“তুই খেয়াল করিস্নি, প্যানের হ্যান্ডলে একটা মাছি বসেছিল, তুই বের করার পরেই। তুই ঐ হ্যান্ডল ধরেছিস্ম, তারপর সেই হাতেই ডিম ফেটিয়েছিস্ম।”

“তাই বলে...”

“দিবি।”

দিলাম।

“এবার প্যানটাকেও।”

আমি কিংকর্তব্যবিমুঠের মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে মাসি নিজেই এসে ফেললেন, প্লাস্টিকে মুড়ে (“মুড়ে ফেলছি কেন জানিস্ম? আবার মাছি বসবে, আর ঘরময় উড়বে?”), তারপর নতুন প্যান, নতুন ডিম বের করলেন।

“সৱ, আজ আমিই করছি।”

ওয়ালমার্ট।

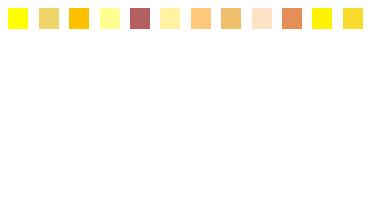
“কি করছিস্ম, সবজিগুলো ট্রলিতে রাখছিস্ম?”

“কিনছি তো আমরা। কোথায় রাখব?”

“হাতে বইবি। আমিও তো বইছি, এই বয়সে। পারবি না?”

“কিন্তু কেন বইছ?”

“আরে, এই ট্রলিগুলোয় এরা বাচ্চাগুলোকে বসায় না? ওরা তো বাথরুম করে। অনেকসময় ডায়পার ভিজে ভারী হয়ে যায়, তখন লিক করে। সেগুলো ট্রলিতে লাগে। তুই ভাবছিস্ম ট্রলিগুলো তারপর এরা পরিষ্কার করে?”



আমি হতবাক।

ফিরে এলাম। ফ্রিজে তুলতে যাব সব, এমন সময়... “কি করছিস্?”

“ফ্রিজে তুলব না?”

“না মেজে?”

“কি মাজব?”

“দেখাচ্ছি।”

ডিটার্জেন্ট আর স্কচ ব্রাইট নিয়ে শুরু করলেন। প্রথমে ডিম। প্রত্যেকটা ডিম নিখুঁতভাবে মাজলেন, অনেক সময় নিয়ে। তারপর সবজি – টোম্যাটো, ফুলকপি, বেগুন, ব্রকোলি, জুকিনি, মাশরূম, অসম্ভব মমত্ববোধের সঙ্গে। তারপর তুলে রাখলেন। হ্যাঁ, অবশ্যই সার্জিকাল প্লাভ্স্ পরে।

এইভাবেই চলল। এই ফাঁকে কয়েকদিন ট্রেন ধরে (যার ভিড়, বিগ্রহ বলল, বনগাঁ লোকাল-এর থেকে কোনো অংশে কম নয়) নিউইয়র্ক ঘুরে এলাম। আরেকদফায় ফিলাডেলফিয়া। আরেকবার প্রিম্পটন ইউনিভার্সিটি, আইনস্টাইনের বাড়ি ইত্যাদি। ভাগিয়স একে বিয়ে করেছিলাম!

দেখতে দেখতে উইকেন্ড এসে গেল। মেসোর ব্যালকনি পরিষ্কার করার দিন। বাড়ি কার্পেটে মোড়া হলেও ব্যালকনি নয়। ওখানে বাড়ির জুতো পরে যাওয়া যায়, কিন্তু পরিষ্কার ব্যালকনিতে। পরিষ্কার হবে কিভাবে?

মেসো দু’পায়ে দুটো বড় গ্রোসারির প্লাস্টিক পরে নিলেন, তারপর রাবারব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিলেন। এইভাবে তৈরি মোজা পায়ে হেঁটে ভ্যাকিউম ক্লিনার চালালেন। তারপর ভ্যাকিউম হয়ে গেলে এই অঙ্গুত মোজা খুলে বাড়ির চাটি।

মাসি লাঘের জন্য ডাকলেন।

মেসো বললেন, “তোরা নিচে যা, আমি আসছি।”

লিভিংরুমে বসলাম। টিভি চালালাম (অবশ্যই টিস্যুতে আঙুল মুড়ে, নয়ত রিমোটে জীবাণু লাগতে পারে), চ্যানেল বদলালাম। হঠাৎ...

সাংঘাতিক জোরে শব্দ। লাফিয়ে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখি, মেসো সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়েছেন, নিচে। উপুড় হয়ে। বিগ্রহ ওঁকে সোজা করল। ক্রিম কার্পেট রক্তে লাল, কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে নেমেছে গালে, গলায়, বুকে। সাদা গেঞ্জি রক্তে মাখামাখি।

জ্ঞান নেই।

বিগ্রহ একলাফে ৯১১ ডায়াল করল।

“তোরা একটু যা। আমি তোর মেসোর মুখ-টুখ একটু পরিষ্কার করে দিই।”

আমার বেশ বিরক্তিকর লাগল – এখনো পরিষ্কারের কথা মাথায় ঘুরছে? কিধরনের মানুষ?

মেসোর দিকে তাকিয়ে কষ্ট হল। ভদ্রলোক বেশ হাসিখুশি ছিলেন, হঠাৎ করে কি হল?

“কি হল, যা না!”



বিগ্রহও দেখলাম, বলল, “মো হয়েছে, আমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই বরং। তুইও আয়।”

গেলাম। ও দেখি বেশ বিরক্ত।

“রাগছিস কেন?”

“রাগব না? এইর’ম পাগল জানলে আসতামই না, সোমা।”

“না এলে আজ কি হত ভাব?”

“সেই।”

হাত ধরে দাঁড়ালাম।

অ্যাম্বুলেন্স এল। চট্টপটে তৎপর লোকজন, কলকাতার অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মিলই নেই। এসেই জিঞ্জেস করল, আহত ব্যক্তি কোথায়?

তেতরে গেলাম। দেখি, মাসি একা, ব্লিচ দিয়ে কার্পেট মুছছে।

“মাসি? মেসো কোথায়?”

“বললাম না? মানুষটাকে তো পরিষ্কার করতে হবে। একটু ভালোভাবে না করলে হয়?”

“ওরা এসে গেছে, কোথায় মেসো? ওরা নিয়ে যাবে তো!”

মাসি উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের দেওয়া টেব্লকুকটাৱ দিকে তাকালেন।

“সবে তো দশ মিনিট হল রে। এখনও মিনিট পঁচিশ। একবার দেখে আসবি, কতক্ষণ বাকি?”

পোষ্য

অমিত কুমার মাঝি

‘নরেন ওঠ, অনেক বেলা হয়ে গেছে।’ সবে মাত্র মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে এসে ডাক দিলেন নরেনের বাবা। তিনি চেন দিয়ে ধরে আছেন একটা কুকুরকে। কুকুরটা ডাক দিল, ঘেউ, ঘেউ।

নরেন দু’হাত দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, ‘আমি উঠে গেছি। তোমার মর্নিংওয়াক হয়ে গেল?’ এই বলে সে কুকুরটার চেনটা তার বাবার হাত থেকে নিয়ে তার নির্ধারিত জায়গাতে বেঁধে দিল। নরেনের বাবা বললেন, ‘তুই রেডি হয়ে নে। তা না হলে তোর অফিস যেতে দেরি হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি কর।’

এই হল নরেন আর তার বাবার প্রতিদিন সকালের কথোপকথন। এরপর নরেন অফিসে বের হয়ে যায় আর বাড়িতে থেকে যান তার বাবা।

নরেনের এক দিদি আছে, কয়েক বছর আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে। নরেনই তার বাবার কাছে থাকে। সে তার বাবার খুব পছন্দের পাত্র। অল্প বয়সে তার মা মারা গেলে তার বাবাই আদরে যত্নে ভালবাসায় তাকে মানুষ করে তুলেছেন।

সত্ত্বে বছর বয়সী নরেনের বাবার সব সময়ের সঙ্গী তাঁর পোষা কুকুরটা। বাড়িতে বিশ্বস্ত একজন কাজের লোক আছে, তাই তাঁর বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

একদিন নরেন আর তার বাবা একসঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছে।

নরেনের বাবা বললেন, ‘হ্যাঁরে, রাধিকা কেমন আছে? তাকে তো অনেক দিন দেখি না।’

রাধিকা নরেনের গার্লফ্রেন্ড। মাঝে মাঝেই তার বাবার কাছে আসে এবং গল্প-টল্প করে যায়।

নরেন বলল, ‘ও ভালোই আছে, এখন একটু ব্যস্ত তাই এদিকে আসতে পারছে না।’

‘তোদের বিয়েটা দেখে যেতে পারলে ভালোই হত।’

‘তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ!?’

‘না, বলা তো যায় না। আজ আছি কাল নেই।’

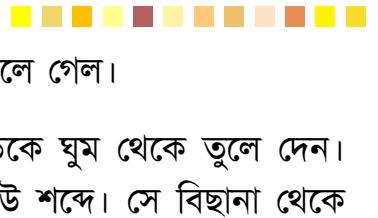
‘বাবা, তুমি সব সময় একই কথা বল কেন। তোমার কি আর কিছু বলার থাকে না।’

একটু থেমে সে বলল, ‘তুমি তো চোখে কম দেখ, তাই ভাবছিলাম তোমায় ডাক্তার দেখাব।’

‘ও সবের আর দরকার নেই, বুঝলি। ডাক্তার-ফান্ডারের আর দরকার নেই।’

‘না না, তা বললে কি হয়।’ একটু থেমে সে আবার বলল, ‘যদি সে রকম, মানে যদি নতুন চোখ লাগে, তার ব্যবস্থা করা যাবে। প্রয়োজন হলে আমিই না হয় একটা চোখ দিয়ে দেব। তুমি নতুন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।’

‘শোন তাহলে, তোকে একটা কথা বলি। সারা জীবনে এত দেখেছি, এত শুনেছি, এখন আর দেখতে শুনতে ইচ্ছে করে না। আমার চেনা দুনিয়ার জানা লোকেরা সারা জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে, এ দুনিয়াকে নতুন করে দেখার কোনো ইচ্ছে নেই। এই ভালো আছি, অল্প দেখি, অল্প শুনি, ভালোই। নতুন দৃষ্টি নিয়ে আমার স্বপ্নের দুনিয়ার ধূসর রঙ আমি দেখতে চাই না। আমি তো হাতে গোনা আর কটা দিন বাঁচব। তোর সামনে এখন অনেক রাস্তা বাকি পড়ে আছে, তোকে সেই পথে হাঁটতে হবে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে, একটু এদিক-ওদিক হলোই বিপদ। আমার একটাই ইচ্ছে, আমার কল্পনার আদর্শ দুনিয়া তোর জীবন জুড়ে থাকুক আর তুই সেটাকে দু’চোখ দিয়ে উপলব্ধি কর। এটাই আমার তগবানের কাছে একমাত্র প্রার্থনা।’



এরপর নরেন আর কিছু বলল না। তাদের খাওয়া হয়ে গেলে যে ঘার ঘরে চলে গেল।

প্রতিদিন সকালে নরেনের বাবা মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে এসে নরেনকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে দেন। আজ নরেন ঘুম ঠিক সময়েই ভেঙেছে কিন্তু তার বাবার ডাকে না, কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দে। সে বিছানা থেকে বলল, ‘বাবা আমি উঠে গেছি।’ কিন্তু বাইরে থেকে কোন উত্তর এল না।

সে বিছানা থেকে উঠে দু’হাত দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে দরজা খুলে বাইরে এসে বলল, ‘আমি উঠে গেছি। তোমার মর্নিং ওয়াক হয়ে গেল?’

এ কথা বলার পর চোখ খুলে সে তার বাবাকে না দেখতে পেয়ে তার বাবার ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল, ‘বাবা’। এবারও সে কোন উত্তর পেল না।

এদিকে কুকুরটা বাঁধা অবস্থায় চিংকার করেই চলেছে। কুকুরের ডাক শুনে তার মনে হল, ডাকের মধ্যে কোথাও একটা বেদনা জুড়ে আছে। তার কেমন যেন একটা ভয়-ভয় করতে লাগল। সে তার বাবার ঘরের কাছে এসে ডাক দিল, ‘বাবা, বাবা। এখনও ওঠো নি! অনেক বেলা হয়ে গেছে। হাঁটতে যাবে না?’

ভেতর থেকে কোন উত্তর এল না।

নরেন অনেক বলা সত্ত্বেও নরেনের বাবা দরজা ভেজিয়ে ঘুমাতেন। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখল, তার বাবা শুয়ে আছেন। এতে নরেন অবাক হয়ে বলল, ‘বাবা অনেক বেলা হয়ে গেছে, ওঠো। মর্নিং ওয়াকে যাবে না?’

এই বলেই সে তার বাবার গায়ে হাত দিয়ে দেখে, তাঁর শরীর বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেছে। নরেন বুঝতে পারল, তার বাবা চিরদিনের মত ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন। নরেন দুঃখে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রাইল অনেকক্ষণ।

তারপর সে প্রথমে কল করল রাধিকাকে। রাধিকা আসতেই সে তার দিদি-জামাই বাবুকে ফোন করে।

নরেনের দিদি এসেই কানায় একেবারে ফেটে পড়ল।

এদিকে কুকুরটা সমানে চিংকার করেই চলেছে।

বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। নরেনের বাবার পোষা কুকুরটা কিছু না খেয়ে খেয়ে, সারাক্ষণ চিংকার করতে করতে, একদিন মারাই গেল। কুকুরটা মারা গেলে তার বাড়ির চাকরটা বলল, ‘ছোটবাবু, কুকুরটা বাবুর শোকে না খেয়েই মারা গেল। বাবুর খুব ন্যাওটা ছিলো কি না, বাবুর হাতে ছাড়া কারো হাতে খেতোই না।’

নরেনের মধ্যে আগেকার সতেজতা আর নেই, কেমন যেন সব সময় সে মনমরা হয়ে থাকে। সে রাধিকা বা তার দিদিকে ফোন করা ছেড়েই দিয়েছে। নরেনের দিদি বেশি দূরে থাকে না। সে কয়েক বার এসে নরেনকে দেখে গেছে। নরেনকে সে অনেক বুঝিয়েছে, ‘এত দুঃখ করলে কি করে চলবে বল?’

নরেন খুব দুঃখের সঙ্গে বলেছে, ‘বাবাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।’

‘কি করবি বল, কারো বাবা মা কি আর চিরকাল থাকে? মনে মনে শক্ত হ। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।’

তার দিদি তাকে অনেকবার বলেছে, ‘তুই এইবার রাধিকাকে বিয়ে করে নে।’

নরেন বলেছে, ‘বিয়ে করার সময় কি চলে যাচ্ছে। যখন হোক করলেই হল।’

এদিকে রাধিকা এসে তাকে বলেছে, ‘তুই না দিন কেমন পাল্টে যাচ্ছিস। ফোন-টোন তো বন্ধ করে দিয়েছিস। চল কোথাও একটা ঘুরে আসি। একলা ঘরে বন্দী থেকে তুই কেমন দিন দিন পাগলের মত হয়ে যাচ্ছিস।’ নরেন রাধিকার কোন কথার উত্তর দেয় না।

রাধিকা বলল, ‘আমরা না পুরো ফ্যামিলি নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছি, তুইও আমাদের সঙ্গে চল; দারুণ মজা হবে।’

নরেন কিছুতেই রাজি হল না বেড়াতে যাবার জন্য।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাইরের লোকেদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগই নেই। বাড়ির চাকরটাকে বেশ কিছু দিন আগে সে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

নরেন আজকাল এক প্রকার বন্দীর মত সময় কাটায়। বাইরে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছে। সে কি যেন এক গভীর চিন্তায়, গভীর দৃঢ়খে সর্বদাই ডুবে থাকে।

তখন গভীর রাত্রি, নরেন একলা তার নিজের ঘরে চুপচাপ বিছানার উপর স্থিরভাবে বসে আছে। তার মনে হতে লাগল, কুকুরটা যেন আগের মত আবার চিংকার করছে। কিন্তু অনেক দূর থেকে। তার কানে অস্পষ্টভাবে আসতে লাগল সে আওয়াজ। বিছানায় বসে বসে বলল, ‘আমি কেন বেঁচে আছি!?’

হঠাৎ তার মনে হল, কুকুরটা যেন তার বাবার ঘরে ঢুকল। সে অতি সর্তকতার সাঙ্গে তার বাবার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দেখে সেখানে কিছু নেই। সে তার বাবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করল; কিন্তু সে ঘুমোতে পারল না। সে তার বাবার ঘর থেকে বের হয়ে উঠলে কুকুরটা যেখানে বাঁধা থাকত ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়াল। এরপর সে কুকুরের গলার বেল্টটা তার গলায় পরে নিয়ে সেখানেই পড়ে রইল।

রাধিকা দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে নরেনকে দেখতে এল। সদর দরজা থেকে সে অনেকক্ষণ, ‘নরেন, নরেন’ বলে ডেকে, কোন উত্তর না পেয়ে, দরজায় ধাক্কা দিল। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলতেই সে কুকুরের অঙ্গুত চিংকারে চমকে উঠে দেখল, একটা উক্ষো-খুক্ষো লোক মুখময় দাড়ি নিয়ে কুকুরের মত চিংকার করছে। সে আবার লোহার চেনে আটকানো। রাধিকা ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘নরেন!’

সে উত্তর দিল, ‘ঘেউ।’

প্রেম অবিনশ্বর

অনিবার্ত্তন সেন

“আমি কি আপনার কোনো সাহায্যে আসতে পারি, ম্যাডাম?”

প্রবল হাওয়া ঠেলে অতি কষ্টে ক্যাফেটারিয়ার দিকে এগোবার চেষ্টা করছি, এমন সময় পেছন থেকে ভেসে এলো সেই অতি পরিচিত স্বরে এই ডাক। চমকে ঘুরে তাকালাম। সন্দেহ নেই – সে! উত্তেজনায়, শিহরণে আমার রোমকৃপ খাড়া হয়ে উঠলো – যেমন তখনও হতো।

ও কিন্তু আমায় মোটেও চিনতে পারেনি। যাক, তাতে আমি আঘাত পাইনি। শেষ দেখা হবার পর আমরা দুজনেই অনেক বদলে গেছি, বিশেষতঃ আমি। তাছাড়া কোনো পুরুষের পক্ষে একটি মেয়েকে স্বেফ তার চলার পথের একটি মাইলফলক হিসেবে দেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে সে যদি ওর মত পুরুষ হয়।

কিন্তু যখন একই মাইলফলক আবার ফিরে আসে? তখন বুঝতে হবে, বাছা, এবার তোমার ঘরে ফেরার পালা! আগে যখন আমাদের দেখা হয়েছিলো, আমি অনভিজ্ঞ ছিলাম। তাই আমার দ্বিধাগ্রস্ত বাহুবন্ধন এড়িয়ে তুমি পিছলে বেরিয়ে গেছো। সে ভুল আমার আর হবে না। এই হঠাতে দেখা আমার বুকের এক গভীর ক্ষতকে আবার জাগিয়ে তুলেছে। বুঝতে পারছি, জীবনে কি মরণে ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না!

সুতরাং হাজার ভোল্টের এক হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে আমি উত্তর দিলাম, “ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না। তবে কী, এই গা ছমছম হিল রিসটে এতক্ষণে একটা জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়লো। এই হতচাড়া আবহাওয়াতে যদি আর কেউ জিন্দা থেকে থাকে তবে তারা ঘরে রুম হিটার চালিয়ে কম্বলের তলায় আরামসে ঘুম মারছে। কাজেই আপনি যদি ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমাকে একটু সঙ্গ দেন –”

“সানন্দে!” বলে সে নিরিড় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। সেই দৃষ্টি – যার সামনে পড়ে আমার ভেতরটা আগুনের সামনে এক তাল মোমের মতো গলতে শুরু করলো। যেমন তখনও গলতো।

“মহিলারা অচেনা পুরুষদের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন – এক সিরিয়াল কিলার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে,” স্থানীয় নিউজ চ্যানেল বারবার হাঁশিয়ারি দিচ্ছে। আমারও কি সাবধান হওয়া উচিত নয়? না না, ও তো আর আমার অচেনা নয়। বরং কখনো কখনো মনে হয়, ওর সাথে আমার কত সহস্রাদ্বৰ্দ্ধের পরিচয়।

ও এক নিঃশ্বাসে কত কথা বলে চলেছে, বোধহয় আমাকে পটানোর জন্য। বেকার পরিশ্রম – আমি তো ওর রসে মজেই আছি! মুঝ হয়ে আমি একতরফা শুধু শুনে যাচ্ছি। অবশ্য কী-ই বা আমার বলার আছে? আমার যে অতীত ছাড়া কিছু নেই – সেসব প্যানপ্যানানি কি আর ওর মনে দাগ কাটবে!

ব্রেকফাস্টের পর ও দিলদার হয়ে আমাকে ওর হোটেল রুমের উষ্ণতায় বসে আড়ডা মারার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। বাইরের আবহাওয়া যদিও জঘন্য, তবু সেই আমন্ত্রণ বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে আমি বাগানে হাঁটার প্রস্তাব দিলাম। ততক্ষণে আমি ওর জন্য মরে যাচ্ছি, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম। নিজেকে হাঁশিয়ারি দিলাম – খুব তাড়াতাড়ি বেশি এগিয়ে সব মাটি কোরো না। ধৈর্য ধরো, ও তোমারই হবে!

বাগানটি অতীব সুন্দর। ঝাঁক ঝাঁক দৃষ্টিনন্দন ফুল প্রতিকূল আবহাওয়ার দাপটে অস্তিরক্ষার চেষ্টায় কুকড়ে রয়েছে। একটি অর্কিড পড়ে আছে দেখতে পেয়ে আমি তা তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম।

“জানলেন কী করে যে আমি অর্কিড ভালোবাসি?” ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

“এই, কেমন যেন মনে হলো।” আমি লজ্জায় লাল হয়ে বলি।

আমার মুখের দিকে অপলক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ও বললো, “আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। আগে কি কোথাও দেখেছি?”

“হয়তো কখনো কোনো ভিড়ের মধ্যে হবে।” অতি কষ্টে চোখের জল সম্বরণ করতে করতে বলি।

“যদি গুস্তাখি মাফ করেন তো বলি –” ও ইতস্তত করছে।

“করলাম, বলুন”, আমি হেসে ফেলি।

“আপনি কি কখনো ভালোবেসেছেন?”

কিছুক্ষণ শক্র হয়ে থেকে আমি অতি কষ্টে উত্তর দিই, “আমার ভালোবাসা? সে আমায় ভুলে গেছে।”

“আহাম্মক!”

“কী বললেন?” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

“বলছি, এমন ফুলের মত সুন্দর একটি মেঝেকে যে ভুলে যেতে পারে, সে আহাম্মক ছাড়া আর কী?”
ও জেদি গলায় বলে।

আমি উত্তর দিই না। কিছুক্ষণ পর ও আবার বলে, “ওদ্দত্যের জন্য আবার মাফ চাইছি – আমি কি জানতে পারি কী ধরণের প্রেমিক আপনি পছন্দ করেন?”

“কেন, বাচ্চা মেঝেটির হাতে তার পছন্দসই ললিপপটি তুলে দেবেন বলে?” আমি খিলখিলিয়ে হাসি।

“চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী!” ও হেসে উত্তর দেয়।

কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় তলিয়ে যাবার পর আমি আবিষ্ট স্বরে বলি, “আমি সেই প্রেমিকের স্বপ্ন দেখি, যে তার ভালোবাসার প্লাবনে আমার শ্বাসরোধ করে দেবে, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, আমাকে – আমাকে শেষ করে ফেলবে!”

এক মুহূর্তের জন্য আমি ওর চোখে দেখতে পেলাম আগুনের ফুলকি। পরক্ষণেই আবার চট করে আত্মসম্বরণ করে ও আমার দিকে শুধু হাত বাড়িয়ে দিলো।

কী কপাল – সেটুকুও আমি গ্রহণ করতে পারলাম না! “না, এখনও সময় হয়নি।” ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে বললাম।

“কিন্তু সময় যে ফুরিয়ে আসছে। কাল আমি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবো।” ও মিনতি করে।

“বিশ্বাস করুন, তার আগেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে,” আমি কথা দিলাম।

নিঃশব্দে দু’জনে পথ চলছি। এক সময় পথ ফুরিয়ে গেলো, সামনে এক অতল খাদ। অনেক নীচে পাতায়, ফুলে ঝলমল প্রকৃতির শ্বাসরোধকারী সৌন্দর্য। কিনারায় এসে খাদের কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আমি মুক্ত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দমকা হাওয়ায় উড়তে লাগলো আমার কাপড়ের খুঁট আর চুল।

“হাতব্যাগ সামলে, ম্যাডাম – হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।” ও পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললো।

ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বললাম, “তা আর বলতে – আমার সর্বস্ব তো এটারই মধ্যে।” তারপর একটু হেসে বললাম, “আমি যদি এখানে একটু দাঁড়াই, আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না?”
“না, না, আমি অপেক্ষা করছি,” বলে ও এক পাশে সরে দাঁড়ায়।

আবহাওয়া জঘন্য থেকে জঘন্যতর হচ্ছে। ঘন কুয়াশায় ধীরে ধীরে চারদিক টেকে যাচ্ছে, কয়েক হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। হিমেল হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তবু আমি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে। চারপাশ নিথর, নিস্তুর। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা যেন হঠাত থমকে দাঁড়িয়েছে, সময় ছুটি নিয়েছে।

তারপর এক সময় আমি পেছন ফিরে দেখি, ও পাশে নেই। কয়েকটি আশঙ্কাজনক মুহূর্ত, তারপর হঠাত আমার হাতের ব্যাগে এক হাঁচকা টান আর আমার ঘাড়ের পাশে এক উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। একটি সবল পুরুষালি বাহু পেছন থেকে আমায় প্রবল ধাক্কা দেবার জন্য উদ্যত। খাদের কয়েক ইঞ্চি দূরে আমি স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে। চূড়ান্ত মুহূর্তটি কি তবে এসে গেলো?

“হল্ট!” হঠাত কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে আর সাথে সাথে বেজে ওঠে এক তীক্ষ্ণ পুলিশি হইসল। কিন্তু ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গেছে। একটি শরীর খাদের কিনারা থেকে সামনের অনন্ত শূন্যে ছিটকে পড়ে, কোনো হতভাগ্যের করণ মৃত্যুকাতর আর্তনাদে দিগন্ত কেঁপে ওঠে, তারপর আবার সব নিস্তুর।

“ইস, ব্যাটা সিরিয়াল কিলার শেষ অবধি আমাদের হাত এড়াতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো!” সাব-ইনস্পেক্টার দুঃখ করে বললেন।

“তুমি কি নিশ্চিত যে লোকটা একাই গেছে?” ইনস্পেক্টারের তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, “আমার যেন মনে হলো ও কাকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিচ্ছে?”

“স্যার, আমার ইনফ্রা-রেড চশমা দিয়ে আমি সব স্পষ্ট দেখেছি – লোকটা ছাড়া এখানে আর একটা কুত্তাও ছিলো না। তবে ওর মাথাটা বোধহয় একেবারে গিয়েছিলো – নিজের সাথেই কথা বলছিলো আর যেন ছায়ার সাথে যুদ্ধ করছিলো। সেভাবেই খাদের কিনারায় কাল্পনিক কাউকে ধাক্কা দেবার ভঙ্গী করতে করতে হঠাত নীচে লাফিয়ে পড়লো।”

“উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে!” ইনস্পেক্টার বলেন, “তুমি বোধহয় জানো না ওর প্রথম শিকার যে মেয়েটি, তাকে ও প্রেমের ফাঁদে ফেলে ঠিক এই জায়গাটাতে টেনে এনে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। অমন ফুলের মত সুন্দর একটি মেয়ে – কতটা পশু হলে একজন মানুষ স্নেফ অর্থের লোভে তার জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে পারে!”

“চলুন স্যার, যাওয়া যাক।” সাব-ইনস্পেক্টার এতক্ষণে স্বত্ত্বির নিঃশ্বাস ফেলে পাট চুকোবার উদ্যোগ করেন।

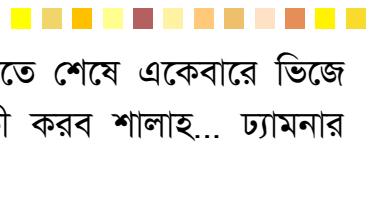
আর আমি আমার অর্কিড হাতে নিয়ে অপেক্ষা করে থাকি। পৃথিবীর গভীর জগতের থেকে অবিরাম উঠে আসা কুয়াশার বাস্প পাহাড় টেকে ফেলছে। তার পাখায় চড়ে এবার ও উঠে আসবে শুন্দি জ্যোতি হয়ে, পাশে এসে বসে আমার হাত ধরবে। আমার হৃদয় আবার নেচে উঠবে উচ্ছাসের জোয়ারে। ও আমার, চিরদিনের জন্যই আমার হবে। মানুষ নশ্বর, প্রেমের মৃত্যু নেই।

বোঁদে

বিনোদ ঘোষাল

রাত্তির হলে বারীন পালটে যায়। এমনিতে দিব্য সারাদিন হাসিমুখে রিক্কা টানে। ভাড়া নিয়ে কোনও প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে কিছাইন করে না। ব্যাঙের পেছাপের মতো অথবা সত্যিই খুব বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল জমে গেলেও প্যাসেঞ্জারকে ভাড়া বেশি লাগবে কিংবা যাবো না বলে না। কিন্তু রাত্তির আটটার পর ও যখন রেললাইনের ধারে মেঠের পত্তিতে ঢোকে, তখন থেকেই সারাদিনের বারীন পালটাতে শুরু করে। কচির ঝুপড়ির সামনে ব্যারেলে ভরা সাদাটে ঘোলা রঙের অমৃত ঝরতে থাকে মাটির খড়াই'গুলোর ওপর। সঙ্গে পেঁয়াজ আর বৌঁটকা তেলের গন্ধওয়ালা ডালমুট। কখনো আরেকটু পকেট নরম করলে ঝাল ঝাল শুয়োরের মাংস। মাঝমধ্যে কচির বৌটাও আসে খড়াই ভর্তি করতে। উহহ দেখে কে বলবে মাইরি মেঠেরের বৌ! রোজ সকালে ঝ্যাটা-বালতি হাতে নিয়ে কচির সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গু পরিষ্কার করে। শালাহ বডি! পাঁচ-ছটা নেন্ডি-গেন্ডি বার করার পরেও হেইস্যা টাইট বুক, পিঠের দিকে ব্লাউজের ঠিক নিচুটায় যে দুটো সোহাগী চর্বির ভাঁজ আছে, হ্যারিকেনের আলোয় ঘামে ভেজা খয়েরি রঙের শরীলটায় ওই ভাঁজদুটো ইলিশ মাছের মতো চকচক করে। ওখানে নিজের মুখটা ডলতে ইচ্ছে করে বারীনের। ভাবলেই গোটা শরীর কেঁপে ওঠে...। কিন্তু কিস্যু করার নেই। কচি যা খতরনাক চিজ! একবার কে যেন ওর বউ এর হাত না কী ধরে ছিল নেশার ঘোরে। কচি পুরো এক ব্যারেল চুল্লি গায়ে ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছিল মালটাকে। ধুসস... একেবারে গলা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বারীন ঢেঁক মারতে থকে খড়াইতে।

প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আসর ভাঙ্গার পর ও রিক্কা নিয়ে সোজা চলে আসে শিবুর মিষ্টির দোকানে। দোকানের শাটার তখন হাফ নামানো হয়ে যায়। বারীন নিচু হয়ে দোকানে ঢুকে রেলাসে একটা দু'টাকার কয়েন বাড়িয়ে দেয়। দোকানে শোকেসের ওপর কাঠের বারকোশে সাদা চিকচিক কাগজে চাপা দেওয়া বোঁদে একচামচ ঠোঙায় ভরে এগিয়ে দেয় শিবু। রোজের ব্যাপার, তাই কোনও কথার প্রয়োজন হয় না। এই বোঁদের নেশাটা বারীনের অনেক দিনের। সারাদিন কুভার মত খাটার পর বাড়ি গিয়ে শালা গ্র শুকনো রুটি আর কালচে আলুর চচড়ি গলা দিয়ে নামে? হারামী বৌটা মাঝে মধ্যে একটু পরোটা-টরোটাও বানাতে পারে না। এই বোঁদেটুকুই তাই বারীনের সব। পাতে ঢালা বোঁদের ওপর স্বেফ তাকিয়ে ওই চিমসে রুটি আর ছ্যাকরা আলুর চচড়িটা প্রায় গিলে মেরে দেয় ও। তারপর তারিয়ে তারিয়ে বোঁদেগুলো খেতে থাকে। ছেলেদুটো ঘুমিয়ে না পড়লে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বোঁদের ওপর। তখন বারীন ওদের চোখে শুধু বাপ নয়, রাজা। কখনো হঠাৎ কৃপা হয়ে গেলে বারীন ওদের দিকে একটু বাড়িয়ে দেয়। বেশি না, খুব জোর দু-চার দানা। ছেট্টা আবার আহ্বাদে খাবি খেয়ে বলে ওঠে, আমি লাল গুলো খাব। বারীন পেঁলায় ধমক দেয়। ধ্যার গাধা কা বাচ্চা, লাল হলুদ স-ব সম..মান। যা দিচ্ছি, খা। আর টেমপার ঠিক না থাকলে চিক্কার দিয়ে বলে, হ্যাট্ শালাহ... ভিকিরির বাচ্চা... ঘুমো বলছি! ...যন্ত শুয়োরের পাল এখনে জুটেছে...! মুখ যত ছুটতে থাকে পাতের বোঁদেও শেষ হয়ে আসতে থাকে। খিস্তি থেকে গৌরীও বাদ যায় না। বাচ্চা দুটো ভয়ে জড়েসড়ো হয়ে যায়, তারপর চোখ বুজে শুয়ে পড়ে। প্রায় রোজই এমন ঘটনা। তবু ছেট দুটোর ভয় পাওয়াটা এখনও অভ্যাস হয় নি কেন কে জানে? বাচ্চাদুটো শুয়ে পড়লে তখন বারীন গৌরীকে আছাড় দিতে শুরু করে। একেবারে বিছানায় শোয়া পর্যন্ত। গৌরী অঙ্গুত চুপ। হ্যারিকেনের হলুদ আলোটা ছেট নীল রঙের বিন্দু করে দেওয়ার পরেও বারীন বিরামহীন। ...শাল্লা এইতো চামচিকের মতন চেহারা... ছাগলের নাদির মতন বুক ... দেখগে কচির বৌকে। ফিগার কাকে বলে। ...শালাহ, এত গেলাই তবু পিঠে ভাঁজ পড়েনা! ওপাশ ফিরে গৌরী শুধু সময় গুনতে



থাকে। তারপর গলার ঝঁঝটা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে বারীনের। নামতে নামতে শেষে একেবারে ভিজে ন্যাতার মত হয়ে যায়। ...জানিই তো কিস্যু করতে পারি না তোদের জন্য... কী করব শালাহ... ঢ্যামনার কপাল...।

সময় শুরু হয়ে গেছে বুরো গৌরী তখন আস্তে আস্তে বারীনের কাছে ঘেঁষে শোয়। ওর হাপরের মত বুকে হাত রাখে আলতো করে। বারীন ডুকরে বলে ওঠে, কালকে পরোটা বানাবি। আমি সবার জন্য পাঁচ টাকার বোঁদে নিয়ে আসব। অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসে গৌরী। তারপর বারীন একটানে গৌরীর জামাটা খুলে ফেলে ওর বুকে হাত দেয় আর পাঁজরে লেটকে থাকা শুকনো পিঠে নিজের মুখটা ঘষতে থাকে। আশ্চর্য এক জলে গৌরীর পিঠ ভিজে যায়। ...

এই রকম রাতটা নতুন কিছু নয়। প্রায় রোজই এমন প্রতিষ্ঠা চলে। কিন্তু সেই ‘কালকে’র দিনটা বলে যে কিছু নেই, গৌরী জানে। তবু ও নিশ্চিন্ত আরামে বারীনের বুকের ভেতর ঢুকে পড়ে তখন। ভেতরটা কালীপূজোর রাত্রের মতন আলো আর আলোয় ভর্তি! সবাই জানে রাত্রির হলে বারীন পালটে যায়, কিন্তু শুধু গৌরী জানে অনেক রাত্রিরে বারীন আরো পালটে যায়।

কাশী'স্ দেবাশিস ভট্টাচার্য

প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু কথা থাকে যা সত্যি না বলে রূপকথা বলাই ভাল। সে অনেকদিন আগের কথা –
বছরটা খেয়াল নেই, আমার পশ্চিমবাংলা ছেড়ে স্বপ্ননগরী মুস্তাই যাত্রা – অনেক আশা, আকাঞ্চা, স্বপ্ন নিয়ে।
এখনও মনে পড়ে মায়ের সেই করণ মুখ, সেই কান্না, সেই সাবধানবাণী – বাবু, সাবধানে থাকিস – কথাটাৰ
মধ্যে বন্ধনের তীব্রতা যা এত বছরেও হারিয়ে যায় নি। একেক সময় মনে হয় ওই সাবধানবাণীই বোধহয়
হারিয়ে যেতে দেয়নি নানা প্রলোভনের মাঝেও।

আমার অফিস-এর নাম ছিল কাশী ইনফোকম। নামটা কেমন একটা অস্বস্তিকর। কোথায় কাশী, এক
ধর্মস্থান, আর কোথায় ইনফোকম – এ যেন দুই মেরুর মিলন! সুতিৰ বেড়াজালে অনেক কিছুই জড়িয়ে
রয়েছে; সেই অফিস একমোডেশন – দশ-বারো'টি ছেলেৰ একসাথে ফ্ল্যাটে থাকা, দিনে একদল আৱে রাতে
আৱেকদল; কলসেন্টার মাপেৰ অফিস, খোলা তিনশো পঁয়শত্তি দিন, চৰিশ ঘন্টা; আমার কাজ শুরু হত রাতে,
তাই টানা ছ-মাস রাতজাগা দিনগুলো, আৱেও কত কি।

কাশী ইনফোকম-এর প্রীতম – সকলে ছোটো করে ডাকত, প্রীত – ছিল একটু মোটাসোটা, গৰ্ব-
গোব্দা, লহু-চওড়া, হাসি-খুশি একটি ছেলে। প্রথম আলাপেই সকলকে আপন করে নেয়। আমার সাথে
পরিচয়টাও ভাৱী অঙ্গুত। ছেলেটি কাজ কৰত সিস্টেমস-এ, অৰ্থাৎ আমাদেৱ সকলকে টেক্-সাপোর্ট দেওয়া ওৱা
কাজ। এক রাত্তিৱে হঠাৎ-ই আমার কাছে এসে হাত বাড়ায়। স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়ায় হাত বাড়াতে গিয়ে দেখি
এক বিচিৰি ভঙ্গিমায় হাতটিকে ওপৰ দিকে তোলে – যেন আমার দিকে হাত মেলানোৰ জন্য বাড়ায়ইনি।
অপ্রস্তুত হয়ে হাতটা নামাতেই জড়িয়ে ধৰে। নিমেষেৰ মধ্যে আমার সব জড়তা, বাধা কোথায় উধাও হয়ে যায়।

আমার পাশে বসত একটি শান্ত-শিষ্ট কেৱালিয়ান ছেলে। সে হেসে বলে – হি ইস লাইক দ্যাট ওনলি,
বাট ভেৱি পিয়াৰ অফ হার্ট। সত্যিই ওৱা হাসিৰ নিৰ্মলতা সব গুণ মুছিয়ে দিত।

এ অফিসে আৱেও কিছু চৰিত্ৰ ছিল যা আমায় খুব টানত। তাৱমধ্যে বিশেষ নজৰ কাঢ়ত ভীষণ শান্ত,
কম কথা বলা, লাজুক এক যুবক। সারাদিনই যেন অন্য দুনিয়াই বাস কৰছে। সে ছিল সকলেৰ জীতুয়া।
জীতেন্দ্ৰ থেকে জীতুয়া কখন হয়ে গেছিল তা সে নিজেও বোধকৰি জানেনো। এই ছেলেটিৰ সাথে প্রীত-এৰ
সম্পর্কটা ছিল দেখাৰ মত – সারা রাত্তিৱে প্ৰীত ওৱা পিছনে কাঠি কৰছে, অথচ ভীষণ শান্তভাৱে জীতুয়া তা
সামাল দিচ্ছে।

একদিনেৰ কথাই ধৰা যাক – রাত্তিৱে টি-ব্ৰেক। সকলেই অফিসেৰ বাইৱে ফাঁকা জায়গাটায় এসে
দাঢ়িয়েছে। জমেছে আড়ডা। প্রীত প্ৰতিদিনেৰ মতই ফুল ফৰ্ম-এ। কেউ বসেছে সিঁড়িতে, কেউ বা বাইকেৰ
ওপৰ। জীতুয়া চায়েৰ কাপটি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। নিমেষেৰ মধ্যে প্ৰীত ও আৱেকটি ছেলেৰ দৃষ্টিবিনিময় হয় যা
আমার চোখ এড়ায়নি। জীতুয়া যেই একটি সিগাৱেট পকেট থেকে বার কৰে প্ৰীত ভাল মুখ কৰে বলে – ছোড়
না তোৱা ওহ ছোটা সিগ্ৰেট; বড়া সিগ্ৰেট পী।

কিছু না ভেবেই হাত বাড়ায় জীতুয়া। খানিকবাবে শুরু হয় কাশি। কেউই ব্যাপারটা ঠিক বুৰাতে পারেনি
শুধু দুজন ছাড়া; অবশ্য আৱো একজন উপলক্ষি কৰেছিল নীৱৰে। পৱে প্ৰীতকে চেপে ধৰাতে ব্যাপারটা

পরিষ্কার হয়। সিগারেটের ফিল্টারটি খুলে গুঁড়োলঙ্ঘার মশলা সামান্য একটু মিশিয়ে ছিল। যাইহোক, এইসব হাসি-মজা, দুষ্টুমি ও কাজ নিয়েই সকলের কাজের রাতগুলি কাটছিল।

এই অফিসের বিশেষ একটি দিক – মাসকাবারি বেতনের কোনও নির্দিষ্ট দিন ছিল না; প্রতি মাসই প্রায় একমাস পেছনে চলত। সে সময়ে রাত্তিরের অফিস হোত দেখার মত। এ বলে কাজ করব না, ও বলে কাজ করব না। চারিদিকে একটা বিদ্রোহের ছায়া। মাঝেমাঝে মনে হোত এত অসুবিধে নিয়ে মানুষগুলো এ জায়গায় পড়ে থাকে কেন। একান্তে সকলের সাথে কথা বলে বুঝেছি – ওখানে তাদেরই স্থান যাদের আর কোনও পথ নেই; প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বাধা আছে, যা তাদেরকে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে আটকে রেখেছে। আরেক প্রজাতির জীবও ওখানে কাজ করে, যা দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে – যাদের কাজ না করে গল্প করাটাই কাজ। প্রথমে একটু অবাক হয়ে ভাবতাম – এত বড় অফিস, বড় এস্টারিশমেন্ট – কি করে চলছে?

সাতপাঁচ চিন্তা-ভাবনা নিয়েই আমার অফিস-জীবন যথারীতি এগিয়ে চলে; বাড়ে প্রীতমের সাথে ঘনিষ্ঠতাও। এক রাত্তিরে কাজে বসেছি, হঠাত প্রীত এসে হাজির। কিছু না বলে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে যায় ওর রুমে। দেখি আরও চারজন সিস্টেমস্-এ বসে। রুম-এর মধ্যে মেশিনের শব্দ, চারিদিকে ছড়ানো-ছেটানো অগোছাল ভাবটা দেখে বিরক্ত হয়েই বলি – কেয়া হ্যায়?

ভালভাবে খেয়াল করে দেখি, যেন এক উগ্র উদ্যম কাজ করে চলেছে ওদের ক'জনের ভিতর। প্রীত উঠে একটা প্যাকেট নিয়ে আসে, খুলে টেবিলের ওপর রাখে। কয়েকটি পাঁচশো ও একশো টাকার মেশানো-বান্ডিল। কিছু না বুঝে প্রীত-এর দিকে নজর পড়তেই বলে – দাদা, পঁচাস হজার হ্যায়। কুছ ধন্দা বতাও না।

মুখ দিয়ে হঠাতই বেরিয়ে যায় – মচিকা ধন্দা করো। আর একটাও বাক্য বিনিময় না করে পা বাঢ়াই।

এরপর কেটে গেছে বেশ কিছুদিন। প্রত্যেকদিনই রাত্রে অফিস করি আর সকাল হলে ফিরে যাই নিজের ডেরায়। ওদের দিকে চোখ পড়ে কিন্তু কিছু কিছু বলি না। চারজনের চোখের দিকে তাকালে এক উদ্বীপনা নজরে পড়ে। অথবা কৌতুহলী হওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ বলে প্রশ্ন করি না।

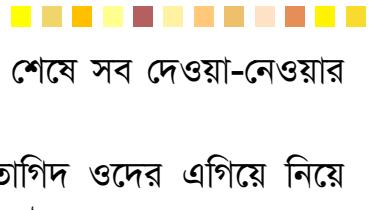
প্রায় মাসখানেক পর প্রীত একদিন ডাক দেয় – দাদা। স্নেহবশতই চেয়ার টেনে বসতে বলি। উদ্দেশ্য একটাই, সেদিনের ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

প্রীত না বসে পাল্টা বলে – কল সুবহ আপসে কাম হ্যায়। আপকো চলনা হোগা মেরে সাথ।

চোখটা একটু বড় করি প্রশ্নাত্মক ভঙ্গীতে। উত্তর না দিয়ে একটু হেসে প্রীত চলে যায়। ওর হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে তফাত ধরা পড়ে।

পরদিন দুপুর বারোটায় প্রীত হাজির। এসেই শুরু হল পুরোন প্রীত-এর হাসি-মজা। ভারি ভাল লাগল ওর হাসি-খুশি নির্মল মুখটা। তাড়াতাড়ি রেতি হয়ে বেরোই ওর সাথে। বেশ কিছুটা এসে বুঝি আমরা চুকচি কোন এক অফিস পাড়ায়, বাইকটা সোজা এনে দাঁড় করায় এক মাঝারি মাপের ভ্যানের সামনে। তখনও বুঝিনি আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে এক চমক, ভ্যানটির পিছনেই। এগিয়ে দেখি অধীর অপেক্ষায় রয়েছে বাকিরা। অবাক কাণ্ড! চারজনে মিলে খুলেছে মোবাইল ফিশ শপ। নামটাও ভারী সুন্দর – কাশী’স্ব।

শুরু হোল আমার প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শেষে বুঝলাম, প্রায় বিরক্ত হয়ে বলা কথাটায় গুরুত্ব দিয়ে, ওর খুলেছে মাছের দোকান। গাড়িটা নিয়েছে ভাড়ায়। শিশুর মত আগ্রহে সব দেখছিলাম। সুন্দর ডেকোরেট করে



রাখা মাছের বিভিন্ন প্রিপারেশন। কাস্টমার এলেই তৎক্ষণাত্মে রেডি করে সার্ভ। দিনের শেষে সব দেওয়া-নেওয়ার পর থাকে প্রায় হাজার খানেক টাকা। প্রীত বলে – কেয়া দাদা, ঠিক হ্যায় না?

উত্তর দেওয়ার ভাষা সে মুহূর্তে আর ছিল না। শুধু বুঝলাম, কিছু করার তাগিদ ওদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সত্যিই এ জগৎ সংসারের রহস্য বোঝা ভার। কখন কোথায় তা বাঁক নেয় কেউ জানেনা।

প্রশ্ন করি – রাতকা অফিস?

উত্তর আসে – দো দো করকে সমহালতে হ্যায়। এক কথায় মনের সব দ্বিধা কেটে যায়। বিশ্বাস আসে ওদের ওপর। খুশি মনে বিদায় নিই ওদের কাছ থেকে।

সময় তার নিজস্ব নিয়মেই এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলে প্রীতদের ব্যবসা ও আমার অফিস জীবনও। অগোছালো কাশী ইনফোকম-এর জীবন থেকে বেরিয়ে নতুন অফিসে জয়েন করেছি; কেটে গেছে প্রায় বছরখানেক, হয়েছি আরও ব্যস্ত, থাকার জায়গারও পরিবর্তন হয়েছে। কর্মব্যস্ততার মাঝে প্রায় ভুলতেই বসেছি ওদের কথা। একদিন নতুন ফ্ল্যাট-এ ঢোকার মুখে দেখি প্রীত দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে ওপরে যাই। চেহারা দেখে তো মনে হয় ভালই আছে। ফ্ল্যাটে চুকে শুরু হয় নানা কথা।

শেষে প্রীত জানায় তার আসার উদ্দেশ্য। ব্যাপারটা শুনে বুঝি প্রীত-এর ভেতরটা রয়েছে একই রকম। ওরা চারজন অফিস ছেড়ে দিয়েছে। ঐ অফিস থেকেই জোগাড় করেছে আরও দশটি ছেলে। শুরু হয়েছে আরও চারটে মোবাইল ফিশ শপ। একটি নতুন দোকান কিনেছে, শুরু হচ্ছে একটি স্থায়ী কাউন্টার। তারই নিমন্ত্রণ নিয়ে হাজির প্রীত।

মোবাইল ফিশ শপ-এর ধার ও ভার বাড়া নিয়ে কোনও সন্দেহ রইল না আর। প্রীত জানায়, জীতুয়া যোগ দেওয়ার পর থেকে ব্যবসার অনেক শ্রীমদ্বি হয়েছে। একে একে এসেছে সবাই। কাউকেই জোর করে আনা হয়নি। স্বেচ্ছায় শ্রম ও অর্থের জোগানে এগিয়ে চলেছে কাশী'স্ব।

কথার মাঝখানেই ওকে থামাই, বলি – বিয়েটা?

এবার প্রীত লজ্জা পেয়ে যায়। অনেক চাপাচাপির পর একটি মেয়ের কথা বলে, নাম – নেহা। নামটা শুনে চোখটা একটু ছেট হতেই প্রীত হেসে বলে – হাঁ... হাঁ দাদা, যো আপ সোচ রহে হো, ওহি সচ হ্যায়। হমারি অফিস কি নেহা। যে সব উনহি কি চক্র হ্যায়।

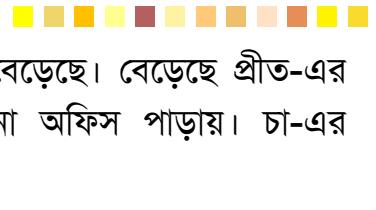
নেহা-ই নাকি জোর করে প্রীতকে আমার সাথে কথা বলতে বলে। আর আমার উত্তর শোনার পর বলেছিল – ওহি সহি, শুরু তো করু।

প্রীত-এর কথা আর যেন প্রায় কিছুই কানে যাচ্ছে না; শুধু মনে পড়ছে অফিসের সেই প্রথম দিনটি। মেজনাইন ফ্লোর-এ এডমিন-এর অফিস। অফিসের জয়েনিং-এর সব কাগজপত্রের কাজ সেরে বসে আছি এম.ডি.'র সাথে দেখা করব বলে। চুপ করে বসে দেখছি সকলকে। বার বার চোখ যাচ্ছে দূরে বসে থাকা কর্মরতা মেয়েটির দিকে। মাঝারি মাপের চেহারা, স্টেপকাট চুল, নীল জিনস, ও গোলাপী ঘাঘরার মত টপটিতে লাগছে বেশ। নিজের খেয়ালে আমার ব্যক্তিগত তথ্যগুলো কম্পিউটারে এন্ট্রি করে চলেছে। টেবিলের ঠিক ওপরেই এ.সি.-র ডাক্ট থাকায় চুলগুলো হাওয়ায় একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে ফেরে – দাদা, আপকা কোয়ালিফিকেশন কে সাথ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ফিট নেহি হ্যায়।

মুঁচকি হেসে বলি- কিঁউ?

পালটা হেসে, পেনটা ঠোঁটে লাগিয়ে এক গভীর দৃষ্টি নিয়ে বলে – পতা নেহি।

চোখের সামনে হাত নাড়া দেখে ছঁস ফেরে। প্রীত বলে – পর্দার আড়ালে সেই ব্যবসার পরামর্শদাত্রী।



সময় গড়িয়েছে। স্থায়ী দোকানের উদ্বোধনে গেছি। যোগাযোগগুলো আরও বেড়েছে। বেড়েছে প্রীত-এর যাতায়াতও। একদিন অফিসে হাজির। পিক্র আপ করে নিয়ে যায় সেই পুরোনো অফিস পাড়ায়। চা-এর দোকানের সামনে বাইকটা দাঁড় করিয়ে বলে – এক রিকোয়েষ্ট থা।

- ক্যায়া?

- মেরা এক দোক্টকো ধন্দা করনা হ্যায়। আপ বোল দিজিয়ে না কৈসে শুরু করেঁ।

আমি কিছুতেই প্রীতকে বোঝাতে পারিনা যে ওটা না ভেবে বলা কথা। খানিক প্রায় জোর করেই বন্ধুকে এনে হাজির করে আমার কাছে। সেই শুরু...

আরবসাগরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক ঝড়। পেরিয়েছে প্রায় দশ বছর। প্রীত-দের ব্যবসা বেড়ে এখন অনেকটাই বড়। পুরো মুস্বাই জুড়ে ফিশ শপ-এর চেইন। তৈরি হয়েছে ব্র্যান্ড। নাম রয়ে গেছে সেই কাশী'স্।

আর আমার?

করতে এসেছিলাম চাকরি, প্রীত-এর বন্ধুদের সাহায্য করতে করতে কখন হয়ে গেছি বিজনেস্ কনসালটেন্ট, তা নিজেও টের পাই নি।

একদিন হঠাৎ

হিমাদ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথায় হেনা লাগিয়ে বসেছিল মৈথেলি। আজকে উইক অফ। এই উইক অফ'টাতেই ও একটু রূপচর্চা করে। রূপচর্চা মানে একটু চুলের যত্ন, একটু মুখের ত্বক দেখাশুনো, একটু নখ শেপ করা। এমনিতে তো সময় হয় না। টেকনোপলিসের ব্যাক অফিসে আছে ও। বিরাট ওয়ার্ক লোড। শুধু অফিসে কাজ করলেই হয় না। ল্যাপটপ-এ বাড়িতে বসেও অনেক কাজ আপডেট করতে হয়। এদিকে বাড়িতে বাবা শয্যাশায়ী। জোর করে কোম্পানি থেকে ভলান্টারী রিটায়ারমেন্ট করিয়ে দেবার আঘাতটা মেনে নিতে না পারায় একটা সেরিবাল এ্যটাক বাবাকে বিছানায় ফেলে দিয়েছে। আজ মৈথেলির মা'কে গোটা ভেতরটা আর ওকে বাইরেটা সামলাতে হয়। যে টাকা বাবা পেয়েছে, তা ব্যাকে ফিল্ড করলেও তো ভিক্ষা। তাই মৈথেলি'কে বাবা'র অমত সত্ত্বেও বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছে। ও অফিসে বেরিয়ে যায় সকাল সাতটায়। তারপর থেকে সে-ই মা। সংসার সামলায়, বাবাকে সামলায়, কিন্তু মুখে রাা-টি কাটে না। মানুষ যে নিতান্ত আপনজনকেও শুশ্রাব করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তা যেন মা'কে দেখে বুঝতে পারে মৈথেলি। ক্লান্ত হয়ে মেয়ে বাড়ি ফেরে, তাকেও দেখতে হয় সেই মা'কেই। মৈথেলির কিছু করারও নেই। অনেকবার ভেবেছে, চাকরীটা ছেড়ে মা'র পাশে থাকবে। তবে মা একটু সঙ্গী পায়। মা-টা আর পারেনা এই বয়সে। কিন্তু ভয় হয়। এ্যাতোগুলো টাকা মাইনে! মা'র যদি কিছু হয়ে যায়, তবে অন্তত বাড়িতে কাজের লোক, নার্স বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে গেলে টাকা চাই। বাবার জমানো টাকাতে সারা জীবনটা চলবে না, চলতে পারে না। তাই বিয়ে-টিয়ে করার কথা ভাবতে পারে না মৈথেলি। একগাদা রূপ নিয়েও মৈথেলি আইবুড়ি। অবশ্য ওর হাবভাব দেখে কোন ছেলে ওর আইবুড়িত্ব ঘোচাতে ধারে-কাছে ঘেঁষে না। ঘেঁষাই সার হবে। ঘেঁষাঘেঁষি তো হবে না। হতে পারে না। বাবা বা মা ছেড়ে ওর পক্ষে চলে যাওয়া সন্তুষ্ট নয়।

মৈথেলি কালকেও রাত তিনটে পর্যন্ত ল্যাপটপ-এ কাজ করেছে। মনে মনে ভেবেছে, কাল তো উইক অফ। বেশ করে স্নান-টান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নেবে ঘণ্টা বারো। তাই-ই করে ও। কিন্তু...। ভাবলেই তো হয় না। ভাগ্য চাই। ঘুম তো হলই না, মা'কে নিয়ে বেরোতে হোল। বাবা বলল,

- যা না, মা'কে একটু রেখেই আয় না। সারাটা দিন না হয় এখানে সাধনা থাকবে। অবশ্য না থাকলেও তেমন কিছু হবে না। রান্না তো করেই যাবি। আমি তো চলতে-টলতে পারি, না কি! ম্যানেজ করে নেব'খন।

- তুমি বেশি পাকামো করো না তো। চুপ করে চা-টা খাও। আমরা বড়ো বুবাবো, কী করতে হবে।

মেয়ের রসিকতায় বাবা চুপ করে। বাবার শরীরটা এমন খারাপ হওয়া ইস্তক মেয়ে এমনটাই বলে। এটুকুই তো জীবন। মেয়ে আর তার মায়ের সাথে একটু রঙ-রসিকতা। এটা তো ছাড়া যায় না। মেয়ে-ও তাই শিখেছে। ‘আমরা বড়ো’ মানে মেয়ে, ও নিজে, ওর মা আর কাজের লোক সাধনা। মাঝে মাঝে সাধনাকে বললে সন্ত্বে পর্যন্ত সে এ বাড়িতে কাটিয়ে দেয়। অন্তত টিভি-টা তো দেখতে পারে প্রাণ ঢেলে। সেই প্রস্তা-বটাই বাবা দিয়েছে। কিন্তু মেয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য পরে সেই প্রস্তা-বটাই মানতে হোল ওদেরকে। তবে একটু অধিকন্তু চাপিয়ে নিয়ে। মা যে-কটা দিন বড়মামার বাড়িতে থাকবে, ততদিন দু'বেলাই খাবার আসবে হোম ডেলিভারি থেকে। আর সে-ই সাধনা অন্য কাজ সেরে-টেরে এ বাড়িতে সন্ত্বে পর্যন্ত কাটাবে। ওর খাওয়াটাও আসবে হোম ডেলিভারি থেকে। মৈথেলি ফিরে আসে সন্ত্বে সাত-টার মধ্যে। তখন সাধনা চলে যাবে। ক'টা মাত্র দিন। মা ফিরে এলেই সাধনা যেমন কাজ করে চলে যায়, তেমনই যাবে।

মা'কে যেতেই হচ্ছে বড়মামার বাড়ি। বাবা-ই জোর করল। সত্যি-ই তো। যাওয়া তো উচিত। দিদুনের বয়স হয়েছে। তার ওপর এটা থার্ড-বার এ্যাটাক। যদি সারভাইভ না করে? তবে মা'র মনে একটা খিঁচ সারা জীবনের জন্যে ধরে থাকবে। তাছাড়া একটা মানসিক উচাটন নিয়ে তো কাজও করা যায় না। নানা ভুলভাল হবে, চোখের জল ফেলবে, বাবা নিজেকে অপরাধী মনে ক'রবে। তাই বাবা-ই বলল,

- যা না। মা'কে রেখে আয় না। তুই তো আছিস। কী আর হবে!

মৈথেলি জানে, মা'র বিরাট দুর্বলতা মা'র বাপের বাড়ি। সেখানে কারোর এ্যাতোটুকু কিছু হলে মা অস্থির দারণ হয়। বাবা-ও জানে। তাই এ্যাতো কথা বাবা বলছে।

মাথায় হেনা মেখে বসেছিল তো এসব জানার আগে। ল্যাপটপ ছিল ল্যাপ-এ। ন-আঙুল চলছিলো ঝড়ের বেগে। কাল রাতে পুরোটা সারতে পারেনি। একটু বাকি ছিল। সেটাকে সবে কমপ্লিট করেছে, বেজে উঠলো ‘আমার রাত পোহালো...’। এটা মৈথেলির রিং-টোন। কানে ধরতেই, বড়মামা।

- মিতু, তোর মা কোথায় রে?

- কেন, বড়মামা?

- আস্তে কথা বল। মা কোথায়?

- মা তো কিচেনে। কেন? বলো না।

- আরে, বলবো বলেই তো ফোনটা করলাম। কিন্তু দিদিকে বলা যাবে না।

ফিসফিস করে মৈথেলি বলে, ‘কী হয়েছে গো, বড়মামা? দিদুন ক্যামন আছে? ভালো তো?’

- না। সকালে একটা এ্যাটাক হয়েছে। তাই তোকে জানালাম। তোর মা'কে বললে তো জানিস...। তুই তো এখন বেরোবি অফিসে। ফেরার পথে একবার ঘুরে যাস। তা হলেই হবে। তোর মা'র কাছে দোষ কেটে যাবে।

- না। আমার তো আজ উইক অফ। কিন্তু বড়মামা, মা'কে আদৌ না বলাটা কী ভালো হবে? তার মা বলে কথা। তুমি তো জানো সবই। আমি দেখছি, কী করা যায়।

- দ্যাখ, যেটা ভালো বুঝিস। কিন্তু সাবধানে।

- দিদুন কোথায় এখন? নার্সিংহোম-এ কি?

- হ্যাঁ।

- তুমি ভেবো না। দেখছি, কোনটা সুবিধে হয়।

ফোনটা কেটে মনে মনে একটা গৎ আওড়ে নেয় মৈথেলি। মা'কে কী ব'লবে, কেমন কায়দায় বলবে। এই কারণেই বাড়িতে গোটা সিস্টেম পালটে ফেলতে হোল। মা কিন্তু সব শুনে-টুনে তেমন কোন রি-এ্যাকশন দেখালো না। শুধু তার যাওয়া পাকা হতে একবার মেয়েকে বলল,

- তুই অফিস সামলে এসব পারবি?

কিন্তু মেয়ের চোখ পাকানোতে মা-ও চুপ করে যায় বাবার মতো।

মা'কে নিয়ে বেরিয়েছে মৈথেলি। তিনটে বেজে গেলো। বাবার খাবার ব্যবস্থাটা করে বাবাকে খাইয়ে-দাইয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সাধনা তো তার কাজকর্ম সেরে আসবে। ও না এলে যাওয়া চলে না। এমনকি ও রাজি না হলে আদৌ মা'র যাওয়া হতো না হয়তো। স্টেশনের কাছেই মৈথেলিদের বাড়ি। বড়মামার বাড়ি যেতে ট্রেন ধরতে হয়, শিয়ালদায় নেমে বাস। স্টপেজে নেমে মিনিট ছয়েক হেঁটে বড়মামার বাড়ি। ও অফিস যায় বাস-এ। সোজা এক বাসেই অফিস। নো ঝুট, নে ঝামেলা। এক ঘণ্টার জার্নি। বসার সীট-চিট জুটে যায়। টারমিনাস ওদের বাড়ির সামনেই। ফলে ট্রেনে ওঠা একটা বিরাট বিরক্তিকর ব্যাপার মনে করে মৈথেলি। সেই

ভিড়, ঠেসাঠেসি, গাদাগাদি, গায়ের দুর্গন্ধি। এসব বালাই নেই ওর বাসে। যারাই বাসটায় ওঠে, তাদের পকেটে রেস্ত আছে। ভাড়া বেশি। শিয়ালদা থেকে বাস মানে লক্ষণ-বক্ষণ। চৌতিরিশ-এর বি... না যেন কত! মাই গড়! আজকে মারাই যাবে টেকনোপলিসের একজিকিউটিভ ম্যাডাম মিত্র। মামার বাড়ির সামনে যে রাস্তা, সেটা তো দুঃস্বপ্নের মতো। দোকান-ফোকান কিছু নেই। শুধু গাদা গাদা হকার ফুটপাথ দখল করে বসে আছে। প্লাস্টিক টাঙ্গিয়ে, উনুন জ্বালিয়ে, যমের মতো মাছ কাটার বাঁটি খাড়া করে... সে এক যা তা কাণ্ড। হাঁটার কোন কায়দা নেই। কোনরকমে শরীর একিয়ে-বেঁকিয়ে পেরোতে হবে পথটা। বড়মামারা ভাড়া থাকে। বাড়িটা প্রায় তিনশো বছরের পুরনো। দাদুর বাবা ভাড়া নিয়েছিলেন। ভাড়া ছিল তেরো টাকা। মালিক অনেক দয়া ভিক্ষা চাইবার পর আজ তা হয়েছে সাকুল্যে একশো বারো টাকা। আজকাল মালিক ভাড়া নিতে আসেওনা। তার তো গাড়ি ভাড়াও পোষাবে না। সাকুল্যে তিনটে ঘর। কিন্তু স্যাতলা পড়া ছাল ওঠা দেওয়াল, রহস্যময় কড়ি-বড়গার ছাদ। মনে হয়, জোব চারণক-এর আমলের কোন বাড়িতে এসে উঠেছি। কিন্তু যেতে হবে। একটাও কিল খেতে না চাইলেও কেউ যদি ধরে কিল মারে, তবে যে কটা মেরে পারে, তা খেতে হবে। কিছু করার নেই। আজ অন্তত বছর ঘুরে গেছে, বড়মামার বাড়িতে যায়নি মৈথেলি।

ট্যাক্সি নেয়ার ক্ষমতা নেই মৈথেলির, তা নয়। কিন্তু ফাঁকা লোকাল ট্রেনটা দাঁড়ানো দেখতে পেয়েই মনে হলো, টাকাটা বাঁচানো যাক। তাহলে মামার হাতে আরো কিছু বেশি টাকা দেওয়া যাবে। তাই টিকিটটা কেটে ট্রেনে উঠেছে। শুরুতে তেমন ভিড়-টিড় ছিল না। কিন্তু দুটো স্টেশন যেতে না যেতে পিলপিল করে মানুষ ছুটে এসে ট্রেনের দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। বেলা বাজে তিনটে। এ্যাতো বেলায় এরা সব যায়টা কোথায়! একটু বাড়িতে কি তিষ্ঠোতে পারে না! কী মানুষ রে বাবা! এদের সবার তো বিপদ ঘটেনি। দরজার সামনে একটা ফলওয়ালা তার ঝাঁকাটা ঘটের মতো বসিয়ে রেখেছে আর নিজে কয়েকটা ফল হাতে নিয়ে ভেতরে ডেমো দিতে গেছে। কীভাবে মানুষ উঠবে গাড়িতে! ওর মা না হয় ভেতরে ঢুকে গেছে। শিয়ালদায় নামতে কোন প্রবলেম হবে না। কিন্তু একটা জিনিস অবাক হয়ে দেখছে মৈথেলি... কেউ তেমন জ্ঞানে করছে না। কেউ কিছু বলছে না। তারপর শুরু হোল বাদাম, দাদ, হাঁজা, চুলকানি, লেবু লজেন্স, পেয়ারা, আপেল... মানে হরেকরকম্ব। এবার এলো সারা গায়ে মোবাইল কভার থেকে শুরু করে সেফটিপিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে বিক্রী। তার গা-এ কী আছে, আর কী নেই! তারপর তাদের গা জ্বালানো কঢ়ে আর কায়দায় হকিং। একেকজন একেকরকম। কী বিরক্তিকর! এরপর একটা রুই-কাতলা-ট্যাংরা-তেলাপিয়া উঠলেই সোনায় সোহাগা। ঘোলোকলা পূর্ণ হয়। গোটা বাজারটাকে ট্রেনে এনে তোলা যায়। সত্যি, একটা বিদেশীর কাছে এ দৃশ্য! কী লজ্জা! কী লজ্জা! ভাগিস, এটা ঘোর গ্রীষ্মকাল নয়। যাত্রীরা তো একে অপরের গায়ে ডলাই-মলাই করতে করতে চলেছে। তাতে যদি ঘেমো হতো তো কথাই নেই। কিন্তু সবাই নির্বিকার! মৈথেলি হাঁ করে দ্যাখে, কী অস্তুত এ্যাড্যাপ্টেশন! কী টলারেন্স! সরকার করছেটা কী! এই কি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম? বসে বসেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও। দাঁড়িয়ে থাকলে তো হয়তো মেরে-মুরেই দিতো।

কিন্তু 'মৈথেলি'র মায়ের কোন হেলদোল নেই। মা একটু চুপচাপ। মেয়ে সবটা খুলে না বললেও নানা চিন্তা হয়তো করছে। মা তার ছোট গণ্ডির বাইরে ভাবতে জানে না। রাজনীতি, অর্থনীতি, বেকারী, গণহত্যা, দুর্নীতি, জঙ্গি... কিছুই না। আজকে বোধহয় নিজের মা'কে নিয়ে খুব ভাবছে। মা একটু বেশি ভাবে। সত্যিটা বুঝতে পারে না। আরে, তুমি তো ডাক্তার নও। ভেবে-চিন্তে তো কোন স্টেপ নিতে পারবে না। ভাববে, ডাক্তার আর বড়মামা। তাছাড়া তোমার মা-এর বয়স হয়েছে। চলে যাবার বয়স থেকে বেশি। মেনে নাও। বড়মামীরও তো বয়স হয়েছে। সে বেচারি কি পারে এ্যাতো নার্সিং করতে!

শিয়ালদায় নামতে দেখলো, সেখানেও গিজ গিজ করছে হকার। গোটা প্লাটফর্ম-টা জুড়ে ওদের রাজত্ব। হাজার পসরা সাজিয়ে বসে আছে। সেই যে, ‘আমার এ ছেট ঝুড়ি, এতে রাম-রাবণ আছে...’। মানুষ এমন করে ডাকছে যেন ওদের থেকে জিনিস-পত্র কিনতেই মানুষ বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। ওদিকে স্টেশনে জন-সমুদ্র চুকচে-বেরুচে। মৈথেলিকে এসব পোয়াতে হয় না। ও যায় সেট্র ফাইভ-এ। সেটা তো ঝাঁ চকচকে করপোরেট পাড়া। ওর অফিস তো কথাই নেই। সরকারি লেভেলের আচ্ছা-আচ্ছা উচ্চপদস্থ কর্মচারীও ওই অফিসে কোন কাজে চুকতে দু'বার ভাববে।

কিন্তু রবিঠাকুর বলেছেন, ‘আজি সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে।’ তার মানে, যাত্রীদের সাথে রং-মেলান্তি করতে করতে, গা ঘষতে ঘষতে অগত্যা মা-কে নিয়ে বেরলো স্টেশন থেকে। সামনেই এবার বাস। সেটা ততটা জ্বালালো না। স্টপেজে নেমে সেই কুখ্যাত রাস্তা। এখানে-ওখানে ছড়ানো শালপাতা, পলিথিন, মাছের আঁশ, ফলের আর তরকারির খোসা-ভুতি গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেসব ডিঙিয়ে-পেরিয়ে যেতে হবে। ফলে সালোয়ারটা খানিক তুলে নিয়ে ঘিনঘিন করা গা সামলাতে সামলাতে নিজেকে ‘কন্ট্রোল কন্ট্রোল’ বলতে বলতে যখন পৌঁছল বড়মামার বাড়িতে, তখন বিকেল পাঁচটা। সন্তায় জার্নি-র তিন অবঙ্গ। বড়মামা, ভাই, পঞ্চমামারা সব গেছে নার্সিং হোম-এ। এখন সেখানে যাবার কোন মানেই হয় না। নার্সিংহোমটা কাছাকাছি নয়। তাছাড়া চেনাও নয়। থাক, এখানেই ডিটেল জেনে নেওয়া যাবে’খন। মা বলল,

- তুই কিন্তু এখনই চলে যাস না, মিতু। একটু বসে যা।
- কেন গো?
- মামারা ফিরুক আগে। অন্তত জেনে যা, দিদুন কেমন আছে।

সেটা তেমন জরুরি নয়। তবুও মনে মনে ভেবে নেয় মৈথেলি – কত আর রাত হবে! সাতটা, বা আটটা। বসাটা ভদ্রতা। টা নয়তো বাবাও জানতে চাইবে তার শাশুড়ির খবর। তাই মা’কে বলল – সে তো বটেই। এ্যাতোদূর এলাম কেন?

ল্যাপটপটা তাড়াছড়োয় আনেনি সাথে। আনলে বসে কিছু কাজ এ্যাডভান্স করে নেওয়া যেতো। ঘুম তো হলনা। শরীরটা বেশ ঝুঁকে আসছে। ক্লান্ত লাগছে। মোটে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছে রাতে। এতে কি হয়! তাই বড়মামীকে বলে নিজেই চা বানালো, সকলকে দিলো, আর ফ্লাক্সে রেখে নিজে নিলো। যদি ম্যাজমেজে ভাবটা যায়। সোফায় বসে দেখলো, তলাকার তাকে একটা লেডিস ম্যাগাজিন রয়েছে। সেটা উল্টে-পাল্টে দেখে বিমুনি ভাবটা কাটাতে চাইলো মৈথেলি।

এখান থেকে বেরোতে সেই বেজে গেল সাড়ে সাতটা। ভাই বলল – চল দি’ভাই, তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

- না না, তুই বাড়িতে থাক। বড়মামী তো দিদুনকে দ্যাখে। তুই একটু তোর মা’কে দ্যাখ। মা কিন্তু ভেঙ্গে পরবে। আমি বেরিয়ে যাবো ঠিক। আমি তো একাই চলি রে, বাবা।

বেরিয়ে পড়ে শেষে মৈথেলি। কিন্তু রাস্তায় এসে দ্যাখে, একি! গোটা রাস্তা শুনশান। কোন হকার-ফকার কোথাও নেই। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এ্যাতো সকাল সকাল সব গেলো কোথায়! ওদের বিক্রী-বাটা কি মিতে গেলো! এটা কি সন্তুষ্টি! তাহলে কি হল্লাগাড়ি আসবে বলে কোন খবর আসতে সব কেটে পড়েছে? ওদের সাথে তো পুলিশের একটা আঁতাত থাকে। আগে থাকতে এসব খবর এসে যায়। ওরাই ভক্ষক, আবার ওরাই তো রক্ষক এদের। সর্বনাশ! এ তো কেউ কোথাও নেই! একটা দমকা হাওয়া যেমন রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজের টুকরোগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমন করে এদেরকে কোথায় নির্বাসন দিয়ে এসেছে! এর আগেও তো এখানে এসেছে ও। রাত অন্তত সাড়ে ন’টা অবধি তো রাস্তায় লোকারণ্য থাকে। অবাঞ্ছিত স্পর্শ বাঁচাতে

হেলে, গা বেঁকিয়ে-চুরিয়ে পার হ'তে হয়। তা নয়তো যেখানে সেখানে পা পড়ে যাবে, ঘার-তার গায়ে ধাক্কা লাগবে। কিন্তু এ তো ভালো জ্বালা হোল। এতো রাত দুটো'র রাস্তা! ঈশ্বর যেন ওর প্রার্থনা শুনে একটা পরিষ্কার রাস্তা ওকে উপহার দিয়েছেন। এবারে তো নো ঝুট, নো ঝামেলা। কিন্তু বেশ ভয় ভয় করছে তো! অচেনা অজানা জায়গা। তাই একবার মনে মনে ভাবল মৈথেলি, তাহলে ফিরে গিয়ে ভাইকে সাথে নিয়ে আসবে। ও যদি বাসে তুলে দিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই নারীত্বে লাগলো ওর। কেন? একজন পুরুষকে এভাবে অবলম্বন করতে হবে কেন? ভাই হলেও ও তো পুরুষ বৈ অন্য কিছু নয়। যদি দুম করে কোন অবাঞ্ছিত মন্তব্য করে বসে? থাক। কী আর হবে! একবার পেছনে তাকিয়ে ফেলে আসা রাস্তাটা দেখে নিয়ে একটু সাহসিনীর মতো পা দাবড়ে-দাবড়ে এগিয়ে চলল মৈথেলি। একটু এগিয়েই মনে হোল, কেউ বা কারা যেন ফলো করছে। একটু ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে নিলো। হ্যাঁ, পেছনে আসছে দুটো লোক। চুপচাপ। সন্দেহজনক নয়, আবার সন্দেহজনক। একটু ভেবে মৈথেলি হাঁটা-টা একটু আস্তে করে দিলো। ওমা! লোকগুলোও তো ওদের গতি আস্তে করেছে! কী কেস? এবারে সাহসে ভর করে সোজা পেছন তাকায় মৈথেলি। মা বলে, ভয় পেলে নাকি এসব হয়। আসলে কেউ নেই, কিন্তু কেউ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু কৈ? কেউ তো নেই! খেয়েছে! ভূত-টুত নাকি রে বাবা! বেমালুম উবে গেলো লোকদুটো! এখানে তো কোন গলি-ঘুজি নেই যে, ঢুকে পড়বে।

ভূত কখনও দ্যাখেনি মৈথেলি। কিন্তু এ দেশের মেয়ে ভূত মানে না, মানে, সে মেয়ে নয়। তাকে বলা হয় – এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়। ফের হাঁটতে গিয়ে গতিটা বেশ বাড়িয়ে নিলো মৈথেলি। হঠাৎই ও আবিষ্কার করলো যে, ওরা দু'জন নয়। এবারে চারজন জোরপায়ে ওকে ফলো করছে। মৈথেলি জানে, ওরা ওর থেকে কিছু নিতে পারবে না। ও সোনা-ফোনা পরে না। আর ব্যাগ-এ তেমন কিছু নেই। অনেকটাই মা'কে দিয়ে এসেছে বড়মামার হাতে দেবে বলে। অন্তত মা তো বড় বোন। তাই আর কোন চাল্ল না দিয়ে, সময় নষ্ট না করে এবারে দে ছুট। ওই তো বাস স্টপেজ। ওখানে তো লোকজন থাকবে নিশ্চয়ই। দেখলো, হ্যাঁ, আছে। একটা বাস'ও দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরই বাস। ধাঁ করে বাসে উঠে তবে নিশ্চাস নিলো মৈথেলি। যাক বাঁচা গেলো। মন বলল, না, তাহলে গোটাটা মনেরই ভুল। ওরা হয়তো নিরীহ মানুষ। বেকার ভয় পাচ্ছিলো।

শিয়ালদা স্টেশনে এসে দেখলো, আর একটা বিস্ময় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। গোটা শিয়ালদা চতুর-টা খাঁখাঁ। কোন হকার নেই। চাকরীর ফর্মওয়ালা থকে শুরু করে লেবুওলা পর্যন্ত। কেউ নেই। হোলটা কী! প্লাটফর্ম-এর বাইরে নেই, ভেতরে নেই। সিগারেট-বিড়ি তো আগেই উঠেছে। সাজানো-গোছানো একটাও দোকান, এমনকি হৃইলারস-গুলো পর্যন্ত নেই। এই তো যাবার সময় দেখে গেলো। এর মধ্যে সব গেলো কোথায়! না হয় নতুন সরকার এসেছে। নানা ম্যাজিক করছে রোজ। করুক। কিন্তু এটা কী! দেশ কি পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত? কলকাতাকে তিলোত্তমা করতে সরকার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কিন্তু এটা কি সন্তুষ! এ্যাত দ্রুত! চারদিকে যদি এরকম নৈঃশব্দ থাকে, তবে তো মহা মুশকিল। না, প্যাসেঞ্জার আছে। তারা নানা ট্রেনে রোজকার মতো উঠছে-নামছে। সেখানে কোন গঙ্গোল নেই। তবে আজকে ভিড় বেশ বে-এ-শ পাতলা। হঠাৎ মনে পড়লো, ওহো! আজ তো সেই ছিল। জেনারেল বা সরকারি ছুটিগুলো মৈথেলিরা ভোগ করতে পারে না বলে মনেও থাকে না, কবে কোন কমন হলিডে। ওদের তো তা নেই। প্লাটফর্ম খুঁজে দেখলো যে, ওর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। শিডিউল টাইম জানে না ও। জানবার-ই বা কী দরকার! ছাড়বে তো বটে। এবারে তো নিশ্চিন্ত! কিন্তু ট্রেনের মধ্যেও এলো আতঙ্ক। একেই ভীষণরকম পাতলা প্যাসেঞ্জার, আর তার ওপর আজকে তো একটাও হকার-টকার নেই। নো লেবু লজেন্স, নো হরেকরকম পাঁজি-পুঁথি, নো বাদাম, নো সেদ্ব ডিম। কী কেস রে বাবা! সব গেলো কোথায়? ও লেডিস্-এ ওঠেনি। লেডিস্ কামরা কোথায় পড়ে, জানেও না মৈথেলি। আজকে অত খোঁজাও যাবে না। গোটা চার নম্বর প্লাটফর্ম-টা ঘুমন্ত সাপের মতো একটু বেঁকে শুয়ে আছে।

আরও আগে এগিয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার! বড় নির্জন, বড় একা একা। একটা নিরাপত্তাহীনতা গ্রাস করছিল ওকে। কবে যেন কে বলেছিল, ‘লেডিস্ কামরায় কোনোদিন ভুলেও উঠবি না। সব অসভ্য মহিলা উঠে বেজায় ঝামেলা করতে করতে যায়। মুখ খারাপ করে।’ তাছাড়া আজ যদি জেনারেল-এর এমন হাল হয়, তবে সেখানে তো একটাও মহিলা পাওয়া যাবে না। থাক, বাবা। দরকার নেই মহিলা সঙ্গ করার। পুরুষেরা অতটা অসভ্য হয়ে পারেনি এখনও।

কিন্তু ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন কামরায় সর্বসাকুল্যে গোটা দশেক যাত্রী। ট্রেন-টা ছাড়তে না ছাড়তেই গেটের মুখে দাঁড় করানো লোহার রড-টা দক্ষ হাতে ধরে কামরাটায় উঠে পড়লো চারটে লোক। মৈথেলির মনে হোল, এরাই যেন রাস্তার সেই চারটে লোক। ওকে ফলো করতে করতে ট্রেন অবধি এসে উঠেছে। ওই রাস্তায় আলো ছিল বটে। কিন্তু তা সেই কভার দেওয়া টিউব লাইট। তাতে পোকা আটকে পড়ে পড়ে আর মরে মরে তা তো অন্ধকার। অন্ধকারে তো লোক চারটের মুখ দেখতে ভালো দেখতে পায়নি মৈথেলি। এসব নিশ্চয়ই রাজনৈতিক গুণ্ডা নয়। রাজনীতি তো ও করে না। ওদের অফিসে তো কোন ইউনিয়ন-ফিউনিওন নেই। তাহলে শক্রতাটা কী? ওকে ফলো কেন? ট্রেন ছাড়তেই লোকদুটো হঠাৎ তাদের মাজা থেকে আগ্নেয়ান্ত্র বের করলো। বেশ পরিষ্কার হওয়া গেল যে, ওরা ডাকাত। ঘড়ি, চেন, মানিব্যাগ, মোবাইল, আংটি, কেড়ে নিতে এসেছে। যেভাবে কলকাতায় হকার তুলে শহর-টাকে তিলোক্তমা বানানো চলছে, তাতে তো লোক এই ব্যবসা ধরবেই। আজকে এমনটাই প্রথম মনে হয় মৈথেলির। ও ভাবে, তা নয় তো ওদের স্ত্রী-সন্তান খাবে কী? যে কটা পুরুষ কামরাটায় বসেছিল, সব চুপচাপ। কোনো রা'টি নেই মুখে। মৈথেলির হাসি পেলো, এরা সব নাকি পুরুষমানুষ। বাড়িতে গিয়ে বউ-এর ওপরে পৌরুষ দেখায়। এখন দ্যাখো, যেন ভ্যাদা মাছ। ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না। এর মধ্যে একটা লোক মৈথেলির কাছে এসে কোন কথা না বলে প্রায় বুকে হাত দেবার মতো করে হাত বাড়িয়ে ওর গলার চেন-টা ধরল।

- এটা খুলে দেবেন, না টেনে নেবো?

কাঁপতে কাঁপতে ও বলল - এটা... না... ইমিটেশন...। আমি... সোনা... পরি না।

- কেন সোনা পরিস না, শালী?

বলে এবারে ওর যত্নে ক্রীম মাখা, ফেসিয়াল করা তুলতুলে গালে পড়লো লোকটার হাতে মারা ‘ঠাস’ শব্দ করা একটা চড়।

ব্যস। চড় খেয়ে একটা ঝটকায় চোখ তাকিয়ে দেখলো মৈথেলি, সামনে ওর মামাতো ভাই দাঁড়িয়ে।

- দিভাই, তুই খুব ক্লান্ত, না? পত্রিকা-টা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। ঠাম্বা একটু বেটার রে। তুই এবারে বেরিয়ে যা। বাড়িতে তো পিসেমশাই আছেন। তোকে তো যেতেই হবে। আর রাত করিস না। সাড়ে সাত-টা বাজে। আমি তোর জন্যেই ছুটতে ছুটতে আসছি। আমি তো জানি, তুই খবরটা জেনেই যাবি। চল, তোকে এগিয়ে দিই।

- থাক। তোরা ক্লান্ত না? আমি পারবো। তোর দি'ভাই কি লবঙ্গ লতিকা নাকি?

ভাই-কে থামিয়ে দিয়ে এবারে মা-কে ডেকে মা'র হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে, নিজের চোখেমুখে জলের ঝাঁপটা মেরে বেরিয়ে পড়ে মৈথেলি। বেরবার সময় কাকে উদ্দেশ্য করে যেন প্রণামও করে নেয় একবার। রাস্তায় এসে দেখল, নাঃ, সব ঠিকই তো আছে। চারদিক আলো ঝলমল। লোহার রডে বাল্ব বুলিয়ে কত হকার নানা জিনিস বিক্রী করছে। জমজমাট গোটা রাস্তা। দুটো লোক বসে দারুণ দারুণ পারশে মাছ বেচছে। রূপেলি ঝকঝকে মরা মাছ। কিন্তু দেখতে জ্যান্ত জ্যান্ত। পারশে মাছগুলো যেন মৈথেলিকে ডেকে বলল, ‘এই মেয়েটা, ভেলভেলে’টা... ঝোল খাবি? তো মাছ নিয়ে যা।’ পারশে মাছ প্রিয় মৈথেলি’র। মনটাও



দিব্য ফুরফুরে লাগছে। তাই কোনো অগ্র-পশ্চাত না ভেবেই আড়াই শো টাকা দরে কিনে নিলো হাফ কেজি। গোটা রাস্তা-টা যেন নাম-না-জানা উৎসবে মেতেছে। কত দোকান! কত হকার! এখানে কে কাকে ফলো করবে! কার বাবার সাধ্য! এ্যাতগুলো মানুষ আছে না! মেরে তত্ত্ব খসিয়ে দেবে। মাছওয়ালাকে বলল, বড়ভাই, একটু ভালো করে প্যাক করে করবেন? আমি তো ট্রেনে অনেকটা যাবো। কেউ গালাগাল না করে।

- কোনো চিন্তা নেই, দি'ভাই। আজই কেটে সাইজ করে দারুণ করে দিচ্ছি। আপনি মনেও রাখতে পারবেন না, প্যাকেটে মাছ, না আপেল।

- আপনি আবার কাটবেন? আপনার তো অনেকটা সময় নষ্ট হবে, ভাই।

- আপনি দিদি, বোধহয় বাজার-টাজার যাননা, না? এটা আমাদের করতেই হবে। আমাদের কে শুনবে, বলুন?

মাছটা প্যাক করে নিয়ে হাঁটা দিলো মৈথেলি। গুনগুন করে গানও ধরল, ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, সুরেরও বাঁধনে...’ এবারে ছ-খানা হ্যান্ড-রুমাল কিনলো ফুট থেকে। বেশ ভালো। দোকানে কিনলে অনেক দাম নিত। স্টেশনে এসে স্টেশন-এ এসে দেখলো, নাঃ, কলকাতা আছে কলকাতাতেই। কোথাও কোনো চেঞ্জ নেই, কোনো নতুন আইন নেই, কোনো সর্বনাশ ঘটেনি কোথাও। ঠাণ্ডা মাথায় টিকেট-টা কাটল মৈথেলি। ভিড়ে ভিড়কার শিয়ালদা স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম চেঁচামেচি-তে পরিপূর্ণ। ‘চিৎকার চেঁচামেচি ব্যস্ততা... এই নিয়ে হোলো কলকাতা...’

ট্রেনে উঠে আরামে নিশ্চিন্তে চোখটা বুজে নিলো মৈথেলি। না, ঘুম আসছে না। বড় আরাম লাগছে। মন গাইছে, ‘বড় বিস্ময় লাগে...’ আজকে প্রথম রাস্তায় বেরিয়ে বড় আনন্দ লাগছে ওর। কোথাও কোনো বিপদ নেই, খেদ নেই, ক্ষেত্র নেই, রাগ নেই, ঘেঁঘা নেই, ছুত্মার্গ নেই। চারদিকে মানুষ আছে। অনেক অনেক মানুষ। তারাই তো ভরসা। তারাই তো পানের থেকে চুন খসলে ছুটে আসবে। এটাই তো আমাদের চেনা শহর। আমাদের তিলোভূমা। মনে পড়ে, টেলিভিশন-এ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম রাদিচে বলছিলেন যে, কলকাতা নাকি বড় নিরাপদ শহর। এমনটা নাকি লন্ডন-এ সন্তুষ্ট নয়। কে জানে বাবা!

হঠাৎ কানে আসে, ‘ছোলে! এ সেদ্ব ছোলে! মশলা ছোলে!’

চোখ তাকায় মৈথেলি। একটা বাচ্চা ছেলে রাত ন'টায় একটা ঝুড়িতে লাল কাপড় দিয়ে আব্রত ক'রে সেদ্ব ছোলা বেচছে। কাপড়ের ওপর সাজিয়ে রেখেছে অর্ধেক করে কাটা পাতিলেবু। এই মশলা ছোলা ছেটবেলা খেতো মৈথেইলি। আজ দেখে নোলা-টা সপ সপ করে উথলো। বড় হয়ে অবধি এসব তো খাওয়াই হয় না।

- আমাকে চার টাকার দেতো, বাবা। ফাইন করে দিবি কিষ্ট। লেবু দিবি না।

এ্যাতো রাতে কোনো দিদিমনি ছোলা কিনবে – এমনটা ছেলেটার অভিজ্ঞতায় নেই। তাই খুব মন দিয়ে ঝালনুন-টুন দিয়ে লোভনীয় মিঞ্চার বানালো। একটু মুখে দিয়ে মৈথেলি বলল, দারুণ বানিয়েছিস। তোর নাম কী রে?

- মন্টু।

- কোথায় থাকিস তুই?

- আগরপারায়। রেলবস্তিতে।

- শোন, এরপর থেকে লেবুগুলো না, কেটে কেটে রাখবি না। বিষ হয়ে যাবে। বুঝলি?

ছেলেটা মাথা নেড়ে সায় দিতেই ওকে টাকা দেয় টেকনোপলিসের এক্সিকিউচিভ মিস মিত্র। আর এই প্রথম ওরকম একটা নোংরা ছেলের চিবুক নিজের পাঁচ আঙুলের মাথা দিয়ে ছুঁয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াতে গিয়েও ছোঁয়াল না মেঠেলি। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। সবাই দেখছে।



ই এম আই

হিমাদ্রী শেখর দত্ত

১

সোমনাথ সকালে বেরোনোর সময়ই ঠিক করে নিয়েছিলো আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। অফিস সেরে দুজনে আজ এ.সি. কিনতে যাবার কথা আছে। খবরের কাগজে ইনষ্টলমেন্ট এ.সি. কেনার সুবিধা এবং নিজেদের পকেটের অবস্থা, এই নিয়ে কাল রাতে তনিমার সাথে লম্বা কথা সারার পরে আজ মনে মনে ও একটু উত্তেজিতই আছে। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন বাড়িতে একটাই পাখা ছিলো। রাতে আর ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া সে পাখা রেণ্ডলার চলতো না, মানে বাবা চালাতে দিতেন না। অন্য সময়ে হলদে তালপাতার পাখার লাল সবুজ ছোপ দেওয়া হাতলের মুখটা দিয়ে বাবা পিঠ চুলকোতেন আর নিজেকে হাওয়া করতেন। ছেলেরা পড়তে বসলে, তাদেরও মাঝে মাঝে এক ঝলক হাওয়া করে যেতেন। তনিমার সাথে বিয়ের দু বছরের মাথায়, একেবারে হঠাতেই মাত্র সাতদিনের অসুস্থতায় উনি সোমনাথকে একেবারে একা করে দিয়ে চলে যান। সাত দিনের মরণ-বাঁচন লড়াইয়ের সময় জানা যায় বাবার ক্যান্সার হয়েছে। প্রষ্টেট থেকে ফুসফুসে এসে পৌঁছানোর জন্যে জানা গেল ক্যান্সার বলে, নইলে শুরুটা বছর দুই আগেই হয়ে গেছিল। যখন বিছানা নিলেন, তখন শেষ করে এনেছিলেন নিজেকে সংসারে, সকলের অলঙ্কে। তনিমাকে খুব ভালোবাসতেন উনি। আজ বেঁচে থাকলে বেশ খুশী হতেন, ছেলে-বৌয়ের এ.সি. কেনার সামর্থ্য আর প্ল্যান দেখে। ওনার রোজগারে, এ.সি. তখন ছিল মধ্যবিত্তের সংসারে বিলাসিতা। এখন যুগ পাল্টেছে, নির্দিষ্ট সময় ঘূম না হলে, মানুষ পরের দিনের কাজকর্ম করে উঠতে পারে না। অসফল দিন কাটিয়ে, তেতো মেজাজ আর মাথাভরা স্ট্রেস নিয়ে, রাতে বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ করতে থাকে। ঘূম আর আসে না।

এখন সাড়ে চারটে বাজে, পৌনে পাঁচটা নাগাদ তনিমাকে একবার মোবাইলে ধরবে। ওর বেরোনোর সময়টাও কনফার্ম করতে হবে তো। অবশ্য তনিমাও নিশ্চয় মনে মনে আজ ছটফট করছে। এতক্ষণে কলিগদের কাছে হয়তো বলেও দিয়েছে ওর আজ বিকেলের প্ল্যান নিয়ে। ওরা ভেবে রেখেছে একটু মার্কেট সার্ভে করবে, মানে দু'তিনটে দোকান দেখা আর কি। তাতে দামের ওঠা-নামাটা একটু বোঝা যায়। তবে সেলস ইন্ডিয়াই ওদের মেইন দোকান, যেখান থেকে ওরা মোটামুটি ঘরের অনেক টুকিটাকি এর আগে নিয়েছে। বন্দনা মেয়েটি বয়সে গ্রুপের সবচেয়ে ছেট, তনিমাকে কেবল প্রিলিপাল হিসেবে নয়, বড় দিদির মতো দেখে। সে জানতে পেরে বললে, ‘ম্যাডাম, সেলস ইন্ডিয়া আজকাল সাড়ে সাতটায় বন্ধ হয়ে যায়, আপনি একটু আগেই বেরিয়ে পড়ুন। স্যার কি আসবেন আপনাকে পিক-আপ করতে?’ সোমনাথ একবার ওর বসের ঘরের দরজা ফাঁক করে দেখে নেয় বস কি করছে। নন-বেঙ্গলি বস, সব সময় অফিসের কম্পিউটারে ইন্টারনেট চষে বেড়াচ্ছে, কি যে এতো দেখে! দুর্জনে নানান কথা বলে বটে, তবে সোমনাথ কখনও হাতে নাতে ধরতে পারে নি। একটা টোকা মেরে ঘরে ঢুকেই সোমনাথ বলে, ‘স্যার একটা জরুরী কাজের জন্যে আমায় আজ একটু আগে যেতে হবে, মিসেস’কেও পিক-আপ করতে হবে, আমি আজ পাঁচটায় চলে যাবো।’ বস কম্পিউটার থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন ‘নো প্রবলেম, গো।’ যাক এদিকটা তো ম্যানেজ হলো, এবার তনিমাকে ফোন করা যাক।

‘হ্যালো, কখন বেরোচ্ছো? আমি কি তোমার ওখানে চলে আসবো?’

‘না, আসতে হবে না, আমার স্কুলের একটা ভ্যান ওদিক দিয়েই যাবে, আমায় নামিয়ে দেবে। এই ধর পাঁচটা পনের/বিশ নাগাদ। তুমি ডাইরেক্ট সেলস ইন্ডিয়ার সামনে চলে এসো, আমি আসছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে

হবে, দীপুর টিউশান ক্লাস সাড়ে সাতটায় শেষ হয়। ডাউন পেমেন্টের টাকাটা নিয়ে এসো কিন্তু। ই.এম.আই.আমার জিম্মা। মনে আছে তো?’

‘কিন্তু কত দিতে হয়, না হয়, না জেনে কত টাকা তুলব? তার চেয়ে আমি চেক বইটা আনছি সাথে, যা বলবে লিখে দিয়ে দেব। আজকেই তো আর মালটা পাঠাচ্ছে না। আচ্ছা শোন, আমি ভাবছিলাম, দুটো ঘরের জন্যে দুটো মেশিন কিনে নিলে কেমন হয়? বার বার তো আর এসব কেনা হবে না, তুমি কি বল?’

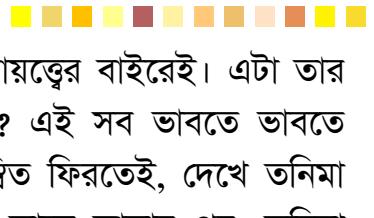
‘যদি পারো, তো নিয়ো, দুটোর জন্যে তোমায় কত ডাউন পেমেন্ট দিতে হয় আগে দেখ। আর আমাকেও তো ই এম আই এর ফাইনাল ভ্যালুয়েশানটা জানতে হবে। ঠিক আছে, তুমি পৌঁছে যাও, আমি গেটেই থাকব।’

তনিমার সাথে সোমনাথের আলাপ আর বিবাহের মধ্যে আট বছরের পূর্বরাগ চলেছিল। পাঢ়াতে সকলে জানতো। তনিমার মা'ও জানতেন। আর সোমনাথ নিজেই বলেছে তার মা'কে, বাবাকে বলার সাহস ছিলো না, ওটা মা'র ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। ওর ছোট ভাই অবশ্য জানত। সরল, হাসিখুশি আর আত্মগরিমায় ভরা পূর্বরাগের তনিমা আর আজকের প্রিস্পিপাল তনিমার মধ্যে সময়ের সাথে সাথে আরও একটা বিশেষ গুণ যোগ হয়েছে। সেটা হলো যে কোন কাজ বা সমস্যার সমাধান করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সোমনাথের মনে তনিমার জন্যে গভীর ভালোবাসার সাথে একটা নির্ভরতাবোধ জন্ম নিয়েছে। তনিমা এক্সপার্ট দূরদর্শী না হলেও ওর বিচার আর বুদ্ধির যুগলবন্দি কখনও সাংসারিক সমস্যার উৎপত্তি করে নি, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে খুব সহজে সমাধানে কাজ মিটেছে। এই ক্ষমতার জন্যই আজ স্কুল জয়েন করার আট বছরের মধ্যেই, শিক্ষিকা থেকে সহায়িকা প্রিস্পিপাল এবং এখন প্রিস্পিপাল হতে পেরেছে। স্পষ্টবাদিতা আর স্কুলের স্বার্থে ও নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে, যে আজ স্কুল ট্রাষ্টিও তনিমার লেখা রেকমেন্ডেশান বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়।

এত সব জানা ও মনে নেওয়া সত্ত্বেও এই ২৩ বছরে সোমনাথ মাঝে মাঝেই তনিমাকে কাঁদিয়েছে, কখনও চেঁচামেচি করেছে সামান্য কারণেই, গাঁক গাঁক করে আজে বাজে কথা বলেছে, তখন ওর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল বা প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন শিক্ষা বা ঐতিহ্য ওকে বেঁধে রাখতে পারে নি। মুখের আগল মাথার গরম দমকায় যখন খুলে যায়, তখন কোনও যুক্তি, তক্কো, গঞ্জো জানালায় ধাক্কা খেয়ে ঘরে ফেরে না। কানের পাশে দুম দুম করে আওয়াজ শুরু হয়ে যায়, আজ বারো বছর হতে চললো, সোমনাথ প্রেসারের ওষুধ খেয়ে চলেছে। একটু পরে ঠান্ডা হলে বুঝতে পারে কত পেটি কারণে কি ভীষণ চেঁচালো ও। বউ আর মেয়েদের সামনে নিজেকে কেটে কেটে কদর্য্যতার এক একটা প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দিল – স্বামী, প্রেমিক, বাবা, কিউট বাবা সব পরিচয়ের সুন্দর সুন্দর পোর্টেটে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিল নিমেষে। অসহায় লাগে, কিন্তু ৪৮ বছর বয়সেও রাগটাকে বাগে আনতে পারলো না সোমনাথ। সময়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া এই সময় আর কিছু করার থাকে না সোমনাথের। কটা রুটি খাবে মেয়ে এসে জানতে চাইলে বুঝতে পারে এই মুহূর্ত কতটা কঠিন। তনিমা এখন কিছুদিন রিঅ্যাকশন-ইন হয়ে যাবে, যেটা সোমনাথের সবচেয়ে অপছন্দের।

সময়ের চেয়ে বলবান কেউ নেই। পরিচয়ের জ্বলে যাওয়া ওই সব পোর্টেটের ভস্ত্র থেকে আবার ধীরে ধীরে মাথা তোলে ভালোবাসার ফিনিক্স পাখী। আবার বাতাস হালকা হয়ে আসে ঘরের মধ্যে, আবার শুরু হয় নতুন করে মিলিত জীবনের পথ চলা। আগ্নেয়গিরি ঘূর্মিয়ে পড়ে, কিন্তু বারে বারে ফিরে আসে। কখনও দু'মাস বাদেই, আবার কখনো বছর ঘুরে যায়।

আসলে আট বছর প্রেম করে বিয়ে করলেও, সোমনাথ তনিমার মনের গোপনে ঢুকতে পারে নি। হয়তো সে দরজা খোলা ছিল এক সময়, এখন বিয়ের ২৩ বছর পর ওই দরজা খোলার প্রচেষ্টায় আর কি ভাবে নিজেকে ঢালবে, সেটা সোমনাথ মাঝে মাঝেই ভাবতে বসে। অনেক ভেবে এটাই বুঝেছে, ভাগ্য গুণে বিদ্যুমী



পত্তী পেয়েছে অবশ্যই, তবে বিদ্যুর মনটাকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা ওর এখনও আয়ত্তের বাইরেই। এটা তার মনে এক মস্ত ক্ষেদ, আর এর ওষুধ ওর ব্যক্তিসত্ত্বায় আর কবে ডেভেলপ করবে? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন সেলস ইন্ডিয়া পৌঁছে গেছে বুঝতেই পারে নি। তনিমার চেনা আওয়াজে সম্বিত ফিরতেই, দেখে তনিমা ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত নাড়ছে। গাড়ি সাইডে রেখে লক করে কাছে আসার পর, তনিমা বলে উঠলো, ‘কার কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিলে, যে নিজের ঠিকানাই পেরিয়ে যাচ্ছিলে?’ উত্তরে সোমনাথ গভীর ভাবে তনিমাকে দেখতে দেখতে বলল, ‘হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না, আমি তোমাকেই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম।’ তনিমা মুখ দিয়ে একটা অঙ্গুত শব্দ করে, যার আওয়াজটা, বাতাসে ওহঃ আর হংঃ-র মিশ্রণের মতো শোনাল। এ শব্দব্রহ্মে তনিমার মনের কোন অনিবচনীয় ভাবের বহিপ্রকাশ ঘটলো, সোমনাথ বোঝে না, তনিমার মনের গোপন মণিকোঠায় ভালোবাসার পুরনো দীপ নতুন কোন রোশনি পেল কি?

২

নীল উর্দ্দি পরা দারোয়ান লম্বা সেলাম ঠুকে ভারী কাঁচের দরজা খুলে ধরল। তেতরে ঠুকেই সোমনাথ আর তনিমা এক অঙ্গুত ঠান্ডা স্বপ্নময় পরিবেশে এসে পড়ল। এমনই ঠান্ডা হবে ওদের ঘর, যখন এ.সি. লাগবে। রোগা বলা যায় না, কিন্তু একেবারেই মোটা নয় এমন একটি মেয়ে (আন্দাজ ১৮-১৯ বছরের), ওদের দিকে এগিয়ে আসে, কি খুঁজছেন এই প্রশ্ন করায় তনিমা কেন জানিনা হঠাত চোস্ত ইংরাজীতে বলে ওঠে, ‘উই আর হিয়ার ফর এ.সি।’ মেয়েটি নীচে নেমে ডান দিকের সেকশনে যাবার জন্যে বলে, নিজেও সাথে সাথে চলতে থাকে। এ ধরনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের এই এক সমস্যা, জিনিস দেখবার জন্যে হয় একতলা নীচে নামো, অথবা দেড় তলা ওপরে যাও। মনে হয়, এত সামগ্রী একই ফ্লোরে রাখা সন্তুষ্ট নয় বলে এমন ব্যাবস্থা।

সিঁড়িতে দু’পা নামবার পরেই সোমনাথের কেমন মনে হল পুরো স্টেরটা একবার ওপর নীচে দুলে গেল ওর চোখের সামনে। ভূমিকম্প নাকি? ছোট করে কাটা চুলের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম একসাথে মিলে ছোট অববাহিকার মতো ঘাড়ের কাছে যেন ব-ধীপের চারপাশে ভেঙে পড়েছে। কপাল আর কানের পাশ দিয়ে পাতলা জলধারা শ্বাপন্দের মতো ধীরে ধীরে সরে সরে নামছে। মিনিট খানেক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পরে, পায়ে আর মনে যখন একটু জোর এল, তনিমা ততক্ষণে ঐ মেয়েটার সাথে সেলারে প্রায় পৌঁছে গেছে। পাশ ফিরে হঠাত সোমনাথকে দেখতে না পেয়ে তনিমা সিঁড়িতে চোখ ফেরায়। তনিমা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই, সোমনাথ হাত নেড়ে, হাঁটুটা দেখায়। আলতো করে ইঙ্গিত করে, ও আসছে। তনিমা জানে আজকাল সোমনাথ হাঁটুতে মাঝে মাঝেই ব্যাথা অনুভব করে, বিশেষ করে সিঁড়ি ওঠা নামার সময়ে। মুহূর্তের মধ্যে তনিমার মুখটা আবার উৎসাহী ক্রেতার মতো হয়ে ওঠে। সোমনাথ আস্তে আস্তে নামা শুরু করে। বাঁ হাতে স্টিলের চকচকে রেলিং ধরে সেন্ট্রালি এয়ার-কন্ডিশনড মলের সিঁড়ি বেয়ে এক পা এক পা নাবার সময় ও টের পায়, আরও কতটা পথ ওকে নামতে হবে তনিমার কাছে পৌঁছানোর জন্যে। পিঠের জামাটা তেতরে গেঞ্জির সাথে চেপটে গেছে, ঘামের জন্যে। সোমনাথ নেমেই চলেছে সিঁড়ি ধরে। গরমে এমন হল, নাকি প্রেসারটা আবার বাড়ল আজকে। যতদূর মনে পড়েছে, আজকের ওষুধ তো সকালে ব্রেকফাস্টের সময় নিয়েছিল। আজকাল এই এক প্রবলেম হয়েছে, এ বেলার কথা ও বেলায় মনে করতে পারে না, অথচ কবেকার কত কথা এখনও ছবির মতো চোখের সামনে আসা যাওয়া করে হবল্ল, যেমন ঘটেছিল।

এ.সি. কর্ণারে পৌঁছানোর পরে এক গ্লাস জল খেয়ে সামনে রাখা কুশন দেওয়া চেয়ারটায় ও বসে পড়ে। যে ছেলেটি, তনিমাকে এ.সি. দেখাচ্ছিলো, সে স্পট এ.সি. থেকে উইনডো সব ধরনের মেশিনের দাম, টনেজ, রং, গ্যারান্টি পিরিয়ড ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস বর্ণনা করে চলেছে। তনিমা তার মাষ্টারী ব্রেন আর ঘরের প্রয়োজন এই দুই এর মধ্যে মেল বন্ধন করার চেষ্টা করে চলেছে। সোমনাথের বেশ লাগছিলো,

তনিমাকে এই কঠিন অঙ্গ কষতে দেখে। সামান্য সময় বসার পরে, এবার একটু ঠিকঠাক লাগায়, সোমনাথ গিয়ে দাঁড়ায়, তনিমার পাশে।

‘তুমি কি সত্যিই দুটো এ.সি. কিনবে বলে ভাবছ? তখন কি হয়েছিল, শরীর খারাপ লাগছিল?’ তনিমা এক নিঃশ্঵াসে জানতে চাইল।

‘কি দাম বলছে? না না, তেমন কিছু নয়, মাথাটা একটু ঘুরে গেছিল। এখন ঠিক আছি। ডাউন পেমেন্ট কি দিতে হবে, দুটো একসাথে নিলে?’

তনিমা খানিকটা আতঙ্গ হয়ে বললো, ‘শোনো না, আজ বুক করলে ই এম আই-গুলোতে কোন ইন্টারেন্স লাগবে না। জিরো ইন্টারেন্স!’

‘ইয়েস স্যার,’ বলে এগিয়ে আসে ছেলেটি, যে এতক্ষণ এ.সি. দেখাচ্ছিল। ‘আপনারা আজ বুক করলে, কিছুটা সুবিধে পেয়ে যাচ্ছেন, এক্সট্রা পয়সা লাগছে না, আর ই এম আই-ও কাটা শুরু হবে নেক্সট মাস থেকে।’

সোমনাথের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও মন তৈরী করছে। আস্তে করে বলল, ‘তাহলে একটা স্পট এ.সি. আমাদের শোবার ঘরে লাগাই, আর একটা উইনডো মেয়েদের ঘরের জন্যে নিই?’

‘নয় হাজার টাকা এখন ডাউনপেমেন্ট হিসাবে দিতে হবে।’ তনিমার হিসেব।

সোমনাথের একটা ডাউট ছিলো, ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, ‘স্পট মেশিনটা কি ঘরের বাইরে রাখতে হবে?’

‘স্যার ছাদে ফিট করে দেবো, তারপরে তো আর হাত পড়বে না, আপনি বরঞ্চ একটা কভারের ব্যাবস্থা করে নেবেন, তাহলে বৃষ্টির থেকে খানিকটা রেহাই পাবে।’

‘কিন্তু ভাই, আমার বদলির চাকরি, তখন আবার নতুন করে পাইপ খোলা, মেশিন খোলা এসব তো করতেই হবে, নাকি?’

‘ওহ্ স্যার, তাহলে আপনারা দুটো উইন্ডো এ.সি.-ই নিয়ে যান। স্পট এ.সি.-তে আপনাদের রেকারিং কস্ট অনেক বেড়ে যাবে।’

সোমনাথ আর তনিমা পরস্পরের মুখ দেখাদেখি করে। তবে কি চাকরীতে যতদিন আছে, ততদিন আর স্পট এ.সি. নেওয়া যাচ্ছে না? সোমনাথ তনিমার দিকে ফিরে চোখ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করবে তাহলে?

ফাইনালী দুটো উইন্ডো এ.সি. কিনে, ডাউন-পেমেন্ট আর ই এম আই বাবদ ১০ খানা চেক দিয়ে যখন ওরা সেলারের বাইরে এলো, তখন অন্যান্য সেকশন বন্ধ হতে শুরু করেছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। গাড়িতে বসেই সোমনাথ তনিমাকে বললো, ‘যখন ছোট ছিলে, আমার সাথে প্রেম করতে, তখন কি কখনো ভেবেছিলে, এ.সি. কিনতে এসে, খস খস করে চেক সই করবে?’

তনিমা খুব খুশি খুশি মুখে বললো, ‘না তেমন করে ভাবি নি, তবে না হবারই বা কি আছে বল। আমরা তো একটু আলাদাই ছিলাম ছোটবেলো থেকে। পড়াশুনো, আদবকায়দা, সংস্কার সব কিছু নিয়ে। তাহলে, এ’টুকু তো আমরা অর্জন করতেই পারি আজ। পারি না?’

সোমনাথ হাসি মুখে সায় দিয়ে গাড়িটাকে রাস্তায় তোলে। সাতটা বেজে পাঁচ, যদি রাস্তা খালি পায়, তবে দীপুকে নিয়ে নিতে পারবে টিউশন থেকে।

৩

এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন লাইন বসিয়ে, জানালায় গ্রীল কেটে দু ঘরে দুটো এ.সি. বসে গেল। সোমনাথ অফিসে থাকাকালীন কোম্পানীর লোক এসে একদিন এ.সি. চেক করে ফুল ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে গেলো। মা-

মেয়ে দুজনে সেসব পুঞ্জানুপঙ্খ মনে রাখল, সোমনাথকে বলবার জন্যে। তনিমা এখন রাত্রে বিছানায় শুয়ে গরমে আর হাঁসফাস করে না, আরামেই ঘুমোয়। সোমনাথ একবার নিজের, একবার মেয়েদের ঘরের মেশিনের অবস্থা যাচাই করে, নিজের ঘরে এসে তনিমার পাশে শুয়ে পড়ে। শোবার আগে এ.সি. তে দু'ঘন্টার টাইমার দিয়ে দেয়। বেশীক্ষণ চলতে থাকলে ঘর একেবারে বরফ হয়ে যায়। এই ভাবেই সোমনাথ আর তনিমার বাসায় দৈত বাতানুকুল ঘন্টের চৰেবেতি শুরু হয়।

তিন মাস পরে এ.সি.তে যখন আধঘন্টার বেশী টাইমার লাগছে না, একরাতে শুয়ে শুয়ে সোমনাথের মাথায় একটা উদ্ভিট ভাবনা আসে। কেবল মাত্র দুটো শব্দ নিয়ে, ‘ডাউন পেমেন্ট’ আর ‘ই এম আই’।

হঠাতে করে ও বুঝতে পারে এই শব্দ দুটো কেবল কর্মসূর টার্মস নয়, অন্ধকার ঘরে ও ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে এই দুটো শব্দের সাথে চাইলে সমগ্র বিশ্ব সংসার জড়িয়ে দেওয়া যায়। চাই কি, এটা বলতে দ্বিধা নেই যে সারা দুনিয়া এই শব্দেরই পরিণাম এবং উৎপত্তি। আমরা সকলেই এর সাথে একটা ক্লোজড লুপ-এ ঘুরে চলেছি সময়ের সীমাহীন প্রবাহে। নিজের এই বোধেদয়ে সোমনাথ খুব উত্তেজিত বোধ করে। তনিমাকে জাগাতে ইচ্ছা হল খুব, এ.সি.-র হালকা সবুজ টেম্পারেচারের ডিজিটাল ইন্ডিকেটরের আলোয় তনিমার ঘুমিয়ে থাকা মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, সোমনাথ মন বদলাল। নিজের নতুন এক্সপ্ল্যানেশনের ব্যাপারে আরো গভীর ভাবে মনোনিবেশ করল। ঘুম উড়ে গেছে চোখ থেকে।

আমরা যা কিছু পাবার স্বপ্ন দেখি, বা আশা করি, বা যে যেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করি, তার জন্যে একটা প্রস্তুতি ছেটবেলা থেকেই নিতে হয়। ওই সময়ের থেকে করে আসা সমস্ত কর্মকাণ্ড, শ্রম, অর্থলগ্নি এসবই হল একটা জীবন নামক ভিত্তি পতনের জন্যে ডাউন পেমেন্ট। জীবন যখন লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তাকে আরও এগিয়ে দিতে এবং মেটেনইড রাখতে জীবন থেকে কিছু কিছু ভাগ বা অংশ আমাদের ফিরিয়ে দিতে হয়, কখনও সময়ের রূপে, কখনও ভালোবাসার রূপে, বা দায়িত্বসচেতনতার রূপে। সোমনাথের কাছে এগুলো এক একটা ই এম আই। জীবন যেমন দেয়, তেমনই আবার চলার জন্যে জীবনকেও ফিরিয়েও দিতে হয় তার অর্জিত লভ্যাংশের একাংশ। সে লাভের গুড়ে সংসারের সকলেরই ভাগ থাকে।

‘বাবা-মা’র কথা বিশেষ করে আজ মনে পড়ে সোমনাথের, ওনাদের সারা জীবনের ডাউন পেমেন্ট এর রসিদ নিয়ে ও নিজে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে ও ওর জীবনের সব ভালোবাসার জনেদের জন্যে সব রকম ই এম আই দিয়ে দিতে পারে। বাবা-মা কোন ই এম আই নিয়ে যেতে পারেন নি। তার আগেই তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আর তনিমা সেই ছেট বয়স থেকেই নিজের ক্যারিয়ার, বাবা-মা, ঘর বাড়ি, পারিবারিক ব্রাক্ষণ্য সবই ডাউন পেমেন্ট করেছে কেবল সোমনাথকে ভালোবেসে। কিন্তু সোমনাথ কি তনিমার জীবনে তার প্রাপ্য সব ই এম আই ঠিক ঠিক ফেরত দিতে পেরেছে? কখনও কি ডিফল্টার হয়নি? নিজেকে বিছানায় এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, সোমনাথ বিব্রত হতে থাকল। আস্তে আস্তে মন খুঁজে পেতে থাকল ডিফল্টারের এক একটা বড় ছেট অধ্যায়, যা চাপা পড়ে আছে দৈনন্দিন জীবনের হয়রানিতে। সব মনে আসার পরে, সোমনাথ নিজেকে এক বড়সড় ঠগ বলে মনে করতে লাগল। চাপ চাপ দৃঢ়বোধ তাকে অন্ধকারে এমন ভাবে জাপটে ধরে, মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। তনিমাকে জাগাবে নাকি, নাকি আরেকটু সহ্য করবে। তীব্র হতাশা থেকে বার বার ওর মনে হতে লাগে, বাবা, মা, সমাজ, শিক্ষক, সংস্কার, শুভবুদ্ধি সব কিছুরই দানে গড়ে তোলা এই জীবনের ডাউন পেমেন্টের মর্যাদা ও স্কুল করেছে বার বার, ধোঁকা দিয়েছে এদের সকলকে। পাপ আর পুণ্যের সীমারেখা আজ নতুন করে একটা আলাদা মানে নিয়ে এল ওর বিবেকের কাছে। তনিমাকে যদি একবার ডেকে সব বোঝাতে পারত, ওর এখনকার মনের অবস্থাটা। তনি, আমি তোমার কাছে অন্যায় করেছি বেশ কয়েকবার, তোমার কাছে আমার যোগ্যতার পরিভাষা যা নিয়ে তুমি সুখী আছো, তাকে

কলুষিত করেছি। কখনও অজানতে, কখনও লোভে পড়ে, কখনও মোহের বশে, অথবা সামান্য অ্যাডভেঞ্চরাস হয়ে। এক সীমাহীন হাহাকার বুক ফুটে বেরোতে চাইছে, চিংকার করে বলতে চাইছে, তনি তোমাকে ঠকিয়েছি এই ২৫ বছরের সম্পর্কে, মাঝে মাঝেই, নিজের দুর্ব্যবহারে, রাগ গোয়ার্তুমি আর কখনও বা পরকিয়ার আবছা আভাসে। তুমি জানতে পার নি। বা হয়তো বুঝেছ, আমায় জানতে দাও নি। আমায় কি তুমি সব ভুলে ক্ষমা করতে পারবে? কোথায় যেন পড়েছিলো সোমনাথ, মেয়েরা ক্ষমা করলেও কখনও ভোলে না। আর তাই যখনই সম্পর্কের ই এম আই ভরতে গিয়ে কেউ ডিফল্টার হয়ে যায়, তখন সৃতি তার বন্ধ দরজাগুলো খুলে ধরে, আর অভিযোগের ধারালো সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তি অস্ত্রের সাজে, নতুন রক্তপাতের মহাভারতে। বিবেকের চাপ এমনিভাবে এই দুটো শব্দ নিয়ে এমন ভাবে ওকে নাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সোমনাথ এ.সি. কিনতে যাবার সময় কখনও ভাবে নি। ঘুম আসছে না, এক আবছা অথচ তীব্র বেদনায় ও স্থির হয়ে পড়ে আছে ও। গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ঘুমিয়ে তো নেই-ই, কিন্তু ঠিক মতো জেগেও নেই ও এখন। রাত্রির বাতাসেও কোন আওয়াজ নেই।

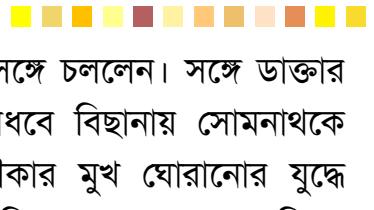
8

স্কুলে যাবার আগে রান্না করতে হয় বলে তনিমা বরাবরই সোমনাথের আগে ঘুম থেকে ওঠে। আজও তার অন্যথা নেই। হাতমুখ ধূয়ে সকালের চা'টা বসাবার আগে, ভাবল আজ সোমনাথকেও তুলে দেয়। দু'জনে একসাথে চা খাবে। গতকাল বিকেলে ওদের বড় মেয়ে পরীক্ষা শেষে হোষ্টেল থেকে ফিরেছে – আজ তাই ওর মনটা খুব ভালো আছে, আজ একসাথে সকলেই বাড়িতে আছে অনেক দিন পরে। সোমনাথকে ডাকতে যাবে বলে গ্যাস্টা সিম করতেই টেলিফোনটা বাজতে শুরু করে। মা ফোন করেছেন বারাসাত থেকে, গত রাতে ওখানে খুব বৃষ্টি হয়েছে, তোদের ওদিকে কি হয়েছে? রাত্রে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগলেও, এদিকে বৃষ্টি হয় নি, তনিমা জানায়। মা-মেয়ের কথা যখন শেষ হলো, তখন সিম করে রাখা জলও পুরো উবে গেছে। নতুন করে আবার জল বসিয়ে তনিমা গেল সোমনাথকে ঘুম থেকে তুলতে।

চিৎ হয়ে মুখ বন্ধ করে, হাত দুটো পাশাপাশি ফেলা, সোমনাথ শুয়ে আছে বিছানায়। তনিমার বুকটা সোমনাথকে দেখে কি জানি কেন কেঁপে উঠলো। এত প্রশান্ত মুখ, কেমন যেন অচেনা ঠেকছে। পা দুটো শোবার ঘরের দরজার কাছে এমন ভারী লাগছে, তনিমা এগোতে চেয়েও যেন এগোতে পারছে না। সোমু সোমু বলে দুবার ডাক দিয়েও কোন সাড়া না পেয়ে, মাটি থেকে উপড়ে পড়া গাছের মতো, তনিমা এসে পড়ল সোমনাথের নিঃসাড় শরীরের ওপরে। তনিমা বুঝতে পারে না ওর এখন কি কি করা উচিত। সোমনাথ এক গভীর ঘুমের মধ্যে রয়েছে, বায়োলজির ছাত্রী তনিমা জানে চালু কথায় এটাকে স্ট্রোক বলে।

সোমনাথের জীবন স্পন্দন খুব ধীরে ধীরে চলছে। তার দেখবার চোখ, বোঝবার হৃদয় এখনো সম্পূর্ণ ইনেফেষ্টিভ নয়, তনিমার মন পড়তে পারলেও নিজের কথা মুখে বলার স্বর ওর নেই, যা তনিমার কানে গিয়ে পৌঁছায়। তোমায় ডাকতে চেয়েছিলাম বারবার, কিন্তু একেবারেই বুঝতে পারিনি চলে যাচ্ছি, বিশ্বাস কর। অবুরু অভিমানে আমায় পিল ভুল বুঝো না। ইথারের সমুদ্রে সোমনাথের এই আকুল ইচ্ছে একটা তরঙ্গের মতো দুলতে থাকল।

বড় মেয়েকে বিছানা থেকে তুলে ডাক্তারকে ডাকতে পাঠায়। পারিবারিক চেনা ডাক্তার পুলক চক্রবর্তী ১০ মিনিটের মধ্যেই এসে যান। ডাক্তারের মুখ দেখে তনিমা আন্দাজ করে অবস্থা মোটেই সাধারণ নয়। এ্যাম্বুলেন্সে যখন সোমনাথকে তোলা হচ্ছে, তখনো সোমনাথ মরণের নৌকায় সম্পূর্ণ জীবনসমুদ্র পার হতে পারেনি। গাড়িতে তনিমা উঠে বসল, সোমনাথের সাথে, এক পাথর প্রতিমা। এখন ওর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, মনের মধ্যে কি ঝড় চলছে। দুই মেয়ে মা'কে ঘিরে রয়েছে। আজ ওদের বড় কঠিন পরীক্ষার



সময়। হাসপাতাল অভিমুখে পাড়া প্রতিবেশী দু'এক জন পুলক ডাক্তারের গাড়িতে সঙ্গে চললেন। সঙ্গে ডাক্তার থাকায়, হাসপাতালে বেশী সময় নষ্ট হয়নি, আই সি ইউ এর দুধসাদা ঘরে ধবধবে বিছানায় সোমনাথকে শোয়ানো হলো নানান রকম ডাক্তারী যন্ত্রের সাথে জুড়ে। সোমনাথের জীবন-নৌকার মুখ ঘোরানোর যুদ্ধে ডাক্তাররা লেগে গেলেন। অফিসের লোকজন একটু বেলা বাড়তে, যারা কাছাকাছি ছিল, সকলে এসে হাজির। তনিমা কেবল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, ‘ওকে ঘরে নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তো?’ ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দিলেন সিনিয়র ডাক্তার প্রশ্ন ভট্টাচার্য, তার আগে স্বয়ং ভগবানও নাকি বলবার ক্ষমতা রাখেন না। বললেন, ‘দেখ মেয়ে, আমরা আশাবাদী আর ডাক্তারীটাও করব একদম ঠিক ঠাক, কিন্তু তারপরেও কিছু লাগে যা থাকে কেবল মাত্র নিয়তির নিয়ন্ত্রণে। ধৈর্য ধর, সব ঠিকই হবে।’

ভোর রাতের দিকে এই সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রথম অ্যাটাকটা হয় ঘুমের মধ্যেই। জেগে গিয়েও সোমনাথ কোন কথা বলতে পারে নি, তার ঠিক পাশে শোয়া তনিমাকে। ওর গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরোচ্ছিল না। বুকের এক অলৌকিক ব্যথা ওকে নিয়ে লোফালুফি করছিল, সেটা সহ্যের আওতার বাইরে যেতে ও জ্ঞান হারায়। ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যেই সেকেণ্ড ধাক্কাটা আসে সোমনাথের অগোচরে।

একটা প্রবল ভূমিকম্পের মতো, প্রি- আর পোষ্ট- কম্পন ওকে ভালো করে বাঁকিয়ে দিয়ে যায়। যমে ডাক্তারে টানাটানির ৪০ ঘন্টা পরে সোমনাথের এগিয়ে চলার পথে ব্রেক লাগে বলে ডাক্তার ভট্টাচার্য মত দিলেন। তবে অপেক্ষার পালা পুরোপুরি এখনও শেষ হয় নি। তনিমার বুকটা একটু হাঙ্কা লাগছে, চশমার কাঁচে আর আই সি ইউ এর দেওয়াল থির থির করে কাঁপছে না। এই প্রথম দু'দিনে ও নিঃশ্বাস ছাড়ল। এই দু'দিন সোমনাথের চলার পথে তনিমার শ্বাস-প্রশ্বাস সোমনাথকে ওর দরকারী অতিরিক্ত বাতাসটুকু দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। সোমনাথকে ঘরের পথে ফেরানো গেলো অবশ্যে। ভর্তি হবার ছ-দিনের মাথায় সোমনাথ জেগে উঠল এক অন্তুত ঘোরের মধ্যে। বুকে কোন ব্যাথা নেই, কিন্তু সমস্ত শরীর ভেঙ্গে আসছে, এক অন্ত ক্লান্তি নিয়ে, দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে, যেন কতদিন ঘুমোয় নি ও। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পরে, নতুন হৃদয় নিয়ে, সোমনাথ ১২ দিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। কুঁচকির কাছে ফোলাটা খুব ধীরে ধীরে করে যাবে বলে ডাক্তার বলেছেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, হাঁটাহাঁটি শুরু করতে বেশ সময় লাগবে। কৃতজ্ঞ মনে তনিমা বৃদ্ধ ডাক্তার ভট্টাচার্যের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে যখন সোজা হয়ে উঠল, এক স্নিহ হাসি দিয়ে উনি বললেন, ‘ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারার জন্যে, তোমার কাছে আমার একটা দেনা থেকে গেল মা। কি করে ফেরত দেব জানি না।’

‘কিসের দেনা? দেনা তো আমার, আপনার কাছে,’ তনিমার উত্তর।

‘ও তুমি ঠিক বুঝবে না মা, আমরা মানে ডাক্তারো বুঝি।’

তনিমা হঠাত বুঝতে পারে জীবনের সহজ অঙ্কটা। আমাদের সকলের জন্যে নির্দিষ্ট ডাউন পেমেন্ট জন্মাবার সাথে সাথেই দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সকল কর্ম, ভালোমন্দ, ন্যায়, অন্যায়, আশা নিরাশা, লাভক্ষতি, ভালোবাসা আর বিশ্বাস এই সব নিয়ে যে জীবন, তার সঠিক খরচ না হলে, স্রষ্টার দরবার থেকেই মাঝে মাঝে ডিফল্ট ই এম আই-এর নোটিশ আসে। তখন তা মেটাতে গিয়ে, সুদের ভারে জীবনটাকেই বাজি ধরতে হয়। সংসারে সঠিক চলাই হল, ই এম আই-এর ডিফল্টার হবার থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ। একমাত্র উপায়।

ঘরে এসে, সোমনাথকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, একটা তৃষ্ণি অনুভব করে তনিমা মনের গভীরে। হাত বাড়িয়ে সোমনাথকে ছুঁয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তনিমার ই এম আই-পেইড এ.সি. ঘরের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়ার ভরপুর অক্সিজেনে, সোমনাথকে ভরিয়ে দিল গভীর ভালোবাসায়।

জুড়ি

কৌন্তত অধিকারী

(গারটুড হাই বেইমার্স সকলিত চৈনিক উপকথার ছায়ানুবাদ)

চীনদেশের কোনো এক শহরে, সে অনেক কাল আগের কথা – ছিল এক পরমামুন্দরী যুবতী, নাম তার শু। তার উপর আবার সে ছিল এক বেশ উঁচু বংশের কন্যা। ফলে তার আশেপাশে লেগেই থাকত গুণগ্রাহী যুবকদের ভিড়। আর সে বিষয়ে দারুণ হৃশিয়ার ছিল শু, তার কথা ছিল, “পুরুষদের ব্যবহার করতে জানতে হয়, নইলে তারা কোনো কাজের না...”

অতএব তার জীবনযাত্রার একটা বড় সময়ই কাটত এইসব উৎসুক যুবকদের সাহচর্যে। তাকে প্রমোদভ্রমণে-নৈশাহারে নিয়ে যেতে পেরে তারা নিজেদের ধন্য মনে করত। আর শু'ও তার প্রতি এই মনোযোগ উপভোগ করত। তবে সে তার সান্নিধ্যপ্রার্থীদের এ কথাও জানিয়ে দিতে ভুলত না, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে গেলে, তার বর-অঙ্গ-সঙ্গলাভ করতে গেলে, তার প্রকৃত তুষ্টিবিধান করতে হবে – উপহার দিতে হবে বেশ মূল্যবান কিছু – আর তা যদি কোনো দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন মুদ্রা হয় তাহলেই সবচেয়ে উত্তম। এইভাবে সে গড়ে তুলেছিল এক বিশাল, ঈর্ষণীয় সংগ্রহ।

~০~

সেই শহরেই থাকত এক সাধারণ পরিবারের ছেলে, তরুণ মেধাবী ছাত্র চেঁ। এবং গল্পে চিরকাল যেমন হয়ে এসেছে, ফুলের বাজারে এক ঝলমলে সকালবেলা চেঁ'য়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে শু'য়ের উপর। যথারীতি, দেখা মাত্রই সেই যুবকের মনে দারুণ ইচ্ছা জাগতে থাকে, কমনীয় রমণীয় লোভনীয় এই ফুলটি তুলে এনে তার ছেট ঘরটি সাজাবার। মেয়েটির সাথে একবার আলাপ করবার জন্য খুব চেষ্টাচরিত করতে থাকে সে, এবং জানতে পারে তার সেই দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার শখের কথা।

সে ভাবতে থাকে, তার ঠাকুমার কাছে প্রাচীন শান যুগের এক অত্যন্ত দুর্লভ মুদ্রা আছে বটে, কিন্তু নাতির খেয়ালের কথা শুনে কি আর তিনি ওটা তাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য দেবেন? কখনোই না!

“প্রাণ থাকতে বুড়ি তা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না...” চেঁ ভাবে। হয়তো বা মরার সময় বড় নাতি হিসাবে তাকেই ওটা দিয়ে যাবেন, কিন্তু সে কথায় এখন কী লাভ? অথচ এখন ওই মুদ্রাটি পেলে, তার বদলে চেঁ আরো দুর্লভ একটি বস্তু হাসিল করতে পারত!

আরো মুশ্কিল এই যে, তার ঠাকুমার এই সম্পদটির খবর শু'য়ের কাছেও পোঁছেছে, কারণ সে আকারে-ইঙ্গিতে চেঁ'য়ের দৃতকে জানিয়েছে, ওই মুদ্রাটি বিনা তো এই অল্পবয়সী ছাত্রের কোনো আশাই নেই, এমন এক বড় ঘরের মেয়ের কাছে ঘেঁষার।

~০~

অতএব আবেগ ও উদ্বেগের এক দারুণ জোয়ার-ভাঁটায় চেঁ'য়ের পড়াশোনা যায় তলিয়ে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিন এহেন অবস্থা দেখে প্রশ্ন করে, “ভাই, সত্যি করে বল, কী হয়েছে তোর?”

লিন দেখে, ব্যাপার বড়ই গুরুতর – ভালবাসা আর পড়াশোনার মধ্যে চিরাচরিত দ্বন্দ্ব এ নয়, যে বুঝিয়েসুঝিয়ে সামলানো যাবে – চেঁ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শু'কে তার পেতেই হবে।



সে বন্ধুকে সাত্ত্বনা দিয়ে বলে, “চিন্তা করিস না, ও বড়লোকের মেয়ে তো কী হয়েছে, তুইও বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র; একটা উপায় নিশ্চয়ই হবে।”

তখন চেং আক্ষেপ করে শোনায় মুদ্রাঘটিত জটিলতার কথা। বলে,

“বুড়ি মরলে হয়ত ওটা আমার নামেই উইল করে যাবে, কিন্তু সে করে হবে, তাদিন অপেক্ষা করে বসে থাকব? ততদিনে হয়ত শু’ই বুড়ি হয়ে যাবে...”

“আরে, তার মানে তো ওটা তোর প্রায় হয়েই আছে! একদিন ঘন্টা কয়েকের জন্য ধার নে না। শু’কে মুদ্রাটা দেখিয়ে প্রলুক্ত কর, বল, আমাকে বিয়ে করলে ওটা একদিন তোমারই হবে। তাতেই কাজ হবে।”

“না না, ঠাকুমা ওটা যেমন যত্ন করে বাঞ্ছের মধ্যে রেখে দেয়, কয়েক ঘন্টার জন্য হলেও হাতছাড়া করতে রাজি হবে না। এভাবে হবার নয়,” হতাশ হয়ে বলে চেং।

“আরে বোকা, এত হতাশ হয়ে পড়ার কি আছে? প্রেমে পড়ে ইঙ্গক পড়ার বইয়ের সঙ্গে কি বুদ্ধিগুলোও সরিয়ে রেখেছিস? আসলটা উপহার দিতে না পারিস, নকলই দে না! চ্যাং’এর বাবা কামারশালার কারিগর, জানিস না নাকি?”

~০~

একদিন বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি ফেরে চেং, ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলে, লিন তাঁর প্রাচীন জিনিসপত্রের সংগ্রহ দেখতে খুব আগ্রহী। ঠাকুমা উৎসাহের সাথেই চাবির গোছাটি বার করে লাল চন্দনকাঠের কারুকাজ করা ভারী আলমারিটি খোলেন, একে একে দেখাতে থাকেন তাঁর সেইসব গর্বের ধন। এমনই যখন মিং যুগের চীনামাটির দুর্দান্ত ফুলদানিটি নিয়ে লিন ঠাকুমার সঙ্গে দারণ আলাপ জমিয়ে ফেলেছে, এটা-ওটা নাড়াচাড়া করার ফাঁকে সেই মুদ্রাটি হাতে নিয়ে মোমের উপর ছাপ তুলে নেয় চেং।

দু’দিন পর চ্যাং খবর আনে, সীসার উপর সোনার জল করা একটি চমৎকার নকল মুদ্রা তার বাবা বানিয়ে ফেলেছেন। চেং তো আনন্দে আটখানা। তবে সেই সঙ্গে তার একটু ভয়-ভয়ও লাগতে থাকে, কে জানে, যদি অভিজ্ঞ শু এক নজরেই ধরে ফেলে, যে এটা নকল? যদি সে রেগে গিয়ে তার সঙ্গে আর কোনোদিন কথাই না বলে?

~০~

শু’য়ের কাছে খবর পাঠায় সে, দেখা করতে খুব আগ্রহী জানিয়ে। উত্তর আসে, সোমবার বিকেলে নদীর উত্তরের বাগানে হাজির থাকতে। সাড়া পেয়ে তো চেং’য়ের মনে আনন্দ আর ধরে না, ফিটফাট সেজেগুজে পারলে দুপুর থেকেই সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু হায়, বিকেলবেলা শু’র বদলে সেখানে উপস্থিত হয় তার পরিচারিকা। সেও এক রূপসী তরুণী, চলনে-বলনে লাস্যময়ী; তার চোখের কোণে হাসির ঝলক বুঝিয়ে দেয়, এই খেলায় সেও অভিজ্ঞ।

চেং’য়ের কানের কাছে তার রক্তাভ ঠোঁটদুটি এনে ফিসফিস করে বলে, “আজ রাত্রে যখন মাথার উপর চাঁদ উঠবে, যখন ঘুমিয়ে পড়বে সারা শহর, তখন আমাদের বাড়ির দরজা খোলা থাকবে তোমার জন্য...”

তার হৃদয়ের গতি যেন দ্রুত হয়ে যায় এই কথা শুনে। মেয়েটি বলতে থাকে,

“... উঠোনে এসে খিলানের নিচে দাঁড়াবে। ডানদিকের সারি সারি ঘরগুলির মধ্যে একটির জানালা থাকবে খোলা, আর জানালার পাশে ফুলদানিতে রাখা থাকবে লাল গোলাপ। তার পাশে তোমার আনা

উপহারটি রেখো, আর ফিরে যেও খিলানের কাছে। যদি তোমার উপহার হয় মনোমত, তাহলে ঘরের দুয়ারটি খুলে সে তোমায় আমন্ত্রণ জানাবে সেই রাত্রির মত...” – ঠোঁটে তার লজ্জারাঙ্গ হাসি।

“তবে...” সাবধানবাণী জানাতেও ভোলে না সে, “ছায়ার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করবে, আর কোনো শব্দ করবে না। বাড়িতে কোথাও কোনো আলো জ্বলবে না। মনে থাকে যেন, ওই বাড়িতে সবারই ঘূর্ম খুব পাতলা। সূর্য ওঠার আগেই তোমায় ফিরে যেতে হবে।”

“শু জানে, তুমি একজন ছাত্র কেবল, স্বভাবতই অনভিজ্ঞ আর অস্ত্রিমতি। তার উপযুক্ত প্রেমিক হবার মত যোগ্যতা তোমার এখনও নেই। তাই তোমার উপহার যদি সত্যিই পছন্দ হয়, তবেই ভবিষ্যতে আবার দেখা হবার সন্তানবনা। নইলে, এ শহরে তো সুন্দর পুরুষের অভাব নেই।”

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না সে, মুখে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি এঁকে দ্রুতচ্ছন্দে চলে যায় সেতু পেরিয়ে।

~০~

সেই রাত্রে দুরাংদুর বুকে চেঁ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সব নির্দেশ। চুপিসাড়ে সেই নিরিবিলি আঙিনায় এসে, জানলার পাশে তার উপহার রেখে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে খিলানের তলায়।

একটু পরে তার মন পুলকে ভরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে একটি দরজা খুলে যায়। চেঁ দৌড়ে যেতে যায় তার পানে, পরক্ষণেই সামলে নেয় নিজের আবেগ। লম্বু পায়ে ছায়ার মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যায় সেই ঘরে। তারপর? স্বপনচারিণীর বহুকাঞ্জিত সান্নিধ্যে সে পরমানন্দে যাপন করে কয়েক প্রহর।

~০~

তোরের মোরগ ডেকে ওঠার আগেই চেঁ বাড়ির পথ ধরে। সূর্য উঠতে তখনও দেরি, তবুও তার যেন মনে হয় এক নতুন রঙে সেজে রয়েছে চারিদিক। চুপিচুপি নিজের ঘরে ফিরে জানলার পাশে বসে সে একমনে গত রাত্রির মিষ্টিমধুর সূতি রোমস্তন করতে থাকে।

যদিও মেয়েদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা তার আগে কখনো হয় নি, তবুও তার মনে হতে থাকে, শু যেন সকল মেয়েদের সেরা। আক্ষেপ করে, কতদিনে সে পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তাহলে তাকে এভাবে আর ছায়ার মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না। শু’ও তখন তাকে যথার্থ গুরুত্ব দেবে। কিন্তু যদি না-ও দেয়, আর কোনোদিনও যদি সে তার সঙ্গ না পেতে পারে, তাহলেও গতকালের সুখসূতি সে সারা জীবন ধরে বুকে ধরে রেখে দেবে গর্বের সাথে।

~০~

আনন্দে মেতে থেকে সে আর লিন’কে খবর দেওয়ার কথা মনে রাখে না। একা’একাই পৌঁছে যায় সেই ফুলের দোকানে, যেখানে সে প্রথম পেয়েছিল তার প্রেয়সীর সাক্ষাৎ। আজকে যেন ফুলগুলোকে দ্বিগুণ বলমলে মনে হতে থাকে, তার খুশির সঙ্গে মিলিয়ে যেন তারা সবাই হাসিখুশি। উৎফুল্ল মনে অপেক্ষা করতে থাকে সে, কখন শু’র পরিচারিকা এসে জানাবে পরবর্তী সাক্ষাতের দিনক্ষণ।

তাই সে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে ওঠে, যখন দেখে স্বয়ং শু’ই মরালসঞ্চারে এগিয়ে আসছে তার দিকে। একমুখ হাসি নিয়ে চেঁ তাকে সন্তুষ্যণ করতে যায়, কিন্তু তার আগেই শু’র মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় –

“গতকালের উপহারের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আমার পরিচারিকা তোমার যথাযথ সেবা করেছিল...”

হতবাক হয়ে যায় চেং। ‘পরিচারিকা?’

ভেবে কুল পায় না সে, “কিন্তু... কাল রাত্রে... এত উৎসুক মনে হল... তোমায়... ওঃ... পরিচারিকা!”

হৃদয়বিদারক হাসির সঙ্গে শু বলে ওঠে, “বেচারা! আমার করণা হচ্ছে তোমার উপর। তা, ঠাকুমা কি জানেন, তাঁর নয়নমণি ওই মুদ্রাটি কী করেছে তাঁর সোনামণি?”

“কিন্তু...”

উদ্বিত স্বরে বলে যেতে থাকে শু, “তুমি ভাবলে কি করে খোকা, যে আমার মত এক সম্মানিত মহিলা তোমার সঙ্গে মাখামাখি করবে?

বইখাতার বাইরের সমাজটার কোন ধারণা রাখো? এভাবে তোমার সঙ্গে এখানে কথা বলাও আমার পক্ষে অস্বস্তিকর, কোনো বাগানে বা অনুষ্ঠানে বেড়াতে যাওয়ার কথা তো ভুলেই যাও। আর কোনোদিন আমার বাড়িতেও ঢোকার চেষ্টা কোরো না, লোক ডেকে ধরিয়ে দিতে কেউ দ্বিধা করবে না।”

“বুঝলে,” একটু থেমে, ব্যঙ্গের সঙ্গে সে বলে চলে, “আমাকে পাবার আশা ছেড়ে দাও – একদিনের জন্য আমার পরিচারিকাকে পেয়েছিলে, আসলের পরিবর্তে সেই নকল নিয়েই বরং সন্তুষ্ট থাকো...”

~০~

এতক্ষণে সম্বিধ ফিরে আসে চেং’য়ের। চমকের ঘোর কাটিয়ে সে বলে ওঠে,

“হ্যাঁ তাইতো, ভাল কথা, আসল-নকলের কথা যখন তুললেই, জানিয়ে রাখি, আমার উপহার দেওয়া ওই ‘প্রাচীন’ মুদ্রাটি আবার কাউকে দেখিয়ে গর্ব করার চেষ্টা কোরো না যেন। ওটাও নকল, বিশ্বাস না হয় একটা ধার দাঁতে কামড়ে দেখে নিও।”

মুচকি হেসে শু’র বিভ্রান্ত মুখ একবার দেখে নিয়েই চেং তাকে পিছনে ফেলে চলে আসে, কোনো উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই।

আর একলা দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে শু, তার উপরেও কেউ এমন চাল দিতে পারে? “একমাত্র এমন ধূর্ত কেউ”ই হতে পারে আমার যোগ্য জুড়ি...”



বটরুক্ষে তেলাপিয়া

মোশাররফ খান

কাল ছিল অমাবস্যা, সন্ধ্যাভর গেল কালবৈশাখীর তাঙ্গৰ আৱা সারা রাত ধৰে অৰোৱা বৰ্ষণ। প্ৰতিদিনেৰ মত কাকভোৱে বটমূলে পুজো দিতে এসে একেবাৱে দোলন বৌয়েৱ বিস্ফাৰিত চোখেৰ সামনেই ঘটে গেল এই অদ্ভুত কাণ্ড। বিশাল বটেৰ গুঁড়ি বেয়ে নেমে আসা জলেৰ স্বাতোৱ সাথে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে এক জোড়া ছটফটে তেলাপিয়া। চকচকে সোনালি আঁশে মোড়া ডিমভোৱা হলুদ পেট কাত হয়ে শুয়ে, থেকে থেকে লেজ নেড়ে খেলছে তাৱা একেবাৱে দোলন বৌয়েৱ পায়েৰ কাছে। বিস্ফাৰিত চোখে কম্পিত হৃদয়ে এক স্বৰ্গীয় অনুভবে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে দোলন বট। তাৱ মনে একটা তাৎক্ষণিক বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠে – নিশ্চয়ই এই তেলাপিয়া ঈশ্বৰপ্ৰেৰিত এবং অলৌকিক কোন নিগৃঢ় ইঙ্গিতেৰ বাহন। সবাৱ অলক্ষ্যে কোঁচড়ে জড়িয়ে পৱম মেহে তাৰেৰ ঘৰে নিয়ে যায় দোলন বৌ।

প্ৰতিদিনেৰ ধৰাৰাঁধা শাকাঞ্জেৰ পাতে আজ সযত্বে সাজানো তেলাপিয়াৰ ব্যাঞ্জন দেখে অবাক হয় রমেন হালদার।

- কিৱে দোলন, মাছ কোথা পেলি আজ?
- মাছ নয়, মাছ নয়, বল ঠাকুৱেৰ প্ৰসাদ! স্বয়ং ভগবান পাঠিয়েছেন গো!
- সব শুনে রমেন তো হেসে কুটিকুটি।
- তুই যে কী বলিস দোলন, বটগাছে আবাৱ তেলাপিয়া আসে কোথা থেকে?
- বিশ্বাস হয় না বুঝি? দেখবে তো কাল এসো ভোৱে আমাৱ সাথে বটমূলে।

সপ্তাহ না ঘুৱতেই একদিন দোলন বট রমেনকে আড়ালে ডেকে বলে,

- বলেছিলাম না এই তেলাপিয়া আমাৱ ঠাকুৱেৰ আশীৰ্বাদ? এই দেখ এখানে, ওৱা এসে গেছে। বলে রমেনেৰ হাত টেনে নিয়ে তলপেটে ছোঁয়ায়।

- এখানে আছে, আমি জানি।
- বলিস কি দোলন! তবে যে ডাক্তার বদ্যিৱা বলে তোৱ ছেলেপুলে হবে না কোনদিন!

অপলক চোখে রমেন চেয়ে থাকে দোলন বৌয়েৱ দিকে। রমেনেৰ সহসা মনে হয় এ যেন অন্য কোন দোলন। রাতারাতি যেন তাৱ শাৱীৱিক ভূগোল বদলে গেছে। দোলনেৰ শুভ শীৰ্ণ দেহাটি ঘিৱে রেখেছে অপূৰ্ব মাত্ৰত্বেৰ ছায়া। এক অদ্ভুত শিহৱণ নাড়া দিয়ে যায় তাৱ সমস্ত অস্তিত্ব। দোলন কি তাহলে সত্যিই মা হতে চলেছে?

সৰ্বী শোভনা সুন্দৱী সেই কখন থেকে পিছু নিয়েছে। সকাল থেকে ঘুৱঘুৱ কৱচে পায়ে পায়ে। কানেৱ কাছে ঘ্যানৰ ঘ্যানৰ কৱে চলেছে সমানে।

- লোকেৱ মুখে কত কী শুনি। বটৰুক্ষ নাকি তোদেৱ বৱ দিয়েছে লক্ষ্মীৰ ভাঙ্গাৰ উজাড় কৱে? আমায় বুঝি বলবিনে দোলন?

প্ৰিয় সখীৰ কষ্টে অভিমান। তাৱপৱ দোলনেৰ শৱীৱেৰ দিকে চোখ পড়তেই চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে যায় শোভনাৰ। হৈ হৈ কৱে উঠে সে।

- কিলো মাগী, পেট বানালি কৱে? তুই না বাঁজা?
- চুপ চুপ, পোড়াৱমুখী, চেঁচামেঁচি কৱিসনে, আয় বলি তোকে!

সহিকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায় দোলন। বটমূলে তেলাপিয়ার আবির্ভাব থেকে পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া যাবতীয় ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বলে সখী শোভনাকে।

- তুই আমার প্রাণের সই। কথাটা রাষ্ট্র করিসনে ভাই! দিব্যি রহিল আমার।

- যাহু, এসব কি রাষ্ট্র করার কথা?

- ঘরে আছিসনিকো দোলন মা! একদিন সকালে দাওয়ায় এসে হাঁক ছাড়ে অশীতিপর বৃদ্ধা রমলা দাসী। বুড়ির নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, নইলে এই সাত সকালে এমন সোহাগী ডাক কেন? দাওয়ায় বেরিয়ে আসে দোলন বৌ।

- রমু মাসি যে! কি মনে করে, এদিকে যে বড় আস না আজকাল?

- কোতাও কি যাতি পারি রে? বাতের ব্যথায় শরীল জরজর। হাটতি চলতি পারিনে। তোর কাচে কি মলম আচে দোলন? একটু মালিশ করে দিবি মা?

তো এই হলো আসল কথা। রমু মাসির জন্য দোলন বৌয়ের মনটা অসীম মমতায় ভরে উঠে। রমলা দাসীকে একটি জলচৌকিতে বসিয়ে তার হাড়িসার বুকে পিঠে আর্চর্চ মলমের মালিশ লাগায় বড় যত্নের সাথে। আরামে চোখ বুজে আসে বুড়ির। দোলনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে -

- সেদিন শোভনা যে কইলে তোর কাচে দেবতার বর টু কি এয়েচে। আমার বাতের ব্যথাটা সেইরে দে না মা!

- সামনের মঙ্গলবার বৈশাখী অমাবস্যা। ভোরের বেলা বট মূলে এসো একা। দাওয়াই দেবনে। দোলনের মুখ দিয়ে ফস্ক করে বেরিয়ে যায় কথাগুলো কোন চিন্তাভাবনা না করেই। রমলা দাসীর ফোকলা দাঁতের ফাঁকে চিকচিক করে প্রত্যাশার হাসি।

রমেনদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শুধু আড়াই বিঘে জমি জুড়ে এই বিশাল বটের ঘন অরণ্য। আশে পাশে দু'এক চিলতে চাষের জমি, তার সাথে লাগোয়া এই এতটুকু বসত বাটি। রমেন আর দোলনের ছোট সংসারে অভাবের টানাপোড়েন লেগেই আছে বছর ভর। বিন্দুবানদের নজর পড়ে আছে এই জমিটুকুর উপর। প্ররোচনা, লোভ-লালসার হাতছানি, ভয়ভীতির আস্ফালন সবই আছে। তবুও শত অভাব-অন্টনেও এই আড়াই বিঘের উপর কখনো হাত দেয়নি রমেন হালদার।

স্বর্গীয় পিতৃদেব বলে গেছেন - এ আমাদের সাত পুরুষের আদর-সোহাগে পালিত বট। এই প্রাচীন বটের বিশাল দেহের চড়াই-উত্তরাইয়ে, বৃক্ষকাণ্ডের খানা-খন্দে, ঘন ডালপালার আলো-আঁধারিতে কতশত পাখপাখালি, সাপখোপ, কীটপতঙ্গ গড়ে রেখেছে শত বছরের নিবাস। এই বট ওদের জন্মভূমি। বিচরণের অভয়ারণ্য। নিঃবুম রাতের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে এই বট রচনা করে তার নিজস্ব জীবজগতের নৈশ মেলার আসর। নিশাচর পাখি, জোনাকি, ঝিঁঝি আর তাবৎ বাচাল কীটপতঙ্গদের নৈশ সঙ্গীতে মাতোয়ারা হয় এই বটের অরণ্য আর তার আশপাশ। দেশান্তরী পাখপাখালি কত দূরের মূলুক থেকে উড়ে আসে। বটের মগডালের চাতালে ঘন ডালপালা আর পত্রভূমির উপত্যকায় গড়ে তোলে শীতের নিবাস। এখানে জন্মায় বংশধর। এখানের ডালে ডালে লাফায় পক্ষীশিশু। ক্রমে তারা বড় হয়, শিক্ষিত হয়ে উঠে জীবনধারণের নানাবিধি কলাকৌশলে। তারপর গ্রীষ্মের প্রাঙ্গালে দল বেঁধে উড়ে যায় অন্য গন্তব্যে। শত অন্টনেও যেন এই বটের গায়ে হাত দিসনি বাপ! কেড়ে নিসনে কখনও ওদের এই প্রাচীন নিবাস!

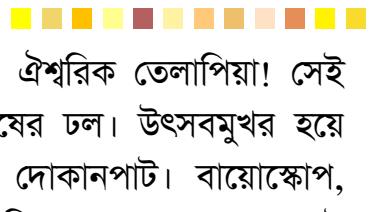
কেমন করে যেন আবার ঘুরতে শুরু করে রমেনদের মরচে ধরা ভাগ্যের চাকা। দোলন বৌয়ের কোল জুড়ে বসে শুভ স্নিগ্ধ যমজ শিশুর মেলা। হাটে রমেনের লুঙ্গি-গামছার কারবারের পালে লাগে মা লক্ষ্মীর

দাক্ষিণ্যের হাওয়া। দু'দুটো দুধেল গাড়ীর দুধে সকাল-বিকেল যেন বান ডাকে! বাড়ীর পাশের দুফালি জমিতে এবার দিয়েছিল মাঘী সরষে। সেখানেও মরসুমে বয়ে যায় সরুজ হলুদের বান।

হালদার বাড়ীর ভাগ্যের পালা বদলের শুভাকাঞ্জী যেমন অনেক, তেমনি নিন্দুকেরও অভাব হল না মোটেও। এবাড়ী ওবাড়ী কানাঘুঁঝো। হালদার বংশের নিতে আসা প্রদীপ রমেন হালদারের কপাল ফিরেছে, এও কি সয়! হিংসায় জ্বলে মরছে জ্ঞাতি'শক্ত ভোলা বাঁড়ুজ্যে। দেবতার বরটরের গল্প নাকি হালদারদের মিথ্যাচার, ভাঁওতাবাজি। একদিন সে রাজ্যের মানুষ জড়ো করে বুক চিতিয়ে বলেই বসল, দেখাচ্ছি আজ হালদারদের জারিজুরি। টারজান স্টাইলে লাফিয়ে লাফিয়ে এ-বুরি ও-বুরি হয়ে তরতর করে উঠে গেল সে বটের উঁচু ডালে। তেলাপিয়া রহস্য অভিযানে দ্রুত অদৃশ্য হল ঘন বটপত্রের নিশ্চিন্দ্র অন্ধকারে। অনেকখানি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও ভোলার নেমে আসার নাম নেই। নৈশঃস্নে স্থির হয়ে আছে বটের মূলে অপেক্ষমান জনতার ভিড়। কী করছে ভোলা এতক্ষণ দুর্গম বটের গহীন গভীরে! এক ঝাঁক হাড়গিলে ব্যস্ত হয়ে ডানা মেলে উঠে পড়ল বটের শীর্ষ ছেড়ে। ত্রন্তে পাখা ঝাপটে উড়ে গেল তারা, খাল পেরিয়ে, তমাল বনের পাশ কাটিয়ে। উদ্বেগ-উৎকর্থায় শিউরে উঠে মানুষ। ঠিক তখনই, ধপাস করে বটের মূলে আছড়ে পড়ল ভোলার শরীর। মুখে ফেনা তুলে, হাতেপায়ে খিঁচুনি দিয়ে, ছটফট করতে করতে সবার চোখের সামনে ভোলার বিশাল দেহটি স্থির হয়ে গেল। এক প্রবীণ এগিয়ে এসে পরখ করে বললেন — কালনাগিনীর কোপ। এমন গুন্দত্য কী দেবতার সয়? তেনাদের সাথে দাদাগিরি? বলে তিনি চোখ মুদে জোড়া হাত উপরে তুলে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। ভোলার মরদেহের সৎকার শেষে দল বেঁধে শশানযাত্রীরা ফিরে এল হালদারদের বটমূলে। জল দিয়ে ফুল দিয়ে পুজো দিল প্রস্ত্রে প্রস্ত্রে। পূজারীরা বাড়ী বয়ে ষাটাঙ্গে প্রণাম করে গেল দোলন বৌকে। ভক্তিতে বুঁদ হয়ে বসে রইল তারা দোলন বৌয়ের পায়ের কাছাটিতে। রোগ-শোক-বিপদ থেকে সুরক্ষা দাও মা-জননী। প্রতিষ্ঠিত হলো হালদারদের বটবৃক্ষের তেলাপিয়ার মিথ।

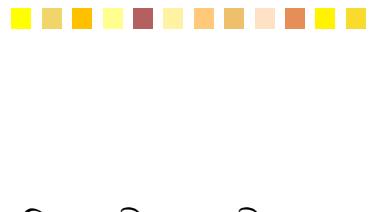
কালে কালে পুরোনো বটের প্রশস্ত কাণ্ডের ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া বিশাল গর্তে বৃষ্টির জলে সৃষ্টি হয়েছে গভীর জলাধার। সেখানেই সে দেখে এসেছে তাদের। ঐ বিশাল বটের গোপন গুহায় সত্যিই গড়ে উঠেছে এক তেলাপিয়া উপনিবেশ। ঝাঁকে ঝাঁকে, ক্ষুদ্র পোনা থেকে মাঝারি, বৃহৎ এবং প্রবীণ, গুচ্ছের তেলাপিয়া। রহস্য শুধু এটুকুই, ওখানে ঐ অত উঁচুতে গহীন বটের গহুরে তেলাপিয়ার আবির্ভাব হল কেমন করে? রমেন হালদার ভেবে বের করেছে, ভূমিতল থেকে বটবৃক্ষের ঐ উচ্চতায় তেলাপিয়া মাইগ্রেশনের এক সন্তান্য পটভূমি। হয়তো একদা কোনো ত্রুটি কাক কিংবা বক পাখি আশেপাশের ডোবা-নালায় জল পান করে উড়ে গিয়ে বসেছিল ঐ বটের ডালে, কোনো ভাবে বয়ে এনেছিল কিছু পরিপক্ষ তেলাপিয়ার ডিম। তা থেকেই উৎপত্তি আর কালে কালে বংশবিস্তার। বর্ষার মৌসুমে ঝড়বৃষ্টির তোড়ে বটবৃক্ষস্থ জলাশয়ে যখন বয় জলোচ্ছাস, তখনই বুঝি বিপথগামী হয় কিছু বানভাসী তেলাপিয়া। তাদেরই দু'একটা নেমে আসে গুঁড়ি বেয়ে একেবারে বটের গোড়া পর্যন্ত। বাস্তবতার নিরিখে এটাই হতে পারে বটবৃক্ষে তেলাপিয়ার সন্তান্য পটভূমি।

কিন্তু দোলন বৌকে সে কথা বোঝায় কার সাধ্য? তার কাছে তো এই তেলাপিয়া প্রগাঢ় রহস্য ঘেরা। স্বর্গবাসী দেবতার বর বিশেষ। এই তেলাপিয়াকে ঘিরে তার মনে বাসা বেঁধেছে এক গভীর প্রত্যাশা আর নিবিড় বিশ্বাসবোধ। তার বিশ্বাস ভগবান না জানি তাকে কোন পুণ্যের বর দিয়েছে। এই নতুন ভাবনা দোলন বৌকে উদ্বেলিত করে রাখে অহর্নিশি। স্বর্গপ্রেরিত এই তেলাপিয়ায় কি আছে ধরাতলের তাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম? প্রসবোন্মুখ নারীর দুর্বহ প্রসববেদনার অলৌকিক নিরাময়? মানবজাতির কোন দুর্বিনীত সমস্যার স্বর্গীয় সমাধান?



সেই থেকে বড় রহস্যঘেরা হয়ে রইল এই বটবৃক্ষ আর তার গর্ভেৎসারিত ঐশ্বরিক তেলাপিয়া! সেই থেকে ফি-বছর বৈশাখী অমাবস্যার ভোরে হালদারদের বটমূলে নামে হাজার মানুষের ঢল। উৎসবমুখর হয়ে উঠে শ্রীধরপুর গ্রাম। বট অরণ্যের চারপাশ ঘিরে রাতারাতি গড়ে ওঠে শতেক দোকানপাট। বায়োক্ষেপ, সার্কাস, পুতুলনাচ, মন্ডা-মিঠাইয়ে মেলা জমজমাট থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। দূর-দূরাত্ম থেকে ছুটে আসে মানুষ। অসুস্থরা আসে দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম কামনায়। নিঃসন্তান রমণীরা গোপনে ব্যক্ত করে সন্তানবর্তী হওয়ার আকুল বাসনা। এমনি আরও কত মানুষ মনের গভীরে লুক্ষায়িত কামনায় বটমূলে উপবিষ্ট ধ্যানগন্তীর দোলন বৌয়ের হাতের এক লোকমা তেলাপিয়া-অন্ন মুখে পুরে ফিরে যায় পর্বতপ্রমাণ প্রত্যাশা বুকে নিয়ে। কেউ কিছু ফল পায়, কেউ পায় না। যাদের হয়, তারা সেই অলৌকিক নিরাময়ের কথা ছড়িয়ে দেয় দূর থেকে দূরাত্মরে। যাদের হয় না, তাদের খবর কে-ই বা রাখে।

দিন মাস বছর ঘুরে ফিরে আসে। দোলন বৌয়ের বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়, তার হাতে দেবতারা গচ্ছিত রেখেছেন মানুষের মঙ্গল। অবোর বর্ষণের রাতে স্বর্গরাজ্যের কোন অজানা বহতা নদীর তীর্থ ছেড়ে ঘন বটের বন পেরিয়ে ভূতলে নেমে আসে যে আত্মত্যাগী তেলাপিয়া, তারাই সেই মঙ্গলের বাহন। দোলন বৌয়ের গভীর প্রত্যয় দিনমান তার স্মিঞ্চ শুভ অবয়বে মাখিয়ে রাখে স্বর্গীয় আবীরের ছটা। রমেন সারাদিন ভাবে। ভেবে ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কি ভাবে কী হয়, রমেন সেসব বোঝে না। হয়তো মানুষের মনস্তত্ত্ব, বিশ্বাস আর আস্থার সাথে নিবিড় কোন যোগাযোগ আছে তার শারীরিক রসায়নের। রোগ-ব্যাধি, সুখ-দুঃখ, হতাশা, বিষাদ, ত্রুটি, অবসাদ, সবই বুঝি সেই শারীরিক রসায়ন-নিয়ন্ত্রিত অবস্থা বিশেষ। বটবৃক্ষের তেলাপিয়ার উৎস-রহস্য তো রমেন হালদারের অজানা নয়। তবু যেন দোলন বৌয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিতে মন চায় না তার। নিশিদিন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে সে। দোলনের অলৌকিক তেলাপিয়াদের অমঙ্গল চিন্তায় তার মনপ্রাণ অস্ত্রিত হয়ে থাকে। তার ভয়, যদি কোনোদিন শুকিয়ে যায় এই বটের গুপ্ত জলাধার! যদি কোনো নির্দয় খরা এসে শুষে নেয় বট গর্ভের সঞ্চিত সবটুকু জল। যদি তেলাপিয়ারা এককালীন নির্বৎশ হয়ে যায় কোনো বিষধর সর্পের দংশনে! কোনোদিন বৃষ্টিস্নাত ভিজে বটের গুঁড়ি বেয়ে ছটফটে রূপালী তেলাপিয়ারা যদি আর ফিরে না আসে!



সেই ছেলেটা

প্রদীপ সেন চৌধুরী

মানুষের জীবনে অতীতে এমন কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যা কখনো কখনো তার ভবিষ্যৎ জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এরকমই একট ঘটনা প্রদীপের জীবনে ঘটেছিল।

প্রদীপ চ্যাটার্জি, বর্তমানে বয়স ৬৫। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প থেকে গত পাঁচ বছর হোল অবসর নিয়েছে। সফল মানুষ, এক মেয়ে ও এক ছেলে। চাকরী থাকতেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ছেলে অপেক্ষাকৃত ছেট, বিয়ে হয়নি এখনো, কলকাতায় থেকে চাকরী করে।

চাকরী থাকাকালীন প্রদীপ বর্ধমানে বাড়ীও করেছে। বর্ধমানে বাবর বাগ-এ বেশ ফাঁকা জায়গাতেই বাড়ীটা। সামনে বড় রাস্তা। দোতলা বাড়ী, নীচে গ্যারেজ। বেশ শান্তিতেই স্ত্রী সুমিতাকে নিয়ে ছিল। অবসরের পর সময় কাটানোর জন্য বই পড়া, লেখা আর ইন্টারনেটকেই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু একদিন –

প্রদীপ হঠাতে দেখেছিল ছেলেটাকে। চাকরী থাকতে একটা গাড়ী কিনেছিল – টাটা ইণ্ডিকা। গাড়ীটা অনেকদিন সার্ভিসিং করানো হয়নি বলে একদিন সকালেই টাটা মটরস এর সার্ভিসিং সেন্টারে নিয়ে গেল গাড়ীটাকে। গাড়ীটাকে দাঁড় করাতেই যে ছেলেটি প্রথমেই এগিয়ে এল তাকে দেখেই চমকে উঠল সে। ছেলেটি যেন তারই ছেটবেলার প্রতিমূর্তি। কি করে এমন হল? – একটু আনমনা হয়ে গেল সে।

হঠাতে ছেলেটির কথায় সম্বিত ফেরে। ‘স্যার, গাড়ীর কি হয়েছে?’ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সে। আনমনা হয়েই প্রদীপ বলে, ‘সার্ভিসিং করতে হবে।’ ছেলেটির পেছনেই মালিক তারাপদ বাবু আগিয়ে এলেন, উনি বহুদিনের পরিচিত, বললেন, ‘কি ভাবছেন? ওকে আগে দেখেননি তাই? ও আমার কাছে মাস তিনিক হল এসেছে, ওকে নিঃসঙ্কোচে আপনি গাড়ী দিতে পারেন, ও খুব ভাল মিষ্টি।’

ছেলেটিকে সমস্ত কিছু বুবিয়ে দিয়ে মালিকের সামনে গিয়ে বসল সে। ‘চ্যাটার্জি সাহেব, আপনি তো বহুদিন পরে এলেন, বসুন, চা খান।’ চা খেতে খেতে প্রদীপ তারাপদ বাবুর কাছ থেকে জানল যে ছেলেটি নাকি অনেক দূর থেকে আসে, শিক্ষিত ছেলে, স্কুল ফাইনাল পাশ। অটোমোবাইলে আই টি আই পাশ, টাটাতে ট্রেনিংও করেছে। নাম বাসুদেব। এর মধ্যেই বাসুদেব বলে গেল গাড়ী হতে দু’দিন সময় লাগবে।

‘তাহলে আজ আসি,’ বলে সে রিঙ্গা নিয়ে বাড়ী চলে এল। বাড়ীতে এসে খবরের কাগজটা নিয়ে বারান্দায় এসে বসে। কিন্তু কাগজ পড়ায় মন না দিয়ে সে ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে নিজের যৌবনের চেহারাটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে – লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট, দোহারা চেহারা, চুল কোঁকরানো, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নাক মুখ চোখা, সব কিছু মিলিয়ে এক স্বাতন্ত্র্য ছিল তার চেহারায়। এইজন্য কলেজ জীবনে সবার প্রিয় ছিল, ইউনিয়নের নেতাও ছিল সে। আজ বাসুদেবের মত একটা আদিবাসী ছেলের মধ্যে সেই একই ছবি; কি করে সন্তুষ? এরইমধ্যে সুমিতা তাড়া দিয়ে গেল, ‘এবার ওঠ, বেলা তো হল! স্নান খাওয়া করতে হবে তো, নাকি?’ ঘড়িতে দেখল প্রদীপ একটা বাজে। কাগজ একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে স্নান করতে গেল সে। অবসরের পর থেকে দুপুরে একটা ভাতঘুম দেবার অভ্যাস হয়ে গেছে।

আজ শত চেষ্টা করেও দু’চোখের পাতা এক করতে পারল না। বার বার ছেলেটার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কে এই বাসুদেব? পরের দিন সকালে আর সে স্থির থকতে না পেরে আবার সেই সার্ভিস সেন্টারে গেল। তারাপদ বাবু দোকানে ছিলেন না, বাসুদেবই এগিয়ে এসে বলল, ‘আজ তো গাড়ী হয়নি স্যার, কালকেই তো বললাম দু’দিন লাগবে।’ প্রদীপ হেসে বলল, ‘গাড়ী নিতে আসিনি, তোমার সঙ্গে আলাপ করব

বলে এলাম।' বাসুদেব কি বুঝল কে জানে, একটা টুল এনে সামনে বসল। সে ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় থাক?' বাসুদেব বলল, 'পানাগড়ের কাছে টেন্ট গেটে।' 'তোমার বাবার নাম?' 'সহদেব মুর্মু। বাবা মারা গেছেন। মা ওখানে সুইপারের কাজ করেন।'

এই কথা বলে সে উসখুশ করতে লাগল। প্রদীপ বুঝতে পারল মালিক আসার সময় হয়েছে, কাজ করতে হবে, তাই ও ওরকম করছে। প্রদীপ ওকে ছেড়ে দিল – বলল, 'যাও, কাজে যাও।'

বাড়ী চলে এল সে। বাসুদেবের দু'টি কথা তার কানে বাজতে লাগল – টেন্ট গেট আর সহদেব। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সুমিতা বলল শপিং করতে যাবে। তবে প্রদীপকে যেতে হবে না, ও পাশের বাড়ীর মহিলার সঙ্গেই যাবে। প্রদীপ একটু স্বস্তি পেল কারণ ও নিশ্চিন্তে একটু ভাবতে পারবে।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, এই কি সেই সহদেব? সৃতির পাতা থেকে পঁচিশ বছর আগের একটা রাতের কথা তার চোখের সামনে ভেসে এল। তখন দুর্গাপুরে ইস্পাত প্রকল্পে কাজ করত।

সেদিন ছিল ছুটির দিন, পরের দিন ছিল নাইট ডিউটি। পৈতে উপলক্ষে এক সহকর্মীর বাড়ী গলসীতে নেমত্তম ছিল। অল্প বয়েস, সবসময় বাইক নিয়েই যেত। গলসীতেও তাই গিয়েছিল। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বেরোতে প্রায় সন্ধ্যা। ফেরার জন্য প্রদীপ বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তখন জিটি রোড হাইওয়ে হয়নি। তাই বেশী জোরে গাড়ী চালানো সন্তুষ্ট ছিল না। আস্তে আস্তেই আসছিল সে। কিন্তু পারাজ আসতে না আসতেই কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে এল। শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়, তবুও কোনরকমে সে এগিয়ে যেতে লাগল, ভাবল যদি পানাগড় পর্যন্ত যেতে পারে তবে নিশ্চিত আশ্রয় পাওয়া যাবে। কিন্তু বিধি বাম, টেন্ট গেট যেতে না যেতেই বিদ্যুৎ চমকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। ঠিক টেন্ট গেটের কাছেই একটা ছোট চায়ের দোকান অর্ধেক ঝাঁপ নামানো ছিল। গাড়ীটাকে দোকানের পাশে দাঁড় করিয়ে ঐ ঝাঁপের তলায় মাথা গলিয়ে দিল। দোকানদার আদিবাসীই হবে বোধহয়, বলল, 'বাবু আরও ভিতরপানে আসুন, ওখানে জল আটকাবেক নাই।' প্রদীপ ভেতরে ঢুকে এল, ঢুকে দেখল ও আর দোকানদার ছাড়াও আরেকজন আছে, এক অল্পবয়সী আদিবাসী বউ, দোকানদারের বউই হবে। বলল, 'লক্ষ্মী, বাবুকে চা দে, একেবারে ভিজে গেইছে।' লক্ষ্মী চা দিয়ে গেল। সে দেখল দোকানদার মাঝবয়সী হলে কি হবে, বউ তার যুবতী। এবার ভাল করে তাকে দেখল প্রদীপ। একজন শিল্পী নিখুঁত ভাবে কালোপাথরে খোদাই করে একটা নারীমূর্তি তৈরী করলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি সে। চেতারায় যৌবনের জোয়ার, কষ্টিপাথরের মত কালো শরীর চক চক করছে, ঢিলে করে পড়া ব্লাউজের উপর আঁটসাট করে লাল শাড়ী পড়া, নিখুঁত নাক মুখ চোখ, একরাশ চুল খোঁপা করে বাঁধা। চেনা জগতের বাইরে এক অনাবিল বন্য সৌন্দর্য দেখছিল সে। নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছে দেখে লক্ষ্মী একটু হাসল, 'বাবু, বিস্কুট!' ঘাড় নেড়ে সায় দিতে হাসতেই বিস্কুট দিয়ে গেল সে। আবার ও দেখল প্রদীপ দাঁতের সাড়িও নিখুঁতভাবে সাজানো, যেন একরাশ মুক্তো ঝরে পড়ল।

বাইরে উঁকি মেরে দেখল তখনো সমানে বৃষ্টি পড়ছে। পকেটে ঘড়ি ছিল, বার করে দেখল রাত আটটা বাজে।

এর মধ্যে দোকানদারের সঙ্গে আলাপ করে জানল তার নাম সহদেব মুর্মু, আর্মিতে সুইপারের কাজ করে। বাইরের দিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখল। মিশকালো অঙ্ককারে ঢেকে গেছে জিটি রোড, ঐ বৃষ্টির মধ্যেই অঙ্ককারের বুক চিরে দু'একটা লরী ধেয়ে চলেছে। আর কোন যানবাহন চলছে না। প্রদীপ কি করবে বুঝতে পারল না।

সহদেবের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, দেখে খারাপ লোক বলে মনে হল না। সহদেবকে বলল, 'এখানে রাত্রিটা থাকার মত কোন ব্যবস্থা হবে?' সে কিছুক্ষণ ভেবে জানাল যে আশেপাশে কোন হোটেল নেই,

কষ্ট করে থাকতে পারলে টেন্ট গেটের ভিতরে তার কোয়ার্টার, পাশের কোয়ার্টারে এক বিহারী থাকে, কার্পেন্টার, দেশে গেছে। সেখানে থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। যাই হোক এক রাতের তো ব্যাপার, চলে যাবে – এই ভেবে সে সহদেবকে একশ' টাকার নোট দিল, বলল, ‘সেই ব্যবস্থাই কর।’ সহদেব বলল, ‘একটুকুন বসুন বাবু,’ এই বলে দোকান বন্ধ করার জন্য সব গুছিয়ে নিলো।

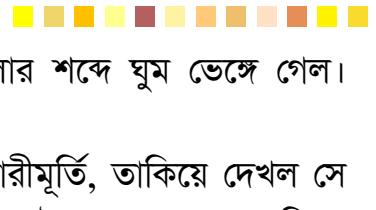
লক্ষ্মীও হাতে হাতে সাহায্য করল। দোকান বন্ধ করে ওরা দু'জন আগে আগে চলল, প্রদীপ গাড়ী চালিয়ে যাওয়া সন্তুষ্ট নয় তাই গাড়ী টেনে নিয়ে ওদের পিছন পিছন চলল।

গেট দিয়ে চুকে দেখল চারিদিক অন্ধকার। বোধহয় পাওয়ার নেই, টেন্টের রাস্তার বাতিগুলোও জ্বলছে না। তখন ঘিরবির করে বৃষ্টি পড়ছে। কিছুসময় এইভাবে চলার পর সহদেব বলল, ‘এই যে বাবু, এই হেথো!’ অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। আচমকা বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় প্রদীপ দেখল একটা ব্যারাকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে দেশলাই জ্বেলে ওর ঘরের চাবি খুলল, মোমবাতি জ্বেলে চাবি দিয়ে পাশের ঘর খুলে দিল। মোমবাতিটা সহদেব ওর হাতে দিয়ে বলল, ‘বাবু, ঘরে চুকে যান।’ ইতিমধ্যে লক্ষ্মী ওদের ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়েছে। মোমের আলোয় এবার চারিদিক দেখল সে। ব্যারাক বলতে যা বোৰায় তাই – বারান্দা কমন। পাশাপাশি চারটি ঘর, কোণেরটা সহদেবের, তার পাশেরটাতে ওকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, আর তার পাশে আরো দুটি। সব ঘরই তালাবন্ধ।

প্রদীপ ঘরে চুকে দেখল একটা দড়ির খাটিয়া আছে, আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। পেছন দিকে একটা দরজা, দরজা খুলে দেখল একপাশে একটু রান্নার জায়গা, সেখানে কিছু বাসনপত্র স্টোভ ইত্যাদি অন্যদিকে বাথরুম। বাইরে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে। চারিদিকটা কেমন গুমোট হয়ে আছে।

পাওয়ার এসে গেলে রাস্তার লাইটগুলো জ্বলে উঠলো। ঘর বারান্দা সব আলো সুইচ টিপে জ্বেলে দিল সে। গাড়ীটা মোছা দরকার। তাড়াতাড়ি দোকানে চুকে পড়েছিল, তাই জামা প্যান্ট তেমন ভেজেনি। সে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে গেঞ্জী আর বারমুড়া পড়ে বারান্দায় গাড়ীটাকে তুলে আনল, তারপর ডাস্টার বার করে মুছতে লাগল। মুছতে মুছতে খেয়াল করল বোতল আর গ্লাস নিয়ে সহদেব বসে গেছে। ওকে দেখে সহদেব বলল, ‘কি বাবু, চলবে নাকি একটুকুন?’ হাতের ইশারায় সে না বলল। গাড়ী মোছা হয়ে গেলে বাস্কেট থেকে ব্যাগ বার করল, একটা ছোট তোয়ালে আর একটা সাবান তার ব্যাগে সবসময় থাকে। সাবান তোয়ালে নিয়ে সে বাথরুমে গেল। সে যখন স্নান করে বেরল, দেখল পরিপাটি করে খাটিয়াতে বিছানা করে দিয়েছে লক্ষ্মী। এবার লক্ষ্মী একটা লুঙ্গি দিয়ে ফিক্ করে হেসে চলে গেল। চোখাচোখি হলেই ও হেসে দিচ্ছে। ওর এই ব্যবহার বেশ উপভোগ করছিল প্রদীপ। লুঙ্গিটা পড়ে বেশ জুত করে বিছানায় বসে সে একটা সিগারেট ধরাল।

এবার সহদেবের গান শোনা গেল - ‘বড়নোকের বিটিলোক লম্বা লম্বা চুল – এমন মাথায় বেংকে দিব...’ প্রদীপ বুঝল সহদেবের নেশা ধরেছে। রাত দশটা বাজল। জাতে মাতাল, তালে ঠিক। হেঁকে বলল, ‘লক্ষ্মী-ই বাবুর খাবার দিয়ে আয়।’ লক্ষ্মী এসে আসন পেতে, জল গড়িয়ে খাবার দিয়ে গেল। ওরা সাঁওতাল না মুন্ডা জানে না প্রদীপ, কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা দেখে ভালই লাগল ওর। ডিমের কষা আর রুটি, সঙ্গে পেয়ঁজ, লংকা আর আচার। খিদেটাও বেশ চাগিয়ে উঠেছিল। বসে খেতে লাগল। এরমধ্যে লক্ষ্মী শুধিয়েছে আর রুটি লাগবে নাকি, সে ইশারায় দিতে বারণ করেছে। রাত্রিবেলা চারটের বেশী রুটি খায় না। খাওয়া হলে মুখ ধুয়ে আবার বিছানায় বসল সে। আর একটা সিগারেট ধরাল সে। গুমোট আবহাওয়ায় প্রচণ্ড গরম করছে। উঠে পাখাটা চালাল। এখনো এঁটো বাসন নিতে এল না লক্ষ্মী। ভাবল ধুয়ে রাখবে কিনা। কিন্তু ক্লান্তিতে আর



ইচ্ছে করল না, শুয়ে পড়ল সে। দরজাটা ভেজানো ছিল। মাঝ রাতে দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আবার বিদ্যুতের আওয়াজ আর বামবাম করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

প্রদীপ খেয়াল করল, দরজা খুলে পায়ে পায়ে ভিতরে এগিয়ে আসছে এক নারীমূর্তি, তাকিয়ে দেখল সে আর কেউ না, লক্ষ্মী। পিঠে এলানো চুলের রাশি, সদ্যস্নাত, প্রায় নিরাভরণা, শুধু একটা হাঙ্কা রঙের শাড়িতে উন্মত্ত ঘোবন ঢাকা। এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসল সে, ‘একি তুমি! এতো রাত্রে?’ গুটি গুটি এসে ঠিক পায়ের কাছটিতে বসল লক্ষ্মী। বলে, ‘বাবুসাহেব, আপুনির কাছে একটা চাইবার আছে।’ ‘কি চাও?’ বলে সে। লক্ষ্মী যা বলল, তা হল – পাঁচ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। সহদেব এখনো কোন সন্তান দিতে পারেনি ওকে। তাছাড়া স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কও ওদের মধ্যে গড়ে উঠেনি কখনো, কারণ সহদেব মদ, আর ডিউটি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। দোকানে যায় মদের টাকায় টান পড়লে। নয়ত লক্ষ্মীই দোকান চালায়। সুখ কোনদিন পায় নি সে। ইতিমধ্যে আর্মির ডাক্তারদিদি তাকে পরীক্ষা করে বলেছে, যে বাচ্চা না হবার মত কোন দোষই নেই ওর। ওদের সমাজের প্রায় সব পুরুষই এরকম মাতাল দুশ্চরিত্র, তাই তার সন্তান ওরকম হোক তা সে চায় না। তার মত পুরুষের সন্তান সে ধারণ করতে চায়।

এইসব কথা বলতে বলতে লক্ষ্মী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, ‘বাবু আমাকে ফিরায়ে দিবেন না।’ এই বলে এক আকুতি নিয়ে সে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রদীপ প্রথমে চমকে উঠে বলল, ‘না না, এ কি করে হয়? তুমি চলে যাও! তাছাড়া সহদেব...’ কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়েই সে বলল, ‘আজ আমদানীটো ভালই, উ এখন মাল খেয়ে ছঁশ নেই, কাল সকালের আগে উঠবেক লাই।’ অশ্রুসজল চোখে সে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। হালকা বিদ্যুতের আলোয় ওর ঐ মুখ দেখে মায়া হল প্রদীপের। আস্তে আস্তে ওর মুখটা তুলে ধরতেই লক্ষ্মী ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর চুলের উগ্র তেলের গন্ধ আর শরীরের বন্যতায় সে মাতাল হয়ে গেল। এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তার দেহমন ভরে উঠল। এরপর প্রদীপ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না – এক আদিম খেলায় ওরা মেতে উঠল। পরপর তিনবার – চৰম পরিতৃপ্তি না পাওয়া অবধি লক্ষ্মী নিজেকে উজাড় করে দিল। আর প্রদীপ পেল এক অজানা স্বাদ, এক অচেনা অনুভূতি।

সবশেষে লক্ষ্মী নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ওকে একটা প্রণাম করল। তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল। প্রদীপের মনে হল ভালোবাসা নয়, যৌন আকর্ষণ নয়, যেন দেবতার কাছে লক্ষ্মী নিজেকে সঁপে দিল শুধু একটা সন্তানের আশায়।

সে জানে না ওর আশা সে পুরণ করতে পারবে কিনা, আর ভাবতে পারল না সে। পরিতৃপ্তি ক্লান্ত শরীরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সহদেবের ডাকে, ‘বাবু, আটটা বাজল উঠবেন নাই!’ প্রদীপ চোখ মেলে দেখল ঘরে সূর্যের আলো এসে পড়েছে, রাতের দুর্ঘাগের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশও পরিষ্কার। তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে গেল। রেডি হয়ে বেরোতে দেরী হল না। সহদেব একগাল হেসে চা বিস্কুট ধরল তার সামনে। ওর নির্মল হাসি কেন জানি মনে এক অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলল। সকালবেলা লক্ষ্মী তার সামনে আর আসে নি। আসবার সময় আরো একশ টাকা সহদেবের হাতে গুঁজে দিল সে। সহদেবের চোখ চকচক করে উঠল। গাড়ী স্টার্ট দেবার সময় সে বলল, ‘বাবু, আবার আসবেন।’ প্রদীপ কিছু না বলে বেরিয়ে এল। এরপর কতদিন ইচ্ছা হয়েছে লক্ষ্মীর কাছে যাবার, কিন্তু কি যেন একটা দ্বিধা, সংকোচ তাকে বার বার টেনে ধরেছে। আস্তে আস্তে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে সব।

‘কিগো অন্ধকারে বসে আছ, আলো জ্বালাও নি কেন?’ সুমিতার কথায় সম্মিলিত ফিরল তার। সুমিতাই আলো জ্বেলে দিল। চা করল, চা নিয়ে প্রদীপের পাশে এসে ওকে চা দিয়ে বসল, বলল, ‘তুমি এত কি চিন্তা করছ দু’দিন ধরে, কোন পল্পের প্লট মাথায় এসেছে নাকি?’ ও জানে গল্পের প্লট মাথায় এলে প্রদীপ নাওয়া খাওয়া সব ভুলে যায়।

প্রদীপের মনে হল গল্পই তো – যদি নিছক একটা গল্প হয়, তবে তো ভালই। উভয়ে কিছু না বলে সে বলল, ‘কোথায় কি শপিং করলে দেখাও।’ এরপর তারা কেনা জিনিস দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রদীপ চিন্তামুক্ত হয়ে সুমিতার সঙ্গে কেনাকাটার আলোচনা করতে লাগল। পরের দিন সে সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে গাড়ী নিয়ে এল।

এরপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। নিজের সংশয় মেটাতে একদিন প্রদীপ লক্ষ্মীর কাছে গিয়েছিল। এতদিন পর প্রথমটায় ওকে চিনতে না পারলেও পরে চিনেছে। চিনতে পেরে একটা গড় হয়ে প্রগাম করে বসতে বলেছে। তারপর বলেছে – বাবুকে সে তারপর অনেকদিন আশা করেছিল। বিশেষ করে সেদিন, যেদিন ও জানতে পেরেছিল ও মা হতে চলেছে। সত্যই বাবু তার কাঙ্ক্ষিত ধন দিতে পেরেছে।

সহদেব ভাল স্বামী হতে না পারলেও ভাল বাবা হতে পেরেছিল। বাসুদেব যেদিন জন্মায় সেদিন আহুদে আটখানা হয়ে ব্যরাকশুলু সবাইকে ডেকে মিষ্ঠি খাইয়েছে। হাইওয়ে হবার সময় দোকানটা উঠে যায়। ডিউটি ছাড়া বেশীরভাগ সময় ছেলেকে নিয়েই কাটাত সহদেব। ছেলের প্রতি ভালবাসা ও চিন্তা দেখে লক্ষ্মীর ওর প্রতি সমস্ত রাগ ক্ষেত্র অভিমান দূর হয়ে গিয়েছিল। সহদেবের ছেলে হয়েই ও বড় হতে লাগল। যখন পাঁচ বছর বয়েস, তখন আর্মির বড়সাহেবকে ধরে প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। সময় মত স্কুলে যাতায়াত করানো, বইপত্র কিনে দেওয়া, সবদিকেই নজর ছিল সহদেবের। ছেলে বড় হবার পর সহদেব মদ ছেড়ে দিয়েছিল। এ যেন এক নতুন মানুষকে দেখেছিল লক্ষ্মী। বাবুর কথা আর তার মনে পড়েনি। সব ভুলিয়ে দিয়েছিল সহদেব তার ব্যবহারে। বড় হবার পর বাসুদেবেরও বাবা অন্ত প্রাণ ছিল। যখন বাসুদেব স্কুল ফাইনাল পাশ করল, তখন লিভারের অসুখে সহদেব মারা যায়। আর্মির সাহেবের ধরে সহদেবের চাকরীটা পেয়েছিল লক্ষ্মী। তারপর বাসুদেব নিজের চেষ্টাতেই সব করেছে।

এতদিন পর বাবু কে পেয়ে সবকথা উজার করে দিল সে; কিন্তু এও বুঝিয়ে দিল যে বাসুদেব তারই দেওয়া আশীর্বাদ হলেও ওদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রদীপের কোন স্থান নেই। সহদেবের ছেলে হয়েই ও বেঁচে থাকবে। বয়েসের সাথে সাথে লক্ষ্মীর কথাবার্তার বলিষ্ঠতা প্রদীপকে অবাক করেছিল। প্রদীপ ফিরে এসেছিল, কিন্তু ফিরে এসেছিল একটা চরম তৃষ্ণি নিয়ে – এই তো তারই ছেলে – সেই ছেলেটা।

বেচারা

সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়

শান্তনুঃ

কথায় আছে স্বপ্নবিলাসী। তা সবাই বলে আমাদের বিলাস রায় ওরফে মন্টু এই খেতাব সহজেই অর্জন করতে পারে। ছোটোবেলায় হাফপ্যান্ট পরা অবস্থা থেকেই মন্টুকে দেখলেই আমরা বলতাম, ‘এই যে স্বপ্নবিলাসী এসে গেছেন।’ তা মন্টু ঠাট্টাতামাশা গায়ে মাখত না কোনোকালেই।

‘স্বপ্ন দেখা অত সোজা নয়, বুঝলি, স্বপ্ন দেখতে এলেম দরকার। আমি কী রকম টেকনিকালার স্বপ্ন দেখি তোরা জানিস! শুনলে তোরা হিংসায় কাঁচা পেয়ারা হয়ে যাবি। তোরা হাজার চেষ্টা করলেও আমার মতন স্বপ্ন দেখতে পারবি না, বুঝলি – অনুভূতি দরকার, বুঝলি, অনুভূতি – তোদের মতন কেঠো পাজীদের কম্ব নয়।’

‘কেন রে ব্যাটা! কী এমন স্বপ্ন দেখিস, যে আমরা দেখতে পারব না?’ রতন তো রেগে আগুন, ‘আর রঙিন স্বপ্ন দেখাটা কী এমন ব্যাপার, এই তো সেদিন আমি দেখলাম লাল সালোয়ার পরে পরী চলেছে রাস্তা...’

‘এই, এই, শুরু হল প্রেমাখ্যান... চুপ, চুপ কর বলছি!’ আমরা সবাই তেড়ে উঠলাম।

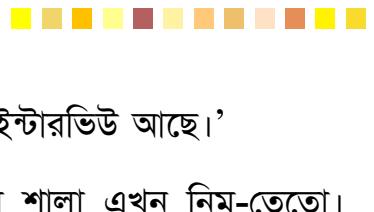
‘সত্যি, একে নিয়ে আর পারা যায় না, দেখ না দেখ পরীকে টেনে আনে। তুই ব্যাটা পরীর স্বপ্ন দেখার কে রে? তোকে পাত্তা দেয়? একবারও তোর দিকে ফিরে তাকায়? ফেকলু কোথাকার! পরীর স্বপ্ন দেখতে হলে বিমান দেখবে, পরীর সঙ্গে ওর হেভি ইয়ে, পরী এখান দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে কেমন তাকায় দেখেছিস বিমানের দিকে!’ ছটকু ফোড়ন কাটে।

বেটা বিমানের চামচা, আমাদের ভাল না লাগলেও কেউ কিছু বলি না। কী করে বলব – বিমানের চেহারাটা দেখলে গলা দিয়ে আর কথা বেরোয় না। এই লস্বা, ইয়া চওড়া বুক, একেবারে অরণ্যদেব; আমরা তো সব ছুঁচো ওর কাছে। আমাদের কি ইয়ে আছে শালা যে পরী বিমানকে ছেড়ে আমাদের দিকে তাকাবে?

মনে মনে বিমানকে পরীর সামনে এক চড়ে নর্দমায় ফেলে দিলাম। এ ছাড়া আর উপায় কী, আর কি-ই বা করতে পারি। পরী আমাদের পাড়ার সম্পদ। যেমন দেখতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলায়, একেবারে, সর্বগুণসম্পন্না যাকে বলে। পাড়ার সব জোয়ান ছেলেদের বুকে পরীর নামে ব্যাথা আছে। আমার ব্যাথাটা অনেক গভীর, অনেক বড় ক্ষত। এরা সে ব্যাথার কী বোঝে, এক-একটা গণ্ড। পরীর বাড়িতে একমাত্র আমার খাওয়া-আসা আছে, তাই এরা আমাকে অনেকটা সমীহ করে। পরীর ছোটোভাই এবার মাধ্যমিক দিচ্ছে, তাকে অক্ষটা পড়াই আমি। আমাদের মধ্যে, ছটকু তো পানওয়ালা, গো-মুখ্য, আর বিমান অর্ধশিক্ষিত, টাকাওয়ালা বাপের সুপুত্রু, ক্ষুলের দশক্ষুলাসের গণ্ডি পার হয়নি। রতন প্র্যাজুয়েট, কিন্তু ওর বাবার সোনার দোকানে বসে। আমি আর মন্টু একসঙ্গে আশুতোষ কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পাশ করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাইটে এম বি এ করেছি। গত ছ-মাস ধরে বেকার।

বিমানকে কিছু না বলার আরো কারণ আছে। ওর বাবা শালা প্রমোটার, অনেক কালো টাকায় পকেট সব সময় গরম। কারণে-অকারণে ধার দেয়, রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়ায়। এক্ষুণি দরাজ গলায় বলল, ‘চল, নবীনায় ম্যাটিনি শো-টা মেরে আসি।’ বিমান থাকলে আমরা কেউ পকেটে হাত দিই না। আজ আমার মুড নেই। বললাম,

‘না রে, তোরা যা, আমি আজ যেতে পারব না।’



‘কেন রে, তোর কী রাজকার্য আছে?’

‘তোরা তার কী বুঝবি রে, আকাট মুখ্যুর দল! আমার আজ একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে।’

বেশ গর্বের সঙ্গে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে আমি উল্টোদিকে হাঁটা দিলাম। মনটা শালা এখন নিম-তেতো। আমার তো সবই ছিল, শিক্ষা, পরিচয়, চেহারা – সবাই তো বলে আমাকে নাকি অনেকটা হাত্তিকের মতন দেখতে। চাকরিও পেতে চলেছি। তবে আমি শালা বিমানের থেকে কম কিসে? যদি না ভগবান মেরে না রাখত। শালার ভগবানের কি আর কোনো কাজ নেই, লোক বেছে বেছে বাঁশ দেওয়া। আমার ইন্টারভিউ দুপুর আড়াইটে। এখন বাজে দশটা চাল্লিশ, হাতে অনেক সময়। ঘুরে আসব নাকি কবিরাজের কাছ থেকে? শুনলাম, বেটার ছেলে ধন্বন্তরী, একটা ট্রাই নেব নাকি!

‘আরে, আরে, কে রে ধাক্কা মারছিস!’ চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, মন্টুটা দাঁত কেলাচ্ছে – হাঁফ নিয়ে বলল, ‘কোথায় ইন্টারভিউ রে তোর! কিছু বলিস নি তো আগে!’ আমি ভয়ানক মুখ করে বললাম, ‘যাচ্ছ একটা শুভ কাজে, দিলি তো বাধা শালা আহাম্মক। মারব পাছায় এক লাথি।’ মুখ কাঁচুমাচু করে মন্টু, ‘রাগ করছিস কেন রে। জানিস তো আমার বাড়ির অবস্থা। ছোট বোনটা শালা রোজ বিনুনি দুলিয়ে, ব্যাগ বুলিয়ে আপিস যাচ্ছে। প্রেস্টিজে আলকাতরা। তোর ছেটমামা তো ইনফোসিস’য়ে – একটু বলিস না আমার হয়ে। তুই না আমার হাফ-প্যান্টের ইয়ার! স্বপ্ন-টপ্প সব ছাইরঙা হয় গেছে রে, রং-টং সব মুছে যাচ্ছে।’ থালার মতন গোল মুখটাকে যথাসাধ্য করুণ করল।

আমি চোখ সরু করে দেখলাম ওকে। বটে, এই নাকি স্বপ্নবিলাসী। বেটাচ্ছেলে ছ-মাসেই টেকনিকালার থেকে সাদা-কালোতে নেমে এসেছে। জীবনে রঙ না থাকলে স্বপ্নে দেখে না যে, সে আবার স্বপ্নের, অনুভবের রেলা নেয়।

‘আমাকে দেখ, দ্যাখ শালা আমার দিকে তাকিয়ে। আমি স্বপ্নে পরীকে দেখেছি, শালা আমার বিছানায়। আমি পেরেছি রে, স্বপ্নে পেরেছি রে শুয়ার। ঘুমের থেকে উঠে তোদের মতন পায়জামা কাচতে দিতে হয় না রে আমায়, তবু আমি স্বপ্নে পেরেছি রে শালা।’

মন্টুর ঝুলে পড়া হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে একরকম আত্মপ্রাসাদে মনটা ভরে উঠল। বোৰো এখন, ভাব শালা, ডাঙ্গারের সঙ্গে পরামর্শ কর। আমার মতন ইয়েরা স্বপ্নে করতে পারে কিনা জেনে নে। আমি তো শালা বলেই খালাস। পিছন ফিরে না তাকিয়ে হনহনিয়ে বাস্ট্টপের দিকে চললাম। বাঁশদ্রোনীর মহুয়া সিনেমা হলের পিছনের গলিতে বাড়ি, সেখানেই রোগী দেখেন। যাই একবার লাক ট্রাই করে আসি।

মন্টুঃ

যাচ্ছলে। কিসের থেকে কী! এত রাগের কী আছে রে বাবা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার ছেটবেলাকার বন্ধু, কিছু আর জানতে আমার বাকি নেই ওর বিষয়ে। করুণা হল আমার, রাগ এল না। আমি জানি তো শান্তনুর ব্যাথাটা কোথায়। বেচারা, স্কুলের শেষের দিকে যখন আমাদের সকলের ঠোঁটের উপর হাঙ্কা গোঁফের রেখা উঠছে, শরীরের বিশেষ স্থানে বিশেষ আবেদন, গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা, শান্তনু কেমন যেন অন্য রকম। মেয়েদের শরীর নিয়ে আলোচনায় যোগ দেয় না, মনমরা মতন হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন আমি চেপে ধরলাম, ‘কী হয়েছে রে শান্তনু, এমন একা একা হয়ে ঘুরিস কেন? বাড়িতে কোন ঝামেলা হল নাকি আবার?’

শান্তনুর বাড়িতে নানা অশান্তি। ওরা চার ভাইবোন। ওদের বাবা ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন, কালীঘাট ক্লাবে খেলতেন। একটা প্র্যাকটিস ম্যাচে বুক দিয়ে বল আটকাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। অনেকদিন বিছানায় শোয়া ছিলেন, কোনরকম রোজগার নেই, সংসার চলে না। সেই সময় ওদের বাবার বন্ধু, শান্তনুর পল্লবকাকা, এসে ওদের সংসারের হাল ধরলেন। ওদের বাড়িতেই থাকতেন, ওদের মা'কে বৌদি বলে ডাকেন। ভাইবোনেদের মধ্যে শান্তনু সবথেকে বড়, তাই ওর অনেক কিছুই চোখে পড়ে যা বাকিরা বোঝে না। শান্তনু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল, ওদের মা আর পল্লবকাকার মধ্যে একটা অন্য রকম সম্পর্ক আছে, আর সেই নিয়ে বাবার সঙ্গে মার অনেক কথা কাটাকাটিও শুনতে হয়েছে তাকে রাত্রিবেলায়।

এখন আমার মনে হয়, হয়ত মাসীমার কিছু করার ছিল না। চারটে ছেলেমেয়ে, অসুস্থ স্বামী, সংসার চলবে কী করে? হয় ঝি-গিরি করতে হত নয় তো রাস্তায় নামতে হত, তার চেয়ে অনেক সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন মহিলা। কিন্তু এমন অপমানের জীবন মেসোমশাই বেশীদিন সহ্য করতে না পেরে একদিন গলায় দড়ি দিলেন। কিছুদিন পাড়ায় লোকেদের ফিসফাস, ছিছিকার, তারপর একদিন থেমে গেল, কিন্তু একটি সরল-সোজা কিশোর মনে একটা বিরাট ধাক্কা। সে সময় শান্তনু বছদিন আমাদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে। স্কুল-ফেরত আমাদের বাড়ি চলে আসত। ধীরে ধীরে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু কেমন যেন অন্তর্মুখী, তিক্ত আর অসহিষ্ণু।

‘আচ্ছা মন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কারুকে বলবি না তো?’

‘কী কথা রে?’

‘কেন রে ব্যাটা, কী কথা, না বললে প্রমিস করবি না?’

‘কী মুশকিল, এত চটে যাস কেন। এমনি জিজ্ঞাসা করলাম, না বলব না কারুকে, কী হয়েছে বল না।’

‘শোন, শুধু তোকে বলছি, আর কেউ জানে না, যদি কারুকে বলেছিস, তোকে কিন্তু গলা টিপে মেরে ফেলব বলে দিছি।’

এবার আমার ভয় এসে গেল। ‘কেন রে, তুই কি কোনো মার্ডার-টার্ডার প্ল্যান করেছিস নাকি! না ভাই আমাকে বলতে হবে না, তুই আর কারুকে বল বরঞ্চ। আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, ক্রিমিনাল নই। আমার ওপর আমার মা, বোন তাকিয়ে আছে, তুই আর কিছু বলিস না।’ ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ।

শান্তনু কেমন অবাক হয়ে আমার দিয়ে তাকিয়ে রইল। ‘তুই ভাবলি কী করে আমি কারুকে মার্ডার করতে পারি? যাঃ শালা, ভাগ এখান থেকে, তুই আমার বন্ধু হবার যোগ্যই নোস। ভিতুর ডিম কোথাকার, স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটিয়ে দে, জীবনের কঠিন সমস্যার কথা তোকে কি বলব, আমিই পাগল যে তোর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম।’

এবার আমি শান্তনুকে জড়িয়ে ধরলাম, ‘আমার ভুল হয়ে গেছে রে, আমাকে ক্ষমা করে দে। বল না। তুই তো জানিস তোর কোন কথা আমি কারুকে কোনদিনও বলিনি। বল, জানিস না?’

শান্তনু কেমন ভাবালু মুখে তাকিয়ে ছিল। এবার চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোর পুরুষাঙ্গ কি শক্ত হয়?’ প্রথমটা আমি ঠিক বুঝিনি, কিছুক্ষণ ওর দিয়ে তাকিয়ে থেকেও যখন দেখলাম শান্তনু মাটির থেকে চোখ তোলে না, হঠাৎ কথাটার অর্থ আমাকে যেন চাবুক মারল? ‘কেন রে, তোর বুঝি... মানে তুই কি...’ আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

‘হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে, আমি কোনদিন পারব না...’

আমি হতভস্ত ভাবটা কাটিয়ে বললাম, ‘না না তা কেন ভাবছিস! হয়ত তোর এখনো সময় হয়নি, মানে অনেকের তো পরেও হয়। তুই ডাক্তার দেখা না।’

কোন কথা না বলে শান্তনু ফিরে গেল। ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল – বেচারা!

এ বয়সে এসে আমার মাঝে মনে হয়, শান্তনুর গঙগোলটা হয়ত শারীরিক নয়, মানসিক। ছোটবেলা থেকে যে এত কিছু দেখেছে, এমন কি এক রাত্রে নাকি পল্লবকাকা আর মাসীমাকে একসঙ্গে এক বিছানাতেও দেখেছিল, সেই রাত্রির পরে পনেরো দিন বাড়ি ফেরেনি রাত্রি বেলায়। আমার মা-বাবা খুব ম্লেহ করতেন, কিছুটি জিঞ্জাসাও করেন নি, বাড়ি ফিরতেও বলেন নি। একদিন নিজে থেকেই বাড়ি ফিরেছিল। আমার খুব সন্দেহ হয়, অনেকবার ভেবেছি ওকে মানসিক ডাক্তার দেখাতে বলব, কিন্তু যা রাগী, বলতে সাহস হয় নি।

হাঁ, ‘বেচারা...’, আমি এখনও ওর অপস্যমান শরীরের দিকে তাকিয়ে এই কথাই ভাবছিলাম।

পরীঃ

শান্তনুদা কেমন ভালমানুষের মতন থাকে। দেখে মনে হয় ভাজা মাছটা উলটে থেতে জানে না। কিন্তু আমি জানি, সব ক'টা ছেলের মধ্যে সব চেয়ে চালু ছেলে। ভাইকে পড়াতে আসে যখন, কতবার যাই ঘরে, চানিয়ে, জলখাবার নিয়ে, মাঝে মাঝে আমার নিজের অক্ষটা দেখাবার ছল করে, মুখের দিকে তাকিয়েও দেখে না। লাজুক লাজুক মুখে টেবিলের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। কেন বাবা আমি, কি বাঘ না ভাল্লুক? নাকি আমাকে দেখতে খারাপ? রাগে গা আমার জ্বলে যায়। দেখ বাবা বিশামিত্র, তোমার ধ্যান আমি ভাঙবই। এ আমার প্রতিজ্ঞা। দীর্ঘশ... আমাকে উপেক্ষা!

ছটকুর পানের দোকানের সামনে আড়ডা মারা হচ্ছে। কী করে যে ওর মতন এমন শিক্ষিত, মার্জিত ছেলে বিমানের মতন একটা গুণ্ডার সঙ্গে আড়ডা মারে, কে জানে! বিমান তো আমাকে বিরক্ত করে মারল। বদমাশ কোথাকার। ওর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা যায়, শারীরিক হওয়া যায়, কিন্তু প্রেম – ম্যা গো! বাবার টাকা আছে, মনে করেছে সবাই কে টাকা দিয়ে কিনে নেবে। মন্টুদাকে ধরতে হবে, ওর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। মন্টুদারও যেন কেমন কেমন ভাব। ছোটবেলা থেকে দাদা বলে ডাকি, দাদার মতনই ভাবি, ওর বোন লাবনী যদিও আমার থেকে দু-বছরের বড়, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওর কাছেই শান্তনুদার সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। ওর জন্য আমার ভাবি কষ্ট হয়। কেমন দুঃখের জীবন। আমার ভীষণ ইচ্ছে করে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করি, ভালবাসি, ওর সব দুঃখ, সব কষ্ট ভাগ করে নিই। আমার শান্তনু। একদিন ওকে আমার করে ছাড়বই। আমার জেদ তো জানে না।

ঐ তো শান্তনু আসছে এদিকে, ডাকব নাকি? ‘ও শান্তনুদা, কোথায় যাচ্ছ?’ একবার তাকাও, এখানে তো আর আমাকে অস্বীকার করতে পারবে না বাবু, মনে মনে বলি।

ওর থতমত ভাব দেখে আমার ভীষণ মজা লাগছে।

‘এই তো, একটা ইন্টারভিউ আছে।’

‘কটার সময়?’

‘আড়াইটে।’

‘বাবা, সে তো অনেক সময় বাকি। চল না, চা খাবে? এস না প্লীজ। তোমার ইন্টারভিউ কোথায় গো?’



‘ক্যামাক স্ট্রীট।’

তাই নাকি? চল না আমরা জীবনকাকুর দোকানে চা-তেলেভাজা খেয়ে নিই। আমি সেই সকালে বেরিয়েছি, জানো! ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। এসো এসো।’

শান্তনুর হাতটা ধরে এগিয়ে গেলাম। বাপরে বাপ কি ঠাণ্ডা হাত। এই বয়সী ছেলের এমন ঠাণ্ডা হাত হয় নাকি?

আমাদের দেখে জীবনকাকু একটু অবাক হয়ে গেল।

‘কিরে, তোরা দুজনে? কী চাই?’

‘জীবনকাকু ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। শান্তনুদাকে আমি ধরে এনেছি, তাইকে পড়াতে গেছিল’, একটু মিথ্যে কথা বলতে হল, আড়চোখে দেখলাম শান্তনুকে, মুখটা কি একটু লাল? ‘বাড়িতে মা ছিল না, চা-পাতা শেষ। তাবলাম তোমার দোকানে চা খেয়ে যাই। এক প্লেট তেলেভাজাও দিও।’

আমি একত্রফা অনেক কথা বলে গেলাম। তিনি নিরন্তর একশেষ। চা তেলেভাজা শেষ, এবার কি করা। রাস্তায় নেমে একটু চাপা হেসে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘কী হল কী, এত চুপচাপ। আমি কি এতই খারাপ যে একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করে না?’ এবার দেখলাম পাথর গলেছে।

‘না না, তা কেন। কোনদিন তো এরকম কাছে আসো নি, তাই অবাক হয়ে গেছিলাম। তার উপর তুমি আবার বিমানের ইয়ে। বিমান রেগে গেলে আবার খুব মুশকিল কিনা।’

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। ‘কে বলেছে আমি বিমানের ইয়ে? কে বলেছে বল শীগগিরি!’

‘আরে আরে এত রাগ করছ কেন। ছটকুর দোকানে শুনলাম কিনা, তাই বললাম। না হলে তো ভাল।’

‘কেন, ভাল কেন?’ আমার হাসি পেয়ে গেল।

‘না মানে, গুণ্ডা মতন তো, তাই বলছি আর কি।’ আমতা আমতা করছে দেখে আমার কষ্ট হল বেশ। ‘ঠিক আছে। এবার থেকে কেউ এরকম বললে বলে দিও, একদম বাজে কথা। কি, বলবে তো?’

শান্তনু নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘ঠিক আছে।’

‘তোমার ইন্টারভিউ তো এখনও অনেক দেরী আছে, আমাদের বাড়ি চল না, একটা অঙ্ক এমন আটকে গেছে কিছুতেই পারছি না।’ শান্তনুর কোন আপত্তি না শুনে জোর করে নিয়ে এলাম বাড়ি। আমাদের পড়ার ঘরটা চিলেকোঠায়। সোজা উপরে নিয়ে গেলাম। উপরে উঠবার সময় দেখলাম মা রান্না ঘরে ব্যস্ত। বাবা তো অফিসে। ছোট ভাই স্কুলে।

ঘরে ঢুকে আমি শান্তনুকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম। ভয়ানক চমকে নিজে ছাড়িয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল, ‘কী করছ?’ ‘কী আবার, একটা মেয়ে আর একটা ছেলে যা করে তাই।’ বলেই আমি শান্তনুর মুখটা টেনে নামিয়ে আনলাম, মুখটা উঁচু করে একটা গভীর চুমু দিলাম ওকে, আমার হাতটা ধীরে ধীরে ওর জামার বোতামগুলো খুলে দিচ্ছিল।

লক্ষ্য করলাম, ওর শরীর ক্রমশ নরম হয়ে আসছে, একেবারেই বিমানের মতন নয়। এরকম অবস্থায় বিমানের নিম্নাঞ্চ শক্ত হয়ে আমার শরীরে আঘাত করতে থাকে। বিমানের হাত অঙ্গির হয়ে ওঠে আমার সারা শরীর জুড়ে। কিন্তু এ কী, শান্তনু কেমন নিস্তেজ, নির্বাক দাঁড়িয়ে। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেলাম। শান্তনুর মুখটা ফ্যাকাশে, নীলচে হয়ে গেছে। আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘কী হয়েছে শান্তনু! অন্য কারণকে ভালবাস?’



মাথা নাড়ল, ‘না, আমি... আমি পারি না...’

আমার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় রি রি করে উঠল। ‘ছিঃ! চলে যাও এখান থেকে, চলে যাও!’ দাঁতে দাঁত চেপে
উচ্চারণ করলাম।

কিছু না বলে মাথা নিচু করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। আমার বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর
দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে মনে বললাম, ‘বেচারা।’

চাঁদের হাট কিংবা গঙ্গাসাগর মেলা

শাশ্বতী ভট্টাচার্য

গ্রীষ্মকালের শেষ, আমেরিকার মধ্য-উত্তরাঞ্চলের ছোট শহর রিভারফলস্ এ শনিবারের সকাল। শান্ত নির্জন, সুন্দর। আর হবে নাই বা কেন? এই শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আছেটাই বা কি?

চায়ের ধূমায়িত কাপটা নিয়ে বাইরের ছোট বারান্দাটা গিয়ে বসি। বাবা আর ছেলে দুইজনেই ঘুমোচ্ছে, আমারই পোড়া চোখে ঘুম নেই!

দেখতে দেখতে বছরগুলো চলে গেল! কোলের ছেলেটা স্কুল পাশ করে, বিজনেস ম্যানেজমেন্টে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী করার জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছর বাড়ির বাইরে থাকলো, এখন আবার প্রোডাকশন ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে দূরে সেই কোন পশ্চিম বেলাভূমিতে চলে যাবে, সেই বিরতির মাঝের একটা সপ্তাহ বাপ-মায়ের কাছে এসেছে, বাড়িতে থাকবে। ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেবে ছুটিটা...

তাও ভালো, ওর বয়সী ছেলেরা বাড়িতে এসেই কফির আড়ায় চলে যায়, খক ঘরে ঢুকেই আমার রান্নাঘরের বাগান দেখতে চেয়েছে, সেখানে টমেটো, বেগুন, জুকিনি বেল পেপারের সমাহারে অভিভূত হয়েছে, প্রশংসা করেছে। খাবার ঘরে ঘুরে ঘুরে গল্প করেছে, ‘মা তুমি কি চুলে নতুন ছাঁট দিয়েছো? ভালো হয়েছে, ইয়াং দেখাচ্ছে।’ ওর বাপের তো এই সব দিকে কোন খেয়ালই নেই!

খকের শিশু মুখটা মনে পড়ে, আমি ছেলে চেয়েছিলাম, অভিজ্ঞ চেয়েছিল মেয়ে। খক ছোটবেলাতেই কি সেটা জানতে পেরে গিয়েছিল? পাঁচবছর বয়স থেকেই আমার সাথে ঘুরে ঘুরে বাজার দোকান করতে আর একটু বড়ো হয়ে বাপের সাথে কম্প্যুটারে ভিডিও খেলা দুদিকেই সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে ছেলেটা। নাঃ, মেয়ে না হওয়ার কোন দুঃখই আমার নেই।

কলেজে পড়াকালীন বাড়িতে এলে আমাদের মায়ে-পোয়েতে এই সকাল বেলার গল্পটা জমতো ভালো, আজকে ওকে ডাকতে গিয়েও থমকে গেছি – ‘মা, বড়ো কাজ নিছি, অনেক কাজের চাপ থাকবে, আবার যে কবে আসবো জানিনা, একটু বেশি বেলা অব্দি ঘুমোবো, কিছু মনে করো না যেন।’

ছেলেটা সেই ছোটবেলা থেকেই সংযত আত্মসংরূপ। কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে যে, কবে সেই একটুকরো বাচ্চাটা সংসার অরণ্যে নতুন একটা গাছ হবে? ফুলে ফলে ভরে উঠবে? ওর টুকটুকে লাল শাড়ি পরা বউ কি আমাকে ‘মা’, ‘মামি’, ‘মিসেস স্যানিয়াল’, নাকি স্বেফ ‘সুগতা’ বলেই ডাকবে? কোথা থেকে জমা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, একটা দীর্ঘল চোখের কুসুম-কোমল বউকে ওর সঙ্গে জুড়ে দিতে পারতাম যদি! সেই একা-একা থাকবে?

প্রেম? নাঃ, আমার ছেলে পথ এখনও সেই পথ মাড়ায় নি। পড়াশোনা, সাঁতার, দাবা, ম্যাথ-অলিম্পিয়াড, আর্টসির মাঝখানে ওর স্কুলের, কলেজের বান্ধবীদের সাথে আলাপ হয়েছে, খকের সাথে ওদের ভাব কোনদিন নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় নি। হঠাৎ হাসি পেয়ে যায়, হ্যালোউইনের দিনে ওর মেয়ে-বন্ধুদের সাথে রাজকন্যে সেজে সেই আটবছরের ছেলেটার সে কি আনন্দ! ওর কলেজ জীবনেও দেখেছি, ওর বয়সী অন্য ছেলেরা যখন ‘মাচো’ প্রতিযোগিতায় কে কত পুরুষালী সেই প্রদর্শনীতে ব্যস্ত, আমার ছেলে শান্ত, ধীর, সমাহিত। খকের আগুনে জ্বালা নেই, ওর মেয়েবন্ধুরা ওর সান্নিধ্যের উত্তাপে স্নিফ্টা আহরণ করে! দু-একটা ছেলেকেও বাড়িতে নিয়ে এসেছে খক, ওরাও যেন খকেরই মতো! নরম, দেখলে মমতার উদ্দেক হয়।

হাতে চায়ের কাপটা ঠাণ্ডা... শেষ চুমুক দিই। তবে কি কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে বউ আনতে হবে আমায়?

এটা কি একটা নালিশ? হাসি পেয়ে যায়, ছিঃ। ওর বয়সী অন্য ছেলেরা একের পর এক মেয়ে বন্ধু পরখ করছে, আমার ছেলে ‘মিস রাইট’ এর অপেক্ষায় আছে। হ্যাঁ, ঋক ওর বাপের মতো। আমিই তো অভিজ্ঞপের জীবনে প্রথম মেয়ে।

তবে? এটা মেনে নিতে অসুবিধে কোথায়? হ্যাঁ?

ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠে। পৃথা।

‘সাত সকালে কি মনে করে ভাই?’

‘বড়ো মুশকিলে পড়েছি, একটা উপকার দরকার।’ পৃথার সোজাসাপটা কথা। ‘অর্ক স্কুল পাশ করে কলেজে যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটির ডর্মে থাকতে চায়, ওর মেয়ে বন্ধুটিও এই এক জায়গায়, বাবা-মায়ের হোটেলের সুবিধতে ছেলের অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আমায় একগাদা জিনিস বয়ে মরতে হবে! ’

‘আহা চটছো কেন? কলেজে পড়তে যাওয়া মানে আরো একটু স্বাধীনতা, বোৰো না?’ ইউনিভার্সিটির ডর্মিটরি, প্রকারান্তরে দেশলাই বাস্তুর ছেট ছেট খুপরি সমৃদ্ধ বহুতল বাড়ি। কিন্তু যখন-তখন ফ্লাসের জন্য আদর্শ।

‘তোমার ভ্যান্টা দরকার... আসতে পারবে এখনই?’

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমার ভ্যান বলো কেন, ওটা তোমার-আমার-সবাকার, এই ছেট্ট জীবনে আমার-তোমার কোরো নাকো বন্ধু, এখনই আসছি।’ আমি চটপট জবাব দিই।

পৃথার বাড়ি আমার বাড়ি থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার পথ।

‘পিছনের দরজা নিয়ে জিনিসপত্র তুলতে হবে, সেই বুঁকে গাড়ি পার্ক কোরো, সুবিধে হবে,’ ফোন রাখার আওয়াজ পাই।

‘কিগো? সাতসকালে কার ফোন?’ চোখ কচলাতে কচলাতে অভিজ্ঞপ দেখা দেয়।

সম্প্রতি চোখে চশমা নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে ওকে দেখি। ঘুম থেকে উঠে এসেছে, এক হাতে গত রাত্রের জলের গেলাস, অন্য হাতে ভাঁজকরা স্লিপিং গাউন, এলোমেলো কাঁচা-পাকা-চুল। কপালের সামনে মাথাটা বেশ ফাঁকা হয়ে এসেছে, মেরেকেটে আর এক-আধটা দশেক! তারপরেই আমার শঙ্গের প্রশংস্ত কপাল দেখা দেবে!

মমতা জড়িয়ে বলি, ‘যাঃ, তোমার কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো তো! পৃথা ফোন করেছে।’

জীবনের পঁচিশটা বছর আমার সাথে কাটিয়ে অভিজ্ঞপ এখন আফশোস করে, ওর নাকি সারা জীবনটাই ভোগান্তি আর ব্যর্থতা। ‘তোমার সাথে দুনিয়ার লোকের পরিচয়! তা হঠাতে এতো সকালে?’

রাগ হয়, কর্তৃপ্রবর্তী সম্পরিমান উচ্চা আর অনুকম্পা মিশিয়ে বলি, ‘এমন কিছু সকাল নয় তো! প্রায় আটটা বাজে! বেচারী মুশকিলে পড়েছে....’

অভিজ্ঞপ মাথা চুলকায়, আহত স্বরে বলে ‘কাল বড় দেরী হলোনা ঘুমোতে?’

আমার যেন আর বয়স হয় নি! সারাজীবনই একটা ধেড়ে ছেলের ‘মা-গিরি’ করে গেলাম।

দাঁত খিচিয়ে বলি, ‘দেখো অসুবিধায় পড়েছে, ওর ছেলের জন্য বড়ো ভ্যান্টা চাই, বাড়ি থেকে ডর্মে যেতে হবে, আমি বেরোলাম।’ চাবির গোছা আর সেল ফোনটা ব্যাগের ভিতরে রাখি।

‘তুমি একা সামলাতে পারবে? মাল টানাটানির ব্যপার আছে! দাঁড়াও, অপেক্ষা করো, আমিও বেরোচ্ছি।’ দাঁত খিঁচানিতে অভিজ্ঞপও কম যায় না। নারী পৃথিবীর বোঝা বইবে, তাও আবার হয় নাকি? সক্ষমতার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞপ পুং-শ্রেষ্ঠত্বাদে বিশ্বাসী।

‘চলো, বলছো যখন... খুক তো ঘুমোচ্ছে, ও ওঠার আগেই আমরা ফেরত চলে আসবো।’ আমি নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিই, অভিজ্ঞপ আসবে বলে যে স্বন্তি পেলাম সেটা ওকে না জানালেও চলবে।

‘ঠিক আছে, আমি দুই মিনিটের মধ্যে কফিটা নিয়ে আসি, তুমি গুছিয়ে নাও,’ গ্যারাজ খোলার আওয়াজ পাই।

শনিবার, উইকেন্ড বলে কথা। বাড়ির ইন্স্ট্যান্ট নেস্কফিতে অভিজ্ঞপের নেশা মেটে না, তাই বাড়ি থেকে একমাইল দূরের দোকান ‘স্টারবাক্স’ থেকে মোকা-লাটে ওরফে গ্যারণ্জেরে মিষ্টি মেশানো কফি কেনার জন্য অভিজ্ঞপকে সময় দিতেই হয়। পরিমাণমতো ক্যাফিন এবং চিনির ডোজ না পড়লে কোনো ভদ্রলোকেরই ঘুম ভাঙ্গে না, এটা কে না জানে?

ও যতক্ষণ না ফেরে, গাড়িতে বাজানোর জন্য কয়েকটা গানের ক্যাসেট বেছে রাখি, খাকের জন্য জল-খাবার টেবিলের ওপর সাজাই, চার জোড়া প্লাভস, জিনিসপত্র বাঁধার জন্য মোটা দড়ি, মাল বইবার ট্রলি, ওয়াটার-কুলারে জল, গ্যারাজের সামনে গুছিয়ে রেখে বাইরে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করি। আধঘন্টা পরে বাবুর উদয় হয়।

‘কি করছো? তাড়াতাড়ি করো, উঠে এসো গাড়িতে’, জানলা থেকে মুখ গলিয়ে অভিজ্ঞপ আমাকে ডাকে।

নিজে আধঘন্টা বাদে এসে এখন আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলল? ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাত-ঘড়িতে সময় দেখি। আমি পুরোনো-পন্থী, এখনও হাতে ঘড়ি পরি বলে আমায় অনেক কথা শুনতে হয়! ‘পৃথিবীকে বলেছিলাম এখনি বেরোচ্ছি, একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে মনে হয়।’ যেন জোরে জোরে কথার মাধ্যমে ভাবছি।

‘এতো ব্যস্ত হয়ো না তো? যেমন একটা বিদ্যুটে ঘড়ি! পরেছো বলেই ঘন ঘন দেখতে হবে? ছুট করে বেরোলেই হলো? সব নিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে বেরোতে হবে তো! জানি কথা বাড়ালেই বাড়বে, একটা গান চালাই, সিটে মাথাটা এলিয়ে দিই।

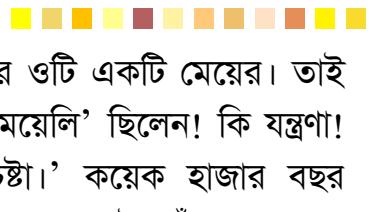
আজ বাড়ি ফিরে খাকের সাথে একটা ফয়সালা করতেই হবে, ওর যদি মনে মনে কারোকে ভালো লেগে থাকে আমাদের বনুক, তা না হলে কলকাতায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেয়ে খুঁজবো।

আমাদের বিয়েটাও তো ওই রকম করেই হয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপি, কোথায় গেল সেই সব দিনগুলো? আমাদের দুজনের সম্পর্ক এখন শুধু থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়।

‘কি গো ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?’ অভীরপের কথায় চমক ভাঙ্গে, ‘কাল চেক আর্কিওলজি থেকে উঠে আসা একটা খবর দেখে বড় বিরক্ত লেগেছে, রাতে ঘুম আসছিল না! সত্যি বিজ্ঞানীরদের যেন খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই। এইসব করে এই প্রজন্মের ছেলেপিলেদের মাথা খারাপ করছে’।

‘ওই ‘সম...দের’ নিয়ে তো.? এমনকি অভিজ্ঞপের কাছেও পুরো শব্দটা বলতে আমার বাধো বাধো ঠেকে। কিছু সংস্কার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে। ‘যা বলেছো!’

যাক, তবু এতক্ষণে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা করার মতো একটা বিষয়বস্তু পাওয়া গেছে! ‘আমিও পড়েছি খবরটা।’ কিছুদিন আগে খবরে বেরিয়েছিল। মাটি খুড়ে চেক আর্কিয়োলজিস্টরা একটা মমি পেয়েছেন। সন্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগেকার মমি। মজার জিনিস হলো, মমিটি একটি প্রকৃতিগত ভাবে ছেলের



হওয়া সত্ত্বেও তাকে কবরে শোয়ানো রয়েছে এমন কায়দায় যা দেখে মনে মতে পারে ওটি একটি মেয়ের। তাই থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করে নিয়েছেন, এই মমি-রূপ ছেলেটি একটু ‘বেশি মাত্রার মেয়েলি’ ছিলেন! কি যন্ত্রণা! ‘কিছু না, এই যুগের কিছু ছেলের ‘অস্বাভাবিকতা’কে ‘ন্যাচারাল’ দেখানোর চেষ্টা।’ কয়েক হাজার বছর আগেকার একটা পুরুষ মমিকে সমকামী বলে নির্দিষ্ট করে নিতে পারলেই এখনকার কয়েকটা এঁচোড়ে পাকা ছেলেপুলের অস্বাভাবিকতাকে মেনে নেওয়া যাবে? এই সব বাজে জিনিষে আমরা স্বামী-স্ত্রী বিশ্বাস করি না।

কফির কাজ শুরু হয়েছে, অভিরূপ উত্তেজিত স্বরে আমায় সর্মথন করে, ‘প্রমাণ হয়ে গেল প্রথিবীতে হাজার হাজার বছর আগেও ওইসব, কি বলে যেন? নপুংসক গে-লেসবিয়ান ছিল? কি? না, মমিটি বামদিক ফিরে শুয়ে, আর তার মুখ পশ্চিম দিকে তাকিয়ে, তাতেই এতো বড়ো একটা জিনিষ প্রমাণ হয়ে গেল?’

‘আহ! সকাল বেলায়, হাইওয়ে এর ওপরে, অত জোরে জোরে অঙ্গুলে শব্দগুলো না বললেও চলবে।’ আমি অভিরূপের শব্দনির্বাচনের প্রতিবাদ করি, ‘না, কিছু প্রমাণ হলো না! মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, ওই অত হাজার বছর আগে এই সব ছিলোই না, যত রাজ্যের আজগুবি!’ সারা জীবনের শিক্ষা তো একদল বৈজ্ঞানিকের মনগড়া একটা চিন্তায় নস্যাং দেওয়া যায় না! ভাগিয়স আমরা এই রকম, ‘স্বাভাবিক’ ‘ঠিক-ঠিক’। একটা হাত বাড়িয়ে অভিরূপের একটা হাত নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করি।

‘কি হলো কি তোমার? কফিটা আরেকটু হলে পড়তো! অভিরূপ বিরক্ত গলায় বলে।

‘ভুল হয়ে গেছে গো, দুঃখিত।’ আমি সরে বসি।

‘ভুলে যেও না সুগতা, নিজেদের মধ্যে হাসাহসি, খুনসুটি, বিনা কারণে পরস্পরকে ছেঁয়ার দিন চলে গেছে আমাদের।’

ছেলে বড়ো হয়েছে।

দূর থেকে দেখতে পাই, পৃথির বাড়ির সামনে একটা ছোটখাটো সংসার। মোরাম বিছানো রাস্তায় মাইক্রোওয়েভ ওভেন থেকে শুরু করে জুতো রাখার তাক। দুটো সুটকেস, তিনটে প্যাকিং বক্স, মায় একটা ছোট রেফ্রিজারেটারও রাস্তা আলো করে তৈরী হয়ে আছে। হোষ্টেলের ঘরে অর্কর যাতে কোন অসুবিধে যাতে না হয় ওর মায়ের সেই চেষ্টার কোন ঝটি নেই।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই অর্ককে আবিষ্কার করি। গাছের আড়ালে কানে একটা ছোট হেডফোন গুঁজে একটা বিরাট প্যাকিংবাস্টের ওপর বসে গানের তালে তালে পা ঠুকছে। হাতের ফোনে সন্তুষ্টঃ বান্ধবীর সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছে। পৃথি আমাদের শব্দ পেয়ে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ায়। ওর থমথমে মুখ আর গজগজ থেকে অনেক কিছু আন্দাজ করে নিতে পারি। ‘এই তোমাদের আসার সময় হলো? কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, আর একজনের তো বাড়িতে তো কোন কাজ নেই! ছাই ফেলার ভাঙ্গা কুলো আমি যখন আছি। আমাদের নিজেদের ভ্যান্টা আমাদের তো কাজে লাগে না!’

‘কি হল কি! তোমার সুপারস্টার বর কি করলো আবার?’ পৃথির বর সাম্পর্ককে একে মারাদোনার মতো দেখতে, তার ওপর ভালো ফুটবলে খেলে। শহরে হাই-স্কুল-পড়ুয়া ছেলেদের ফুটবল কোচ; বিনা পয়সার স্বেচ্ছাসেবক। প্রতি শনি-রবিবার সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত খেলা শেখায়, ছেলেদের হোমওয়ার্ক করতে সাহায্য করে, মাঝে মাঝে আবার সিনেমা, একজিবিশনেও নিয়ে যায়। আমাদের বাঙালি মহিলা-মহলে দু-একজন প্রকাশ্যেই পৃথির স্বামীভাগ্যে ঈর্ষান্বিত বোধ করে।

‘আমার কর্তাটিও দেখো না! ওর জন্যই তো দেরী হলো, সাম্পর্ক তবু তো....’

পৃথার কর্তৃপক্ষের এবার উঁচু পর্দায়, ‘তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না!’ তারপর অভিজ্ঞপের দিকে ফিরে তাকায় ‘আজকেই একটা ফাইনাল-গেম আছে, টিমের সাতটা ছেলেকে রাইড দিতে হয়েছে, কোচ না থাকলে দল গো-হারা হারবে, পৃথিবী রসাতলে চলে যাবে। জানো না?’

‘আ...রে, ঠিক আছে... চিন্তা কী? পড়শি আমি...আমরা সব আছি তাহলে কি করতে? এই বিদেশ বিভুঁইতে? হ্যাঁ?’ অভিজ্ঞপ ওর বিখ্যাত অমায়িক হাসি হাসে, অভয় প্রদানের মুদ্রায় ওর হাত ওপরে তোলা। ওকে হাসলে এখনও কি সুন্দর দেখায়, অথচ ঘরে বাইরে আমরা দুইজনে এখন শুধুই দুই পরম্পর বিরোধী দল।

‘সামুক একটা দারুণ ভালো কাজ করছে পৃথা,’ আমি পৃথার মনে রোমাঞ্চ জাগানোর চেষ্টা করি, ‘দেখো গিয়ে, কতো লোক সপ্তাহান্তে এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আলসেমি করে এখানে ওখানে কফি কিনতে বেরোয় এই শনিবার সকালে...’ ‘তুমি থামো। একসাথে সংসার করতে হলে বুঝতে, আমার জীবনটা ছারখার হয়ে গেল।’ পৃথা এই নিয়ে কোন আলোচনা চায় না।

চারতলা বিল্ডিংয়ের সামনের চতুরটা গিজগিজ করছে মানুষ। নানা আকৃতি, নানা প্রকৃতির মানুষ।

বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন রঙের, জীবনের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উঠে আসা নারী-পুরুষ। একেবারে মেলা বসে গেছে।

‘বাপরে! দেখেছো কান্দ! আমি অভিজ্ঞপকে ঠেলা দিই, ‘এ যে একেবারে চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছে!’

‘যত দিন বাড়ছে, লোক বাড়ছে... হবে না? আমাদের ছেলে ছোট শহরের কলেজে গেছে তাই জানো না, এমনিই হয়।’ অভিজ্ঞপের সহজ উত্তর, আমার কথাকে ও সচারাচর পাতা দেয় না।

‘গঙ্গাস্নানের মেলাও বলতে পারো, বিদ্যার্জনের ভিড়,’ পৃথা আমার কথায় সায় দেয়।

ছোট এলিভেটরে চার-পাঁচ জনের বেশি ধরে না, তারই মধ্যে একটা ছোট প্যাকিং বাস্তু, টিফানী ব্র্যাণ্ডের কায়দার ছোট টেবিল ল্যাম্প নিয়ে কোনরকমে ঘেঁষাঘেঁষি করে আমি একটু জায়গা করে নিই। অর্ক আর পৃথাকে ভিড়ের মধ্যে দেখি, কিন্তু ততক্ষণে এলিভেটর উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

অর্ক ঘর চারতলায়। ডানদিকের দেওয়ালের একেবারে শেষে। অসুবিধে হবে না।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে দু’ধারে লম্বা করিডর। করিডরের দুই পাশে ঘর, এক একটা ঘরে দুই জনের থাকার ব্যবস্থা। ঘরের গায়ে দুটো করে নাম টাঙানো।

এইখানেও ভিড়, জিনিষপত্রগুলো সাবধানে বার করে নিয়ে অর্ক ঘরের দিকে যেতে শুরু করি। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারি না।

ছোট করিডোরের মুখে দাঁড়িয়ে ঘরোয়া আলোচনায় ব্যস্ত ওয়াকার দম্পত্তি। ট্যাক্সি উপদেষ্টা ষাটোন্দ্র মিঃ জশুয়া ওয়াকার আঠেরো বছরের হোটেল-নাচিয়ে মরিয়মকে বিয়ে করে এই ছোট শহরে সাড়া ফেলেছিলেন। তখন ওনার আগের পক্ষের ছেলে বিলের বয়স চোদ। বড়োলোক পাড়ায়, বিরাট বাড়িতে থাকেন। ক্রিসমাসের সময় ওনার বাড়ির সামনে প্রদর্শনী দেখার জন্য অন্য শহর থেকে লোক আসে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের বাম হাতের অনামিকায় চোখে পরার মতো বড়ো হীরের আংটি। গলায় সোনার চেনে, রত্নখচিত ক্রুশে বিন্দু যিশুর্ধীষ্ঠের ছবি খোলানো।

বড়োলোকের ছেলে বিল, দামী প্রাইভেট কলেজে না গিয়ে এখানে কি করছে? আমার মনে হলো, আমাকে দেখতে পেয়েই যেন ডর্মের দেওয়ালে আর্টেমিসিয়ার ছবি ‘ম্যাডোনা আর শিশু’ না কি সালভাদর ডালির ‘দ্য ব্যাসকেট অফ ব্রেড’ সেই মধুর বির্তকের উৎসাহটা একটু বেড়ে গেল।

‘দুটোই থাকুক, কি এমন দাম? দশ বারো গ্রান্ড বই তো নয়?’

‘না না পাগল? কি যে বলো!’ মারীয়ম হাতের ছেট পশমের ব্যাগ দিয়ে স্বামীর পিঠে মারেন।

‘আপনাদের আলোচনায় একটু ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত, কিন্তু একটু পাশ পাওয়া যাবে কি?’ আমি প্রশ্ন করি।

‘নিচয়ই,’ মিসেস মরিয়ম মিহি গলায় জবাব দেন। আর্দ্র গলার স্বরে যোগ করেন, ‘এখনই আমরা চলে যাবো,’ তুলতুলে নরম ব্যাগ থেকে কাণ্ডে রুমাল বার করে চোখের নিচে ধরেন, ‘আর্ট সেন্টারে ‘ফ্যান্টম অফ দা অপেরা’র টিকিট কাটা আছে, প্রায় ছয়মাস আগে থেকে, বৰু অফিসের সিট...’ চোখের কোণা দিয়ে দেখি, মাথাতে দেড় ফুট লম্বা, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, ‘আর কিছু চাই তোমার? তোমাকে ভীষণ মিস করবো...’ ‘আমি ঠিক থাকবো!’ বিলের চাপা গলার উত্তর শুনি।

লম্বা করিডর ধরে হাঁটি। চিন্তা করি, অন্ততঃ দেড়ঘন্টা পরেও যদি আমাদের কাজ মিটিয়ে এখান থেকে বেরোতে পারি, পৃথাকে ওর বাড়ি পৌঁছিয়ে রিকের সঙ্গে শনিবারের কিছুটা সময় অন্ততঃ কাটাতে পারবো। অর্কর কথাও ভাবি, কলেজ পড়াকালীন প্রতি দিন তিনটে ঘর পেরিয়ে ওকে নিজের ঘরে ঢুকতে হবে।
বেশি দূর যেতে হয় না, একটা তীক্ষ্ণ মহিলাকঢে চমকে উঠি।

‘না রজার না, এখানে তুমি ধূমপান করতে পারো না!’ আওয়াজটার উৎস সন্ধানে তাকাই।

পরনে চাপা জিঙ্গ, কাঁধ ছাপানো খোলা চুল গাঢ় গোলাপী রঙে ছোপানো, গলায় কাঠের মালা, ডানদিকের ভ্র, ওপরের ঠোঁটে চকচকে স্টিলের দুল, গহনা-বিহীন হাতের দশটা আঙুলে বারোটা আংটি। ‘ভুলে যেও না রজার, এটা কলেজ ডর্ম, মদের বার নয়!’ মহিলা ভীষণ রেগে আছেন বোঝা যাচ্ছে। আমার হাঁটার গতি স্লথ হয়ে আসে।

‘আরে ছাড়ো তো! নিয়ম! কত্তো দেখলাম। হঃ!’ হাতকাটা গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে নীল-লাল-সবুজের বাহারে উল্কি দেখা যাচ্ছে। মোটা ক্যানভাসের প্যান্ট, কোমরের বেড় ছাড়িয়ে প্রায় হাঁটু অবধি চলে এসেছে, পায়ে পাতলা একটা চাটি, তাচ্ছিল্য ভরা পুরুষকঢের উত্তর। ‘কোন শালার বাপ বলেছে পারি না? শালা! পয়...শশশা দিচ্ছি না! এয় ছেঁড়া! ওই ভোগের স্নোক এলার্মের ওপর একটা তোয়ালে ফেলে দে তো! এই ব্যটা... ছঁকোমুখো? দাঁড়িয়ে আছিস কী?’

‘থামো বলছি! ভরদুপুরে মদ খেয়ে ছেলেকে কলেজে ভর্তি করতে এসেছে,’ মহিলা কঢ়ের পারদ আরো দু-খেপ উঠে আবার খাদে নেমে যায়, ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলেন, ‘সোনা ছেলে আমার, মুরগী-ভাজা গুলো সময় মতো খেয়ে নিও, সসটা একটু ঝাল আছে, কলেজ জীবন উপভোগ করো, আমি...আমরা চললাম।’

‘বাই টমাস! কথা জড়িয়ে যাচ্ছে রজারের।

‘টমাস না ইডিয়েট! ও ম্যাথিউ! দিবারাত্রি গিলে বসে আছে, শয়তান...’ ‘ঐ একই হলো...’ রজারের পা টলছে।

ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে ‘ছঁকো-মুখো সোনা ছেলে ম্যাথিউ’র মুখ দেখার চেষ্টা করি, অন্ততঃ পক্ষে একটা ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ তো পেলো ছেলেটা!

‘না, না! মাসি!’ ইংরাজী ভাষার কোলাহলের পটভূমিকায় পরিষ্কার বাংলায় অর্কের গলা ভেসে আসে, ‘একদম তাকিয়ো না, সোজা চলতে থাকো... সোজা...’

দু’টো বন্ধ ঘর। তালা লাগানো, একটা ঘর থেকে রেডিওর আওয়াজ। এদিক ওদিক তাকিয়ে হাতের জিনিস সামলে এগোতে থাকি।

‘আরে! মিসেস সানইয়াল নাকি?’ জুলিয়েটর মা ডেবি স্থির, একেবারে চোখের সামনে, আর একটু হলে ধাক্কা লাগতো।

জুলিয়েট ঝাকের সঙ্গে হাইস্কুলে পড়তো। জুলিয়েটের একটা ছোট ভাই আছে শুনেছিলাম।

‘হ্যাঁ, মানে, ওই একটু.....’ ঘাড় ঘুরিয়ে অর্ককে দেখাতে গিয়ে দেখি ও লোকজনের পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেছে। ‘জুলিয়েট ভালো তো?’

‘কে জানে মাগী কোথায়? আমি এখানে এসেছি আমার ছেলে ববের জন্য’, আনন্দের আতিশয্যে ডেবী আমাকে জড়িয়ে ধরে, ‘খুশির কথা আর কি বলি, বব ভীষণ ভালো রেজাল্ট করেছে সায়ান্সে। তোমার রিকি কেমন আছে? বড়ে ভালো ছেলেটা, সেই ছোটবেলা থেকেই কি ভদ্র, একটা মেয়ের মতো সহানুভূতিশীল, আবার একটা ছেলের মতো চৌকস, তুমি রত্নগৰ্ভা! ডেবী মুখ নামিয়ে আনে কানের পাশে, ‘আমার জুলিয়েটটা আমার তখনকার ছেলেবন্ধু স্টেফানের মতো বোকা ছিল! দুটোই ভেগেছে, তাকি সমেত প্রতিমা, তবে আমার ফিয়ান্সে রিচি, রিচার্ড, একেবারে অন্যরকম। দেবদৃত, দুইমাসের আলাপেই এনগেজমেন্ট সেরে নিয়েছি, এবার বিয়েটাও করে ফেলবো, কি বলো? এইমাত্র এখানে ছিল! ওদের দুজনের কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশ ডেবি আমার দিকে ফেরে, ‘কোথায় যে গেলো? তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম!’

‘থাক না এখন?’ চল্লিশ বছরের ডেবি দুজন প্রাণ্ড বয়স্ক ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন বিয়ে করতে চলেছে, সেই আনন্দে সামিল হই, ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, ‘পরে আলাপ হবে’। ভিড় কাটিয়ে পৃথা আর অভিরূপ এগিয়ে আসছে, দেখতে পেয়েছি।

অর্কের ঘরের বাইরে এসে থেমে যাই। ওর রুমমেট আগে থেকেই চলে এসেছে মনে হচ্ছে! আর এসেই নিজের দিকের ঘরের দেওয়াল সাজিয়ে ফেলেছে। ডর্মের চুনকালি-করা দেওয়ালে ক্রস লী’র একটা বিরাট পোস্টার, তার একপাশে ভারতীয় ‘প্রকৃতি-পুরুষ’ এর চাইনিজ সংক্ষরণ ‘যিন-ইয়াং’ প্রতীক। অর্ক বাইরে দাঁড়িয়ে, মুখ দেখে আন্দাজ করি, ঘরের সাজসজ্জায় একটু ঘাবড়ে গেছে, আমি হাসি, ‘আরে চিন্তার কি আছে? এক চিনাম্যান চাঁই চুই মালাই কা ভ্যাট...’ ওকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে এক বিরাট চমক খেয়ে চুপ করে যাই। চিন সম্পর্ক আরো কিছু লঘু মন্তব্য মাঝপথে গিলে ফেলতে বাধ্য হয়েছি... আঠারো-উনিশ বছরের এক ফুটফুটে বাঙালি ছেলে।

সাজানো দেওয়ালের একধারের বিছানার ওপর বসে, চোখ বন্ধ। দু’হাত ধ্যানের মুদ্রায় কোলের ওপর ফেলা। আমাদের দেখে ছেলেটি চোখ মেলে তাকায়, মিষ্টি হেসে আবার চোখ বন্ধ করে ধ্যানের মুদ্রায় ফিরে যায়। এবার আমার মুখ থেকে হইহই করে বাংলা-ইংরাজি মেশানো ক্ষমাপ্রার্থনা বেরিয়ে আসে, ‘সরি সরি, একেবারে ভুল হয়ে গেছে,’ তাড়াতাড়ি করে আবার বলি, ‘বেলা তো অনেক হলো, ক্ষিদে পায় নি তোমার?’ ছেলেটি আবার চোখ মেলে তাকায়, শান্ত স্থির দৃষ্টি, ক্রমান্বয়ে আমার দুটো প্রশ্নের উত্তর দেয়, ‘না, না, ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করিনি। না, আমার ক্ষিদে পায় নি।’

অভিরূপ কড়া চোখে তাকিয়ে আছে দেখে পরিস্থিতি সহজ করার চেষ্টায় বলি, ‘তোমার বাবা মা সব কোথায়? তোমার জিনিসপত্র কোথায়? তোমার নাম কি?’

ছেলেটা আবার মন্দু হাসে, বলে, ‘বাবা মা? বাবা..., মা...’ মাথা তুলে একটু ভেবে তারপর বলে, ‘সন্তুষ্টতঃ নিচে চা আনতে গেছে। আমার জিনিষপত্র এই তো, এই যে বই-খাতা-পেন, জামা জুতো সব তো এইখানেই, ওই র্যাকে, আর কী দরকার? আমি জয়ন্ত ওরফে জনি রিচার্ডসন টেইলার।’ ‘ও, ভালো কথা’।

অভিন্নপ আর পৃথাও এসে গেছে, আমরা সবাই মিলে লেগে পড়ি। সব ভারী জিনিসও এসে গেছে, এখন ঘরের নানা জায়গায় রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওবেল বসিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো চালু করতে হবে, আমি অর্কের দিকের বুক-শেলফে বই তুলি, গুছোতে থাকি। বই তো নয়! এক-একটা বড়ো বড়ো পাথর সব।

মাইক্রোওবেলের ঘড়িটা ঠিক করতে করতে বার বার আড়চোখে জনির দিকে তাকাই, কি সুন্দর ছেলেটা! ঘরের মধ্যে এতগুলো লোক, কোন তাপ উত্তাপ নেই! শুধু কয়েকটা বই, আর সামান্য কয়েকটা জামাকাপড় নিয়ে কলেজে পড়তে চলে এসেছে। আবার স্টান হয়ে বসে ধ্যান করছে। দুই বিপরীতের প্রতীকী যিন-ইয়াং টাঙ্গিয়েছে ঘরের দেওয়ালে। জনির মাকে দেখার কৌতুহল হয়। এখনো এলো না? কি রকম ‘মা’? আমার ছেলে যখন কলেজে গিয়েছিল আমরা এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিলাম। হঠাৎ ধরা পড়ে যাই। চোখাচোখি হতেই ও সন্মের সাথে চোখ নামায়, ওকে সহজ করার জন্য বলি, ‘তুমি বাঙালি নও তাহলে?’ অর্ক বাংলা বোৰে কিন্তু কথা বলতে চায় না সহজে, ওকে শুনিয়ে ছেলেটিকে বলি ‘বেশ তো বাংলা বলো তুমি.....’

ছেলেটি মাথা নাড়ে, ‘অনলাইনে এখন যে কোন ভাষা শেখা যায়, ভাবলাম মাত্তভাষাটা শিখে রাখা ভালো।’

‘তা আর বলতে? মাত্তভাষা? শেখার ইচ্ছা... অনলাইন...’ অনেক কয়টা প্রশ্নের তীর মনে ভিড় করে এসেছে, কিন্তু তার আগেই দুটি সুদর্শন সাদা চামড়ার আমেরিকান যুবককে ঘরের মুখে দেখে চুপ করে যাই।

‘হ্যালো হ্যালো, হেই....., দেখো! দেখো, লি’ল জনির রুমমেট এসে গেছে!’ রোদে পুড়ে গায়ের সাদা রঙ উজ্জ্বল তামাটে বর্ণ, মেদবিহীন লম্বা দোহারা চেহারা, পরিপাতি জামা প্যান্ট, ফেত্তি বাঁধা মাথার চুলে, পায়ে দৌড়োনোর জুতো, হাতে চায়ের কাপ। বয়স চল্লিশের বেশি না, সন্তুষ্টতঃ জনির বড়ো দাদার বন্ধু, বিশেষ একটা পাতা দিই না, ওর দায়িত্বজ্ঞানহীন ‘মা’টিকে দেখার কৌতুহলটা বেড়েই যাচ্ছে!

‘রনি-জেফ্রি!’ জয়ন্তকে এই প্রথম উত্তেজিত হতে শুনি, ও অর্ককে দেখায়, ‘এই যে আমার রুমমেট অর্ক। ও বাঙালি।’

‘বাঃ, দারুণ,’ ওরা দুইজনে পালা করে জয়ন্তকে আদর করে, গালে চুমু খায়। ‘ভালো হলো, এবার তুমি প্রাণ ভরে বাংলা বলতে পারবে।’

আমাদের কাজ প্রায় হয়ে গেছে, আমরা সবাই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াই, পরিচয় দিই, ‘সান্যাল দম্পতি, অর্কের পড়শি, ওর মা পৃথার সাথে এসেছি।’

জনি তাকায় আমাদের সবার দিকে, ছেলেদুটোকে দেখিয়ে ওর নরম গলায় বলে, ‘এ রোনাল্ড রিচার্ডসন আর গ্রি জেফ্রি টেইলার,’ তারপরে আমার দিকে ওর স্নিগ্ধ ধ্যান-গন্তীর চোখ তুলে বলে ‘আপনি তখন জানতে চেয়েছিলেন,’ তারপরে ইংরাজিতে যোগ দেয়, ‘এরাই আমার বাবা-মা।’

জনির কথা শেষ হতে না হতেই আমাদের সচকিত করে ছেলেদুটো সমন্বয়ে ‘ইপপি....’ বলে আনন্দের চিঢ়কার করে ওঠে। কোনোরকমে আমাদের বাড়ানো হাতে হাত ছুইয়ে পরিষ্কার বাংলায় ‘নমস্কার’ বলে ছেলেগুলো এইবার সমবেত ভাবে হোহো হাহা করে হেসে ওঠে।

‘বাবা-মা? বা...বা ...মা? ...লি’ল জনি? আমি মা, আমি মা কিন্তু, ... প্লীজ! আর আমাদের রনি? ও জনির বাবা। ঠিক তো?’ সঙ্গে সঙ্গে রনি প্রতিবাদ করে ওঠেছে, ‘কক্খনো! স্বপ্ন দেখছো! না, না জেফ তুমি বাবা, আমি মা, জনি ছোটবেলায় আমায় মা বলতো!’

‘তখন ও সবে একমাসের!’

‘তখন তোমার লম্বা চুল ছিল!’

‘তুমি রান্না ঘরে শিস দিয়ে গান করো!’

‘তুমি লাল রঙের সোয়েটার পরো!’

‘তুমি ট্রিমবোন বাজাও!’

ওরা একে ওপরকে নানা তুচ্ছ কারণ ধরে খ্যাপাতে থাকে আর নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে জোরে জোরে হাসতে থাকে। ওদের সঙ্গে হাসিতে জনি যোগ দেয়। যেন কি একটা ভীষণ মজার কথা বলা হয়েছে।

জনির উজ্জ্বল চোখে মুখ ভরা হাসি, জেফি আর রনির সমবেত আনন্দেছাস মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সেই গভীর মঙ্গলময় অনুভূতি আমায় আচম্ভ করে দেয়, আমি সেই ত্ত্বির আবেশে ভাসতে থাকি।

আর তখনি বিদ্যুৎচমকের মতো সেই আনন্দময় কুয়াশার মতো ভিতর থেকে আমার একমাত্র সন্তান ঝকের মুখ ভেসে ওঠে। আমি ঝককে, আমার সন্তান রিকিকে দেখতে পেয়েছি জেফি আর রনির অনাবিল স্বাভাবিকতায়।

এতক্ষণে ও ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়েছে, পরিপাটি করে বিছানা তুলে, নিখুঁত হাতে কফি ঢেলে, প্রাতঃরাশ খাচ্ছে। হাসিখুশী, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত।

আমি একদ্বিতীয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনের গভীরতম সুড়ঙ্গে, কঠিনতম সিন্দুকে লুকিয়ে রাখা অনেক গুলো কঠিন প্রশ্নের জবাব একটা উত্তরেই পেয়ে গিয়েছি। ঝকের শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, মুখোমুখি হয়েছি যেই প্রশ্নগুলির, এবং তার উত্তর জানতে পেরেও মানতে পারি নি, তাকে আজ চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। একটা কঠিন ভার নেমে যাচ্ছে আমার বুক থেকে।

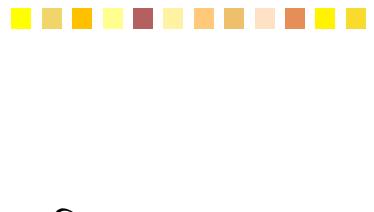
চমক ভাঙ্গে অভিজ্ঞপের কনুইয়ের একটা ছোট ধাক্কায়। ও ইশারায় বলে, ‘কাজ শেষ। চলো এবার।’

পৃথা নেমে গেছে, অভিজ্ঞ আবার ড্রাইভারের সিটে। দেড়ঘন্টার রাস্তা। সূর্য মধ্যগগনে, তবুও কি কারণে জানি না, চাঁদের স্লিপ আলোয় মনটা ভরে আছে। নিষ্ঠন্তা কাটিয়ে হঠাৎ অভিজ্ঞ বলে ওঠে, ‘ওরা বেশ আছে না?’

আমি চমকে উঠি, ‘কারা?’

‘ওই যে গো, ওরা, রোনাল্ড আর জেফি?’

আমি সম্মতির মাথা নাড়ি। ও যা ভাবছে আমিও এই মুহূর্ত হয়তো ঠিক তাই ভাবছি? অভিজ্ঞ হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ওর কোলে তুলে নেয়। ‘হ্যাঁ গো, যা বলেছো।’ আমার গায়ে শিহরণ জাগে, একটা চেনা অনুভূতি, আমি ওর পিঠে হাত রাখি। আমার হাতের ছোঁয়ায় ও কেঁপে ওঠে।



কোজাগরী

শ্বেতলা খাঁ ভাদুড়ী

লক্ষ্মী পূজা, সঠিক উচ্চারণে “লক্ষ্মী পূজা”, বা আমাদের বাঙালীদের সাধের “লোকখি পুজো”। করা বেশ সহজ, নিয়মের কড়াকড়ি কম, আর অনুষ্ঠানের দেখভালের জন্য পুরুত্বের খুব একটা প্রয়োজন নেই। এই বছর তাই লক্ষ্মী পুজোই ঠিক হল। আমার প্রথম “স্বাধীন” পুজো, বাড়ি থেকে দূরে। আর পতিদেব অনেক দিন ধরেই ছোঁকছোঁক করছিলেন লুটি, বেগুনভাজা, পায়েসের জন্যে, তাই নিজেই বেশ উৎসাহভরে “পুজোর বাজার” করে আনলেন মায়ামি-র উত্তর থেকে, পথঞ্চ কিলোমিটার ভ্রাইত করে।

ইতস্ততঃ এক পা, দুই পা করে পরিকল্পনা এগিয়ে চলল বাস্তবায়নের দিকে। কিভাবে শুরু করব? কি কি লাগবে? ধর্মেকর্মে আমার খুব একটা মতি কোনদিনই ছিলনা, তাই শশব্যস্তে ফোন করলাম মা আর মামী কে, তাঁরা তো আহ্বাদে আটখানা। কথোপকথন চলল –

“এই তো, কিছু না, খুড়ব সোজা। এইটা এইটা লাগবে...” (এক ডজন জিনিসপত্রের ফর্দ, আর তার সঙ্গে না পাওয়া গেলে বিকল্প ব্যবস্থার পরামর্শ)

“পথঞ্চস্য আছে? না না, পাঁচফোড়ন দিয়ে হবে না, শুধু চাল দিয়ে দিস। ডাব না পেলে যে কোন গোটা ফল ঘটে বসিয়ে দিস।”

“লাল গামছা নেই? একটা রুমাল দিয়ে ঘট ঢেকে দিবি... নতুন রুমাল আছে তো? পেপার ন্যাপকিন হলে... নাঃ, পেপার ন্যাপকিন-এ হবে না।”

“বেলপাতা-তুলসীপাতা পাওয়া যাচ্ছে না? মা লক্ষ্মী তো সবই জানেন, বলে দিস এখানে ওসব পাওয়া যায় না... না, রান্নার মশলা শুকনো তুলসীপাতা দেবার দরকার নেই।”

প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।

ফর্দ লিখে নিয়ে শুরু হল কাছে দূরে যাবতীয় ইন্ডিয়ান গ্রোসারী স্টোর-এর তত্ত্বতল্লাস। চন্দন – লাল আর সাদা – পাওয়া গেল। ছোট বোতলে গঙ্গাজল – তাও পাওয়া গেল। (“ওটা হরিদ্বার-ব্র্যান্ডের কলের জল” – পতিদেবের ফোড়ন) তামার ঘট, প্রদীপ, সলতে, নতুন কাপড়, নারকোল (“ছোলার ডাল হবে বুঝি?”), পান, সুপুরী, কর্পূর – পাওয়া গেল। পাঁচ রকমের ফল, পাঁচ রকমের তরকারী, ময়দা, সুজি, মিষ্টি – সবই মিলে গেল। জিন্ধ অক্সাইড পেলাম না। তাহলে আলপনার জন্য পোস্টার কালার-ই সই।

আবার মা-কে ফোন, এবার জিজ্ঞাস্য পুজোর প্রণালী আর ভোগ-নৈবেদ্যের খুঁটিনাটি। কিঞ্চিত অঙ্গুত্ব আলোচনা হল এইরকম –

মা – পথঞ্চদীপ, কর্পূর, ধূপ, জলশঙ্খ, ফুল, পাখা এই সব দিয়ে আরতি করবি।

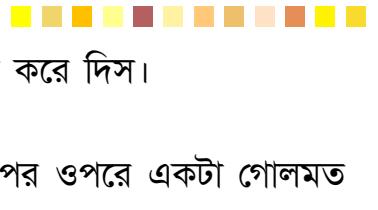
আমি – জলশঙ্খ নেই। পাখা নেই। এমনি শাঁখে একটু জল দিয়ে আরতি করে দেব, আর কাগজ দিয়ে পাখা বানিয়ে দেব, হ্যাঁ?

মা – ঠিক আছে। পাঁচালী আছে তো?

আমি – চিকি বলেছে আইপ্যাড-এ ডাউনলোড করে দেবে।

মা – ঠিক আছে, নিবেদন করে নিস।

আমি – আইপ্যাড-টা নিবেদন করে দেব?



মা – না না, ওই ভোগ ফল প্রসাদ এই সবে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিবেদন করে দিস।

আমি – আচ্ছা, ঘটে কি যেন একটা আঁকতে হয়?

মা – হ্যাঁ, কাঠি কাঠি হাত পা-ওলা মানুষ – প্রথমে একটা প্লাস আঁক, তারপর ওপরে একটা গোলমত মুখ, হাত পা গুলো এক্সটেন্ড করে ল্যাটারালি...

আমি – ল্যাটারাল আবার কি? বাইরের দিকে করব তো?

মা – ল্যাটারাল মিডিয়াল বুর্বিস না? মিডিয়াল মানে শরীরের মধ্যাংশের দিকে, ল্যাটারাল মানে...

আমি – না ওসব ডাক্তারী ব্যাপার – পুজোর মধ্যে ল্যাটারাল-মিডিয়াল হিজিবিজি... ধুন্তেরি। হাত পা গুলো টেনে টেনে বাইরের দিকে বার করে দেব, এই তো?

মা – হ্যাঁ, আর প্রোপোর্শন-গুলো ঠিক রাখিস, মানে গলা পেট হাত পা...

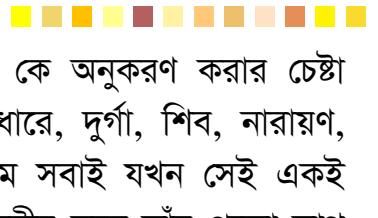
আমি – ওফফ মা! আচ্ছা আমি রাখছি এখন।

পুজোর দিন সকাল। ঘটের জন্য মালা, যাতে শুকিয়ে না যায় তাই গেঁথে গুছিয়ে ত্রীজ-এ রাখা। নৈবেদ্যের জন্যে গোবিন্দভোগ চাল ভিজনো। পায়েস তৈরী। ভোগ-এর সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা চিকি রাঁধবে বলে, সে সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছোচ্ছে। মনে মনে একটু গজগজ করলাম নাড়ু, মুড়কি আর দই-এর অভাবের জন্য। এইসব উত্তেজনার মধ্যে প্রায় ভুলেই গেছিলাম যে আপিস-কাছারী, মিটিং ইত্যাদি জাগতিক ব্যাপারস্যাপারও আছে, নজর দেবার জন্য। কিন্তু কাজ মোটামুটি সাবাড় হয়ে গেল দুপুরের মধ্যে – খুব সন্তুষ্ট দৈবী হস্তক্ষেপে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুপুরবেলা। বাড়ির আশেপাশে চক্র কাটতে গেলাম, যদি একটা সার্বজনীন আমগাছ পাওয়া যায়। এখানে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সামনের জমিতেই বিভিন্ন আমগাছ আছে, কিন্তু আমি খুঁজছি এমন একটা (১) যার কয়েকটা ডালপালা আছে হাতের কাছে (২) যেটা একটু লোকচক্ষুর অন্তরালে। *Et voilà!* বাড়ি ফিরলাম মহার্ঘ সপ্তপর্ণী আমের ডাল নিয়ে; কিছু কলাপাতা, জুঁই আর জবাও পাওয়া গেল আশেপাশের অচেনা প্রতিবেশীর বাগানে। বেশ একটা বারোয়ারি-বারোয়ারি ব্যাপার – আমি প্রসন্নচিত্তে বাড়ি পৌঁছালাম।

সন্ধ্যেবেলা। বসবাব ঘরের আসবাব পত্র ঠেলে ঠুলে পুজোর জায়গা হলো। ছোট ঝপোর ‘লক্ষ্মী ঠাকুর’-এর মূর্তি তেপায়া টেবিল-এর ওপরে সাজনো, জবা আর জুই দিয়ে। সামনে প্রদীপ আর ধূপকাঠি জ্বালানোর জন্য তৈরী। ছোট ছোট কলাপাতার টুকরোর ওপরে সমস্ত উপচার – পঞ্চদীপ, শাঁখ, চন্দন, সিঁদুর, একটা ছোট লালপাথরের বোতলে গঙ্গাজল, কর্পুর, আর ঘট। পোস্টার কালার দিয়ে একটু আলপনা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু খুব একটা দাঁড়াল না দেখে নতুন জোগাড় করা হামানদিস্তায় একটু চাল বাটলাম, অল্প জল দিয়ে লেই বানিয়ে তাই দিয়ে আবার আলপনা আঁকা হল – এবার অনেক সুন্দর হল। নিজেই বাঃ বলে নিলাম একটু।

পতিদেব চিকি-কে নিয়ে এলেন এয়ারপোর্ট থেকে। বসার ঘরের আমূল পরিবর্তন আর একটা “পুজো পুজো গন্ধ” – তাতে আমি চমৎকৃত, বেশ গদগদ হয়ে পড়লাম। রান্না, কাটাকুটি, ভাজাভুজি শেষে চিকি আর আমি শাড়ি পড়ে নিলাম, পুজো শুরু হল রাত্রি এগারোটা নাগাদ। বার্মুডার ওপরে একটা পাঞ্জাবী চাপিয়ে আর ভোগের থালায় হাত মেরে পতিদেব আয়োজনে যোগদান করলেন। “মনোজদের অঙ্গুত বাড়ি”র কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছিল।



পূর্ণিমা। আসনে বসে আমাদের বাড়ির আসল পুরুত ঠাকুরণ – মামী – কে অনুকরণ করার চেষ্টা করছি; সমস্ত নৈবেদ্যতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে যা যা মন্ত্র মনে ছিল পড়ে গেলাম একধারে, দুর্গা, শিব, নারায়ণ, কালী, চন্দ্রী, সরস্বতী আর অবশ্যই, লক্ষ্মী – সবাইকেই ডেকে ফেললাম। ভাবলাম সবাই যখন সেই একই সুখী পরিবারের সদস্য, তখন মা লক্ষ্মী নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে তাঁর পুজো ভাগ করে নিতে। এর পরে তাম্রনির্মিত ঘটের গায়ে সুন্দর কাঠি-চিরি, ওপরে আমপাতা, নারকোল আর লাল কাপড়, তাতে চাপান প্রায়-জমে বরফ মালা। এবার আইপ্যাড-মারফত পাঁচালী পঠন, আশাতিরিঙ্গি সুষ্ঠুভাবেই হয়ে গেল। সবশেষে বিনা-পাখাতেই আরতি, পুস্পাঞ্জলি – ব্যাস, পুজো শেষ।

মাথাটা অঙ্গুত্তরকম হাঙ্কা লাগছিল, মনে পড়ল সারাদিন দাঁতে কিছু কাটা হয়নি। সেরকমই হওয়া উচিত অবশ্য।

এবার খাওয়ার পালা, তার সঙ্গে প্রসাদ আর ভোগ সেবন। চাঁদ ততক্ষণে আদ্বৈক আকাশ পার করে ফেলেছে। প্রারম্ভ কর্মের সুচারু সমাধানে যুগপৎ উল্লিঙ্গিত এবং অবসন্ন আমরা এবার শয্যাভিমুখে, যদিও তার আগে চকিতে ফেস্বুক-এ ছবি আপলোড হয়ে গেল, আর মা-কে ফোন-এ রিপোর্ট করে দিলাম আমার প্রথম পুজোর সাফল্যের বার্তা।

বহুপরে, এক নিঃশব্দ চিন্তনের মৃহুর্তে, একটা চিন্তা – যেটা দানা বাঁধছিল অনেকক্ষণ ধরে – আত্মপ্রকাশ করল স্বনির্তিতে। বুঝতে পারলাম, আমি এই পুজোটা ধর্মীয় আতিশয়ে করিনি, অথবা মা লক্ষ্মীর কৃপালাভের আর্তচিন্তায়ও নয়। (ঘটনা হল, কোন অনিদিষ্ট কারণে আমি বরাবরই মা সরস্বতীকে অনেক বেশী কাছের বলে মনে করেছি।)

তো কেন করলাম? একেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ এবং স্বার্থের কারণে – আমার ছোট মায়ামি-র বাড়িকে ওই পিঁচে, রাজা বসন্ত রায় রোড-এর একটা অংশে পরিণত করতে। ছোটবেলার সূতিগুলোর সঙ্গে আবার সংযোগস্থাপন করতে, চন্দনকাঠ, ধূপ আর হোম-এর আগুনের চিরপরিচিত রূপকে ফিরে পেতে। মন্ত্রপাঠের অচঞ্চল স্বর, শঙ্খধ্বনির সুরেলা আওয়াজ; তেলের প্রদীপের স্তম্ভিত আলো; সবুজ পাতার ওপরে রঞ্জিন ফুলের অসাধারণ নকশা; ঘি-কর্পুর-চন্দন-অগুরুর সুবাস। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে একাত্মবোধের বাসনাপূরণ। এবং আবার করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার অবর্ণনীয় অনুভূতি।

এবং আমাদের ‘‘তিনতলার ঠাকুরঘর’’ সাতসমুদ্র পার করে এসে তার আলিঙ্গনে আমাদের ঘিরে ধরল।
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিং।

আমরা সেই আশীর্বাদধন্য।

তিলোত্তমা

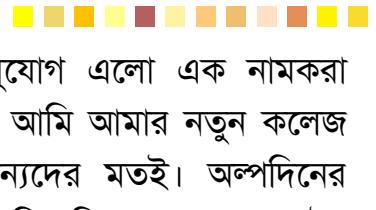
সুব্রত মজুমদার

মনে আছে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলাম যখন আমি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে চুকেছিলাম। কোলকাতার আশেপাশের কোন একটা ছোট জায়গা থেকে এসেছিল। মনে আছে এই কারণে নয় যে মেয়েটি ডাকসাইটে সুন্দরী বা অসাধারণ ভালো পড়াশুনায় ছিল বলে। বরঞ্চ উল্টোটাই বলা যেতে পারে। মেয়েটির চেহারার মধ্যে ছেলেদের আকর্ষণ করার মত বা মেয়েদের হিংসে করার মত কিছু ছিল না। সাধারণ সাজপোষাক পরে সাধারণ চেহারাটাকে আরও সাধারণ করে রাখত। মাথার চুলকে টেনে বেঁধে একটা বড় খোঁপা আর সাদা পোষাকেই সবসময়ে দেখতাম তাকে। কপালে দিত না টিপ ঠোঁটে মাখত না কোন রঙ। আমাদের ক্লাসে মেয়েদের সংখ্যা ছিল এগারো, ওই মেয়েটি আসার পর হল বারো। আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতাম দ্যা ডার্টি ডাজন্স। আমরা লক্ষ্য করলাম যে মেয়েটি কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজের মনে চুপচাপ উদাস হয়ে বসে থাকে। জোর করে প্রশ্ন করলে শুধু ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলে উত্তর দেয়। কথা বাড়াবার কোনরকম চেষ্টা করেনা। ওকে আমরা হাসতেও কখনো দেখিনি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেচে আলাপ করতে গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটির ঠান্ডা বরফের মত স্বভাবের জন্য বেশি দুর এগোতে পারেনি। অবশেষে সবাই একসময়ে আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। মেয়েরা বলত ওর নাকি ভীষণ দেমাক, আমরা ছেলেরা সেকথা মানতাম না। মেয়েটির নাম জেনেছিলাম আশা। আমরা অনেক রকম নাম দিয়েছিলাম মেয়েটির। কেউ বলত যোগিনী, কেউ বলত সরস্বতী ঠাকুর, আবার কেউ কেউ ডাকত মাস্টারনী বলে। মেয়েটির ডানদিকের গালের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা ছোট কালো রঙ-এর তিল। আমি মেয়েটির নাম দিয়েছিলাম তিলোত্তমা।

খবরটা প্রথম এনেছিল অনন্যা। ওর এক আত্মীয়ের সঙ্গে নাকি আশার বাড়ির লোকেদের চেনাশোনা আছে। ওনারা আশাকে ছোট থেকে বড় হতে থেকে দেখেছেন। ছোটবেলার থেকে আশা নাকি খুব হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে। চেহারাতেও একটা লালিত্য ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে সব কিছু উলটপালট হয়ে গিয়েছিল আশার জীবনে। জেনেছিলাম আশার বয়স উনিশ। বিয়ে হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে। বরের বয়স ছিল আশার থেকে অনেকটা বেশি। উপায় ছিল না। একে অভাবের সংসার, তারপর দেখতে ভালো না, রং ময়লা, বিয়ে হচ্ছিল না। বাবা আর মা অনেক ধার দেনা, অনেক পণের বিনিময়ে জামাইকে কিনেছিলেন। কিন্তু সুখ আশার কপালে লেখা ছিল না। বিয়ের প্রথম সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই আশার বর মারা যায় মোটর সাইকেল একসিডেন্টে। শুশুরবাড়ির লোকেরা আশাকে দোষ দেয় তাদের ছেলের মৃত্যুর জন্য। অপয়া আর রাক্ষুসী বলে তাকে অপবাদ দেয়। অনেক কানাকাটি অনেক হাতেপায়ে ধরাধরি করেছিল আশা শুশুরবাড়ির লোকজনের কাছে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু কোন কাজ হল না। অবশেষে একদিন শুশুরবাড়ির লোকেরা আশাকে তার বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে গেল। অসহায় বাবা মা আর কি করবে, মেয়েকে তো আর ফেলে দিতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আশাকে তাঁরা আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। জীবনের ওপর বিত্তঘায় আশা একবার আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সময়মত ধরা পড়ে যাওয়ায় বেঁচে যায়। অবশেষে এক কাকিমার প্রশংস্যে আশা ঠিক করে ও পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কাকিমাই সব খরচা বহন করার ব্যবস্থা করেন। সব শোনার পর আশার ওপর আমাদের মন দৃঢ় আর সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। আমার সব বন্ধুরাই কোন না কোন ভাবে আশাকে তার অজান্তে সাহায্য করার চেষ্টা করত। কেন জানিনা আমি আশাকে কোন সাহায্য করিনি, উলটে আমি তার সঙ্গে ভয়ানক এক খেলায় মেতে উঠেছিলাম কাউকে না জানিয়ে।

আমি আশাকে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করলাম। না খামের ভিতরে পোরা, সুন্দর রঙিন কাগজে লেখা স্ট্যাম্প আটকানো চিঠি নয়। খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া ছোট চিরকুটে লেখা প্রেমপত্র। আমি শুধু তিনটে কথা লিখতাম চিরকুটে – ‘আমি তোমায় ভালবাসি’। তক্ষে তক্ষে থাকতাম এবং সুযোগ পেলেই সবার অজান্তে আমার লেখা চিরকুটটা আশার বইয়ের দুটো পাতার মাঝখানে গুঁজে দিতাম। তারপর অনামি এক লেখকের চিরকুটে লেখা ওই তিনটি কথা পড়ে আশার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আদিঅনন্তকাল ধরে চলে আসা প্রথিবী বিখ্যাত এই তিনটি কথায় ঘায়ল হয়নি এমন মানুষ দুনিয়ায় কোথাও আছে কি না আমার জানা ছিল না। প্রথম চিঠিটা লেখার পর প্রায় তিনদিন উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করার পরেও আশার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। ধরে নিলাম যে তার মানে হয় আশা বইটার ভিতরে রাখা চিরকুটটা দেখার সুযোগ পায়নি অথবা আশা মানুষ নয়। আমিও হেরে গিয়ে হল ছেঁড়ে দেবার পাত্র নয়। একদিন সুযোগ বুঁবো আবার একটা চিরকুট রেখে দিলাম দুটো পাতার মাঝখানে। প্রফেসর ক্লাসে আসার আগে আমরা ছেলেরা আর মেয়েরা নানারকম হাসি আর ঠাট্টায় মসগুল হয়ে থাকতাম। আর উনি ক্লাসে প্রবেশ করার সাথে সাথে সব বন্ধ হয়ে যেত। আশা কোনদিন আমাদের এই হাসিঠাটায় যোগ দিত না। একটা বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকত। আজ আমি শুধু আশাকে লক্ষ্য করছিলাম। আজ যেন আশাকে একটু অন্যমনক্ষ লাগছে। মনের ভুল কিনা জানিনা, একটা পরিবর্তনও আশার মধ্যে মনে হল লক্ষ্য করলাম। সবসময়ে প্রথম সারির বেঞ্চে বসা আশাকে এর আগে কখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের সারিতে বসা ছেলেদের দিকে তাকাতে দেখিনি। আজ দুবার দেখলাম আশা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাল। একবার তো প্রায় আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। আমার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠেছিল। ধরা পড়ে গেলাম নাকি? না দেখলাম ঘাড়টা ঘুরিয়ে আশা আবার সামনের দিকে ফিরে মাথা নিচু করে বসে পড়ল। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। কোন ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রফেসরকে প্রশ্ন করলে আশা আজকাল মাথা ঘুরিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আশা যেন একটা কিছু খুঁজছে ওর চোখ দেখে আমি বুঝতে পারতাম।

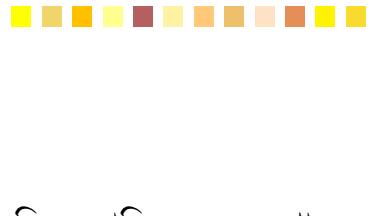
আমার খেলা চলতে লাগল। আমার চিরকুটে লেখা কথার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল আর সেই সঙ্গে পরিবর্তন হতে সুরু করল আশার ব্যবহারের। আশা আজকাল অন্যদের সঙ্গে কথা বলে, পিছন ফিরে ছেলেদের দিকে তাকায়। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায় না, ঠাট্টা ইয়ার্কিংতেও যোগদান করে। আমার কেন যেন মনে হত আশার চোখদুটো সবসময় কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়। আমি যত আশার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখতাম ততো মনে মনে খুশি হতাম। একবার একটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হল। চিরকুটে লিখলাম তোমায় হাঙ্কা নীল রঙ-এর শাড়ী আর খোলা এলোচুলে দেখতে চাই। পরের দিন ক্লাসে ঢুকে আশাকে দেখলাম না। লাস্ট বেঞ্চে বসে আগের দিনের হোমওয়ার্কটা তন্ময় হয়ে চেক্ করছিলাম শেষ বাবের মত, জমা দেওয়ার আগে। অর্গের কনুইয়ের ধাক্কায় চমক ভাঙল। অর্গব আঙ্গুল দিয়ে সামনের দিকে তাকাতে বলল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক অদ্ভুত ব্যাপার। যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ক্লাসের সব ছেলেরা আর মেয়েরা অবাক হয়ে তাদের সামনে দাঁড়ানো আশার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে বলে আশার সারা মুখে একটা লজ্জা মেশানো সুন্দর হাসি। সব থেকে অবাক হলাম আমি। আশার পরনে আজ হাঙ্কা নীল রঙের শাড়ী আর চুলটা খোলা। কপালে পরেছে একটা বড় টিপ আর ঠোঁটে লাগিয়েছে একটা হাঙ্কা রং। আশাকে আজ সত্যি সুন্দর লাগছে দেখতে। মেয়েটা এত সুন্দর দেখতে আগে কখনো লক্ষ্য করিনি তো।



তাগ্যের চক্র কাকে কখন কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না। আমার সুযোগ এলো এক নামকরা কলেজে এজিনীয়ারিং পড়তে যাওয়ার। একদিন সবাইকার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার নতুন কলেজে জীবনের জন্য যাত্রা শুরু করলাম। আশার কাছ থেকেও বিদায় নিয়েছিলাম অন্যদের মতই। অল্পদিনের আলাপে আলাদা করে আমাকে মনে রাখার কথা নয় আশার। আমাকে বিদায় জানিয়েছিল অন্যদের মতই। তাতে আন্তরিকতা হয়ত ছিল, ছিল না কোনরকম ঘনিষ্ঠতা। আমি শুধু মনে মনে বলেছিলাম তিলোত্তমা তুমি ভালো থেকো, তোমার ভালো হোক। তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে। আমার জীবনে এসেছে অনেক পরিবর্তন। আমি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেছি। এখানে সাজানো অথচ একটি ছেউ নির্জন শহরে আমার বসবাস। এখানে আমার নিজের বলে কেউ নেই। একাকী নিঃসঙ্গতায় আমার জীবন কাটে। প্রায় দুটো যুগ কেটে গেছে দেশ ছেড়ে এসেছি। ফেলে আসা দেশের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। যখন মন খারাপ লাগে তখন মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে স্পঞ্জের মত ভিজিয়ে নিয়ে আসি যতটা পারি দেশের সব কিছুকে নিজের দেহে আর মনে। একবার দেশে যাওয়ার একটা সুযোগ এলো যখন আমন্ত্রণ পেলাম আমার এক নিকট আত্মীয়ের বড় মেয়ের বিয়েতে আসার জন্য। অনেক দিন দেশের কোন বিয়ে বাড়ি আমার যাওয়া হয়নি, তাই সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না।

দেখলাম বিয়ের ব্যাপারে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে আবার অনেক কিছু একই রকম আছে। আমার ওপর ভার পড়েছিল ছেলের বাড়ির লোকদের আদর আপ্যায়নের যেন ক্রটি না হয় তার খোঁজখবর রাখার জন্য। দেখলাম ছেলের বাড়ির লোকজন খুবই ভদ্র, তাঁরা অল্পেই খুশী, তাই আমার কাজ অনেক কম মনে হচ্ছিল। হঠাৎ ছেলের বাড়ির একজন আমাকে দেখে এগিয়ে এল। আমার নাম ধরে ডাকল। আমি চিনতে পারলাম। আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু অর্ণব। দুই বন্ধু ফিরে গেলাম অনেক বছর আগের সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে। এক ভদ্রমহিলা একসময়ে অর্ণবের কাছে এসে দাঁড়াল। অর্ণব আলাপ করিয়ে দিল। চিনতে পারলাম অনন্যাকে। আমরা তিনজনে মিলে গল্প জুড়ে দিলাম। আমাদের সব বন্ধুদের কথা শুনছিলাম অনন্যার কাছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল আশার কথা জানার জন্য। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন আমায় বাধা দিচ্ছিল। হঠাৎ অনন্যাই আশার কথা ওঠাল। জানতে পারলাম যে আশা ড্রক্টোরেট করেছে মাইক্রোবায়োলজীতে। নামকরা বিলিতি কোম্পানিতে উচ্চপদে কাজ করে আশা। বিয়ে করেছে, দুটি সন্তান, একটি ছেলে একটি মেয়ে। খুব সুখের সংসার আশার। তাছাড়া নানারকম সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে। এত হাসিখুশি আমুদে আর এত পপুলার যে আমি নাকি দেখলে চিনতেই পারব না যে এই আশাই আমাদের সেই আশা।

একটু বাদে ওরা দুজনেই আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেল। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিয়ে। মনে মনে খুশি হলাম আমার তিলোত্তমা ভাল আছে জেনে। আজ এতদিন বাদে এতগুলো বছর পেরিয়ে আসার পর আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় আশাকে লেখা আমার সেই প্রেমপত্রের কথা। সেই চিরকুটে লেখা খেলার কথা। অনেক ছোট ছোট ঘটনা সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মত ফিরে এল আমার মনের আয়নায়। একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে ভিড় করে এল। আচ্ছা, ওই খেলাটা কি আমার ছোটবেলার ছেলেমানুষি ছিল? নাকি আমি কি জেনেশনে আশার সঙ্গে ওই খেলা খেলেছিলাম? আমি কি আশাকে ভালবাসতাম? নাকি আমার আরো গৃঢ় কোন উদ্দেশ্য ছিল?



ইডেন গার্ডেন এবং ডাইনোসর

সুগত সান্যাল

গল্পের নাম পড়ে যদি ভেবে থাকেন আমি কলকাতার ইডেন গার্ডেনে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি এবং সেখানে ডাইনোসর দেখাবো, সেটা মারাত্মক ভুল হবে। এই ঘটনা আরো অনেক গভীর।

আমার বন্ধু প্রফেসর প্রশান্ত বোস একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ওঁর একটা পি এইচ ডি ডিগ্রি আছে পদার্থবিদ্যাতে। তবে আমি ভেবে পাই না যে পৃথিবীর কোন বিষয়টা ওঁর অজানা। মলিকিউল্লার বায়োলজি থেকে থিওরি অফ রিলেটিভিটি, সবেতেই ওনার সমান আগ্রহ।

আমি কমলেশ মিত্র, প্রশান্ত বাবুর বাড়ির কাছে একটা ছোট মেসে থাকি। বি কম পাস করে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কেরানির কাজ করি। উনি আমায় বেশ ভালোবাসেন কিন্তু সেটা যে কেন আমি বুঝতে পারি না। উনি তো ইচ্ছে করলেই অনেক বাঘা বাঘা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, উনি যখন কথা বলেন, আমি সাধারণতঃ চুপচাপ থাকি, মন দিয়ে সব কথা শুনি, আর মাঝে মধ্যে ‘হ্যাঁ’ ‘না’ বলে নিজের অস্তিত্ব জানান দিই। প্রফেসর বোস অনেক কিছু বলে যান, উনি জানেন আমার কাছ থেকে কোন খবর কারো কাছে যাবে না। আগে অনেক লোক ওঁর সঙ্গে কথা বলে বুদ্ধি নিয়েছে আর তারপর যন্ত্রপাতি তৈরি করে টু-পাইস ইনকাম করেছে। প্রফেসর বোস টাকা অথবা খ্যাতি, এসবের জন্য পরোয়া করেননা। ওঁর নিজের প্রচুর টাকা, আর বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকেও প্রচুর পেয়েছেন। ব্যক্তিগত নাম-ডাকের কোন মোহও ওঁর নেই। তবে কেউ ওঁকে বোকা বানিয়ে চলে যাবে সেটা উনি সহ্য করতে পারেন না। অসৎ লোকের ধারে কাছে উনি থাকেন না।

প্রশান্ত বাবুর একটা ভালো অভ্যাস আছে। উনি যদিও থিয়োরিটিক্যাল বিষয়ে পি এইচ ডি করেছেন, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র তৈরি করা ওঁর সখ এবং উনি তাতে খুব আনন্দ পান। মানসিক ইচ্ছা দিয়ে চালানো যে ওভেন এবং টোস্টার উনি তৈরি করেছেন, সেটা দেখলে লোকে পাগল হয়ে যাবে। তবে আমি কঠিন ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাউকে কোন দিন কিছু বলতে পারব না, আর আমিও কখনো ওঁর বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মুশলধারে বৃষ্টি নেমেছে, আমি এসে জমে গেছি, খুব গল্প হচ্ছে। নরহরি, ওঁর কাজের লোক, এক থালা চিকেন পকৌড়া দিয়ে গেছে। এখানে এলে আমার খাওয়াটা বেশ জমাটি হয়। ছুটির দিনে দুপুরের আর প্রায় প্রতি রাতেরই খাওয়া আমার এখানেই হয়।

সেদিন উনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কমলেশবাবু, আপনার কি বহু পুরনো দিনের জীবন্ত প্রাণী দেখতে ইচ্ছে করে?”

আমি ভাবলাম, এবার আবার নতুন কি চিন্তা ওঁর মাথায় খেলছে। এত বড় এক জন প্রতিভাশালী মানুষের ভাবনার ধারা বোঝা শক্ত। আমি বললাম, আমার ইচ্ছে করে পিরামিড তৈরি, তাজমহল তৈরি হওয়া দেখতে। দা ভিঞ্চি মোনালিসা আঁকছেন দেখতে পেলেও ভালো লাগবে।

প্রশান্তবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। ওঁর বক্তব্য হোল যে আমার চিন্তাধারার মাপটা ছোটো। আমি শুধু কয়েক হাজার বছরের গভীরে ভাবছি। আর ওঁর মন ভাবছে লাখ লাখ অথবা কোটি কোটি বছরের মাপে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে আমি এই মাপে ভাবিনি। আমি সহজে হার স্বীকার করাতে উনি খুশী হয়ে ওঁর চিন্তাধারার রাশ আলগা করলেন। আমি বহুবার দেখেছি যে এটাই সব থেকে সহজ।

উনি বললেন যে উনি বহুদিন ধরে এই নিয়ে চিন্তা করে আসছেন। আর অনেক কিছু কাজ এবং অঙ্ক কয়ে ফেলেছেন, এরই মধ্যে। আমি অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমি দেখেছি যে ওঁর চিন্তাধারার গতি এবং দিক বোঝা শক্ত। তার চেয়ে সহজ হল ওঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া। আর তাতে উনিও খুব খুশী হন। ওঁর আনন্দ হল একদম নতুন কিছু তৈরি করায়, যে সব জিনিষ সাধারণ লোক কল্পনাও করতে পারবেন। টাকা বা যশ, এসবে ওঁর কোন মোহ নেই। তাই উনি পেপার লেখা বা পেটেন্ট নেওয়ার ব্যাপারে খুবই উদাসীন এবং শুধু মুষ্টিমেয় কিছু বৈজ্ঞানিকই ওঁর খ্যাতির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।

বেশ কিছু বছর আগে উনি ‘টেলিপোর্টিং’ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। আমরা দুজনে সেই যন্ত্র চড়ে ‘আলাঙ্কা’ ঘুরে এসেছিলাম। কিন্তু এতো বেশি ঠাণ্ডা সেখানে যে আমি ওঁকে প্রায় পায়ে ধরে ফেরৎ এসেছিলাম, কিছুই দেখা হয়নি। ওঁর তৈরি ‘টেলিপোর্টিং’ যন্ত্রটা দেখতে খুবই সাধারণ, একটা পুরনো কার্পেটের মতন। উনি ওই কার্পেটের ওপর এক বিশেষ পদ্ধতিতে একটা রাসায়নিকের সংযোজনা করেছেন, তা ছাড়া কিছু দিক এবং গতি পরিবর্তনের যন্ত্র লাগানো আছে, তার বিশদ বিবরণ শুধু উনিই জানেন। আজকাল ওটাকে দিয়ে ওঁদের দাদুর আমলের পিয়ানোটা ঢাকা থাকে, তাতে লোকের বিশেষ নজরে পড়েন। উনি সব সময়ে ওঁর এই ঘরটি নিজের তৈরি ‘ম্যাজিক তালা’ দিয়ে বন্ধ করে রাখেন। এই তালার একটা মহা গুণ হোলো যেই প্রধান দরজাটাতে ম্যাজিক তালা পড়ে, বাকী দরজা ও জানলাগুলো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। আমি এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারবো না, কিন্তু একটা মজার কথা বলি, কেউ যদি কোনও জানলা বা দরজা জোর করে খোলার চেষ্টা করে, তার কপালে জোটে এক রাম চড়। বেশ জোরাল চড়। আমি চড় খাওয়া লোকের কানার শব্দ শুনছি। আমরা সেদিন অন্য ঘরে বসেছিলাম।

তাগ্যবশতঃ, প্রশান্ত বাবু আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দ্যাখেন। আমাকে কোনও জিনিস বোঝাতে হলে উনি একদম সহজ করে শুরু করেন। আর শেষ অব্দি আমিও বুঝে যাই। ওঁর বোঝানর ক্ষমতাও অসাধারণ। এর সব কিছুর শুরুতে হচ্ছে আমার ওপর ওঁর বিশ্বাস।

উনি আমাকে বললেন, “কমলেশবাবু, আমি একটা যন্ত্রের কথা ভাবছি, যেটা আমাদের অতীতে... বহু প্রাচীন সময়ে কি ঘটেছিল, সেটা দেখতে সাহায্য করবে।” আমি একটু অবাক হলাম। আমি এই ধরণের যন্ত্রের কথা গল্পের বইয়ে পড়েছি, তবে কারো সঙ্গে এই নিয়ে কখনো কথা হয়নি। আরো জানার আগ্রহে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এই যন্ত্রের ব্যাপারটা একটু বিশদে জানান না, সহজ করে, আমার বোঝার মতন করে।”

“এটা খুবই সহজ ব্যাপার। আমি বেশ কিছুদিন হোলো, এর বৈজ্ঞানিক খিওরি, সব অঙ্ক কয়ে ঠিক করে রেখেছি,” প্রশান্ত বাবু জানালেন। ‘আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনি তো শুনেছেন লোকে বলে যে ‘তারা’ বিস্ফোরণ হওয়া দেখেছে। বৈজ্ঞানিকরা এই ঘটনাকে ‘সুপারনোভা’ বলে থাকেন। আসলে আপনি যেটা এখন দেখছেন, সেই তারার বিস্ফোরণ হয়তো কোটি কোটি বছর আগে হয়েছে, এবং সেই আলো এত বছর বাদে এসে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। আপনি যেটা এখন দেখছেন, সেই বিস্ফোরিত তারা এখন পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, বহুদিন আগে।”

আমি খুব বাধ্য ছেলের মতন মাথা নাড়ালাম। সত্যি কথা বলতে কি, কোটি কোটি বছর আগে তারার বিস্ফোরণ এবং আমাদের বহু প্রাচীন জীবিত প্রাণী দেখা, আমি এর মধ্যে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমার অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে ঠিক সময়ে প্রশান্ত বাবু নিজেই সব সমাধান করে দিয়ে থাকেন।

প্রশান্ত বোস আরো বিশদভাবে এই অতীতের জীব দেখবার ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করলেন। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমার সেই ‘টেলিপোর্টিং’ যন্ত্রের কথা মনে আছে কিনা? আমি জোরে ঘাড় নাড়লাম, আমি কি করে সেই ‘আলাঙ্কা’ ভ্রমণের কথা ভুলে যাব।

প্রশান্ত বাবু জানলেন যে আমরা যদি পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে যেতে পারি, তাহলে আমদের বহু পুরনো দিনের ঘটনা দেখতে পাওয়া উচিত। আমি এবার আরো জোরে ঘাড় নাড়লাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন মাথাতে সমানে পাক মারছিল, অত দূর থেকে আমরা পৃথিবীতে কিছু দেখব কেমন করে? আমি ওঁকে এটা জিজ্ঞেস করলাম।

উনি আমার এই প্রশ্ন শুনে খুব খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, “খুব ভাল বলেছেন, এটা তো মাথাতেই আসেনি। শুধু দূরে যাওয়াটা নিয়েই ভেবেছি।” ওঁর মতন একজন বড় বৈজ্ঞানিক এই বিরাট প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা ভুলে গেছিলেন, তাতে ওঁর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হয় নি। উল্টে উনি আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমারও বেশ খুশী খুশী লাগছিল। উনি বললেন এটার উত্তর খুঁজে পেতে কিছু সময় লাগবে। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

সেদিন ছিল শুক্রবার, তারপর একটা পুরো সপ্তাহ কেটে গেলো, কিন্তু প্রশান্ত বাবুর কোন খবর নেই। আমি এক দিন ওঁর বাড়ি গিয়ে নরহরিকে জিজ্ঞেস করে এলাম, সেও কোন কিছু বলতে পারলো না। খালি বলল যে সে মাঝে মাঝে প্রশান্ত বাবুকে পাতলা কাঁচ অথবা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল জাতীয় জিনিস নিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে। নরহরি ঠিক পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারলো না। আমিও বুঝলাম যে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আমাদের আর কিছু করার নেই।

পরের সপ্তাহের সোমবার সকালবেলায় হঠাৎ ডাক এলো। মেসের ম্যানেজার বাবুর ঘরে দেখি নরহরি, হাঁপাচ্ছে, এক গ্লাস জল শেষ করে আর এক গ্লাস জল খাচ্ছে। আমাকে বলল যে প্রশান্ত বাবু আমাকে এখনুন ওর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছেন। আমি যেন কয়েক দিনের মতন কাপড়-জামা নিয়ে যাই। বুঝতে পারলাম যে আমাদের আবার অনির্দেশ যাত্রার পালা এসেছে।

আমি অবশ্য মনে মনে এই যাত্রার জন্য তৈরি ছিলাম। কথা বলে সময় নষ্ট না করে আমি দু-তিনটি শার্ট-প্যান্ট নিয়ে নিলাম। আর আলাঙ্কার অভিজ্ঞতা মনে রেখে আমার ঠাকুরদাদার দেওয়া একটি বিশাল ওভারকোটও নিলাম। এই ওভারকোট উনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সৈন্যদের ‘ওয়ার-সারপ্লাস’ দোকান থেকে কিনেছিলেন, ওঁর পরে বাবা, বাবার পরে এটা এখন আমার কাছে এসেছে। তবে কে জানতো যে আমাদের এইবারের ভ্রমণের পরিধি অনেক অনেক বেশি হবে।

প্রশান্তবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি উনি বেশ উত্তেজিত। সমানে পায়চারি করছেন বসার ঘরেতে। এক কোনে দুটি অঙ্গুত যন্ত্র রাখা আছে। এর মধ্যে একটা আমাদের পুরনো ম্যাজিক কার্পেট। সেটাকে ঘাড় পোঁছ করা হয়েছে আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের খাঁচার মত জিনিসের মাথায় সেটা রাখা রয়েছে। খাঁচার সামনেটা খোলা। ভেতরে দুটি বসার জায়গা রয়েছে। অনেকটা যেন পালকির মতন দেখাচ্ছে। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করাতে উনি ওনার মার্কামারা সূক্ষ্ম হাসিটা হাসলেন। “মনে পড়ে কমলেশ বাবু, গত বার আলাঙ্কা থেকে ফেরার পথে আপনি কার্পেট থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমরা খুব দ্রুত বেগে আর অনেক উঁচু দিয়ে আসছিলাম। তাই এবারে এই ব্যবস্থা করেছি। এতে আমরা একটু আরামে বসতেও পারব আর মজা করে সারা বিশ্ব-অক্ষাংশে ঘূরতেও পারবো।” ঘটনাটা যদিও মজার বলে মনে হচ্ছিল না, কিন্তু মনে হোল এখন চুপ করে থাকাটাই শ্রেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে, ওঁর পরের কথাতে কিছুটা আলোকপাত হোল।

“দেখুন কমলেশ বাবু, আমরা যদি অনেক পুরনো ঘটনা দেখতে চাই, তা হোলে আমাদের প্রথিবীর থেকে দূরে যেতে হবে, তাই না?” আমি সায় দিলাম। প্রশান্ত বাবু বললেন, “তা হলে ডাইনোসর দেখতে হলে আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে।” দুরত্ব বোঝাতে উনি বেশ কিছু অঙ্ক আমাকে দেখাতে উৎসাহী হয়ে উঠছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি বিষয়টা পালটে ফেললাম। অঙ্ক নিয়ে আমি কি করবো? আসল ঘটনা দেখতে পেলেই আমি খুশী।

“ইয়ে... বহু দূর থেকে দেখার ব্যাপারটা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। উনি একটা হাঙ্কা হাসিতে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁর ব্যাপারটা মনে আছে। উনি দুটো বাইনোকুলার জাতীয় যন্ত্র বের করলেন। আমি ভাবলাম যে এই দিয়ে কোটি কোটি মাইল দূর থেকে কি দেখা যাবে? আমার ছোটবেলায় একটা মেলা থেকে কেনা বাইনোকুলার ছিল। তাতে একটা আমগাছের ডালপালা পরিষ্কার দেখা যেতো, তবে ফুট কুড়ির বেশি দূরের জিনিস দেখতে মোটেই সুবিধে হত না।

প্রশান্ত বাবু আমার মনের কথা বুঝে নিলেন। বললেন, “এই বাইনোকুলার সাধারণ জিনিস নয়। এটাতে একটা বিশেষ পদার্থ লাগান আছে, যেটা দূরত্ব অনুসারে দেখার জোর বাড়ায় বা কমায়। অতএব, আপনি একশো ফুট বা এক কোটি মাইল, যত দূর থেকেই দেখুন, আপনি একই রকম পরিষ্কার ভাবে সব জিনিস দেখতে পাবেন।”

সকাল সকাল বিশাল পরিমাণ জলখাবার খেয়ে আমরা যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করলাম। নরহরিকে বলা হোল যে কেউ যদি আমাদের খবর চায়, তাকে বলা হবে যে আমরা কমলেশ বাবুর গ্রামে বেড়াতে গেছি।

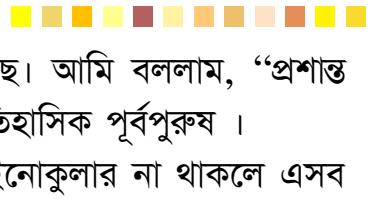
প্রশান্ত বাবু আর আমি, দুজনে ম্যাজিক পালকিতে উঠে বসলাম। আমি ওভারকোটটাও পরে নিয়েছিলাম, আর প্রচণ্ড ঘামছিলাম। যাত্রা শুরুর আগে, আমি আমাদের সব দেব-দেবীকে মনে মনে প্রণাম করে নিয়েছি, প্রশান্ত বাবু এসবে খুব একটা বিশ্বাস করেন না।

অতীতের দিকে যাত্রা

আমাদের যাত্রা শুরু হোল। প্রশান্ত বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন অনেক দূর অতীতে যাবার আগে, আমি কোন কাছাকাছি ঘটনা দেখতে চাই কিনা। আমি বললাম প্রথমে পিরামিড তৈরী দেখতে চাই। প্রশান্ত বাবু ম্যাজিক পালকির কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ নিয়ে খুটখাট শুরু করলেন।

আমরা প্রচণ্ড গতিতে চলেছি। দূরে প্রথিবী একটা ছোটো বিন্দুর মতন দ্যাখাচ্ছে। আমাদের বিশেষ বাইনোকুলার দিয়ে দেখি বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে সব। আর এই যন্ত্রের একটা বিশেষ গুণ হোল, যে এটা মানুষের চিন্তাধারা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রথিবীর যে কোন একটা জায়গা দেখতে হোলে, সেই জায়গার কথা মনে করলেই সেখানকার ছবি ফুটে ওঠে। আমি মনে মনে পিরামিডের কথা চিন্তা করতে না করতেই দেখি কয়েক শো লোক বিরাট বিরাট পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা মোটেই মরুভূমি নয়, বেশ ঘাসে ঢাকা, আমি সন্দেহ প্রকাশ করাতে, প্রশান্ত বাবু জানালেন যে তখন ঐসব জায়গা বেশ সবুজ ছিল। মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে অনেক পরে। পিরামিড দেখা হোল খুব দ্রুত গতিতে।

আমরা প্রথিবী থেকে আরো অনেক দূরের দিকে পাড়ি শুরু করলাম। মাঝখানে মনে হোল যে এক ঝলক মায়া সভ্যতার আভাস দেখতে পেলাম। আমাদের পালকি তখন প্রচণ্ড গতিতে চলেছে। প্রশান্ত বাবু ডাইনোসর দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। হঠাৎ দেখি দূরের প্রথিবীতে মানুষ দেখা যাচ্ছে তবে তাদের



চেহারা একটু অন্যরকম। তাদের দেখতে অনেক বড় এবং তারা কুঁজো হয়ে হাঁটছে। আমি বললাম, “প্রশান্ত বাবু, এরা কারা?” উনি ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললেন যে এরা আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ।

বুবলাম যে এসব দেখাও কপালে ছিল। অবশ্য প্রশান্ত বাবুর তৈরী ওই বাইনোকুলার না থাকলে এসব দেখা কপালে হোতো না।

দেখতে দেখতে বেশ কিছু ঘণ্টা কেটে গেছে। আমার একটু ঘুম পেয়ে গেছিল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে পৃথিবীর একটা জায়গায় বেশ কিছু হাতির মতন জন্ম ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তারা হাতির থেকে আকারে অনেক বড় আর গলা বেশ লম্বা, অনেকটা জিরাফের মতন। আমার ঘুম পুরোপুরি ভেঙ্গে গেছে এই দেখে। আমি বুবাতে পারলাম যে আমরা ডাইনোসর বা ঐ জাতীয় কিছু জীবদের দেখছি। প্রশান্ত বাবুকে জিজ্ঞেস করাতে উনি সজোরে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

প্রশান্ত বাবু ম্যাজিক পালকি চালিয়েই চলেছেন। মুখে এক অন্তুত হাসি। আমি ভাবলাম যা দেখার জন্য আসা, সে সবই তো দেখা হোল, এবার তো ঘরে ফিরলেই হয়। প্রশান্ত বোস কোন কথা না বলে পালকির গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন।

আরো অতীতের দিকে

আমার ভ্রমণপর্বের এই অংশটা সব মনে নেই ঠিক মতন। যেটুকু মনে আছে তাতেই এখনো মাথা ঘুরে যায়। আমি এটুকু বুবোছিলাম যে প্রশান্ত বাবু শুধু ডাইনোসর দেখেই থামবেন না, ওঁর মাথায় আরো কিছু দেখার মতলব আছে।

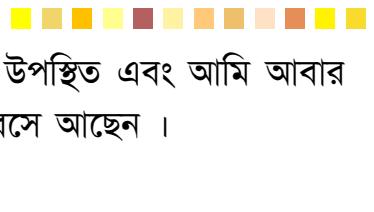
হঠাৎ আমার নজরে পড়লো যে পৃথিবীর কোথায় কে জানে সুন্দর বাগান। সেখানে গাছ, ফুল, ফল সব দেখা যাচ্ছে। ভাবলাম এত সব দেখার পর এখন বাগান দেখে কি হবে! প্রশান্ত বাবুর মুখে হাসিটা লেগে আছে তবে চোখের দৃষ্টি কিরকম যেন। একটা জিনিস দেখতে পেয়ে আমি সোজা হয়ে বসলাম। একটা বিরাট সাপ এঁকে বেঁকে চলেছে, এদিক ওদিক ঘুরে একটা গাছে উঠতে লাগল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি ওটা একটা বিরাট আপেল গাছ।

আমার হঠাৎ মনে হল এটা সেই বিখ্যাত গার্ডেন অফ ইডেন নয় তো? দুটি মানুষকেও দেখতে পেলাম। প্রশান্ত বাবু ইচ্ছে করে ঐ মানুষদের একটু আবছা রেখেছেন। ওঁর যন্ত্রের কন্ট্রোল ঠিক করাতে দেখি যে আদম ও ইভকে দেখা যাচ্ছে, গায়ে কাপড়-জামা কিছু নেই। এটা আপেল খাওয়ার আগের অবস্থা।

বলতে ভুলে গেছি, প্রশান্ত বাবু বিয়ে করেননি আর মেয়েদের সামনে উনি বেশ অপ্রতিভ হয়ে পড়েন, আর এখানে তো আরও মারাত্মক অবস্থা। সাপের বেশে শয়তান আর কিছু করার আগে, এবং ইভকে দিয়ে আদমকে আপেল খাওয়ানোর আগে, প্রশান্ত বোস তাঁর বৈজ্ঞানিকোচিত সংযম ভুলে গিয়ে কন্ট্রোলের যন্ত্রকে পুরো উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, আর আমাদের পালকি সোজা প্রশান্ত বাবুর বসার ঘরে এসে ধপাস করে পড়লো।

আমি হতভম্ব, এতবড় একটা ঘটনা দেখা গোল না। ওভারকোট্টা খুলে ফেললাম। নরহরি কাছেই ছিল, তাকে বলতে না বলতে সে খুব কড়া চা আর খাবার নিয়ে এলো। এতটা ঘুরে আসার পরে আমাদের দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছিল।

আমি প্রশান্ত বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ডাইনোসর না আদম-ইভ, এদের কারা আগে এসেছিল, উনি উভয়ের না দিয়ে অস্পষ্টভাবে খালি বললেন ওঁর ম্যাজিক পালকির কন্ট্রোলে একটু গন্দগোল ছিল। ভেবেছিলাম



যে এই পর্বের এখানেই ইতি, তা কিন্তু হোল না। কিছুদিন বাদে নরহরি ফের এসে উপস্থিত এবং আমি আবার গিয়ে পৌঁছলাম আমাদের আড়াখানায়। দেখলাম প্রশান্ত বাবু দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে আছেন।

বর্তমান অবস্থা

আমি অনেক করে জিজ্ঞেস করাতে বললেন যে উনি একটি অঙ্গুত স্বপ্ন দেখেছেন। শয়তান স্বপ্নে এসে ওঁকে শাসিয়ে গেছে। বলেছে যে এরকম বিশ্বী অবস্থার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। সেই থেকে আমাদের অতীত ভ্রমণ বন্ধ।

আমরা আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেখানকার খাবার খাচ্ছি। পালকিতে একটা ছোট টুল লাগিয়ে নরহরিকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশ লাগে। তবে এর মধ্যে একটা জায়গায় গেছলাম, যেখানকার লোকেরা কাঁচা খাবার খায়, সে এক বাজে অভিজ্ঞতা। ওখান থেকে ঘুরে আসার পর প্রশান্ত বাবু একটা নতুন সর্ব-হজম-ক্ষম বড়ি তৈরী করছেন!!!!

বাকি কথা

শুক্রি দত্ত

পূর্বকথাঃ ইন্দিরার গল্প তো সাহিত্যসম্মাট বক্ষিমবাবু অনেক দিন আগেই বলে গেছেন। তদানীন্তন প্রথানুযায়ী হরমোহন দত্তের প্রথমা কন্যা ইন্দিরার শেশবেই বিবাহ হয়েছিল বটে, কিন্তু অর্থগৌরবে তাঁর সমকক্ষ না হওয়াতে তিনি আদরের আত্মজাকে শুঙ্গরঘরে পাঠাননি, বরং জামাই উপেন্দ্রবাবুকে উপযুক্ত উপার্জনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইন্দিরাকে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ইন্দিরার শুঙ্গের কাছে অত্যন্ত অপমানকর মনে হলেও ধনী বেয়াইএর বিরক্তাচরণ করা তাঁর পক্ষে সন্তুষ্ট ছিলনা; অগত্যা তিনি চুপ করে এই অপমান হজম করেন। উপেন্দ্রবাবু অধিকতর উপার্জনের আশায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে যান এবং যথেষ্ট অর্থোপার্জনপূর্বক বাড়ি ফিরলে ইন্দিরার উনিশ বছর বয়েসে সে প্রথম শুঙ্গবাড়ি যাত্রা করে। কিন্তু পথে কালাদিঘী নামে এক পুকুরের কাছে ভয়ঙ্কর ডাকাতিতে ইন্দিরার সর্বস্ব লুঠ হয়ে যায়, এবং জনবিরল জায়গায় তাকে ফেলে ডাকাতরা চলে যায়। ইন্দিরার কোনো বাড়িতেই আর ফেরা হয়না। কালক্রমে ইন্দিরাকে দেখা যায় কলকাতার রামরাম দত্তের বাড়িতে কর্মরতা দাসী হিসেবে। এখানে সে একমাত্র পুত্রবধু অশেষগুণশালিনী সুভাবিনীকে পায় সত্যিকারের শুভাকাঞ্জিনী সুখীরূপে, এবং তারই প্রচেষ্টায় অনেক ঘনঘটার পর ইন্দিরা বাপের বাড়ি ফিরে যায় ও পরিশেষে স্বামীর সঙ্গে শুঙ্গবাড়িতেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বক্ষিমবাবু তো ইন্দিরা-উপেন্দ্রে সম্মিলিত সুখী দাস্ত্য জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন; কিন্তু অবিমিশ্র সুখ বিধাতা কোন মানুষের ভাগ্যেই লেখেন কি? এই উত্তর-কথায় আসুন দেখি ইন্দিরা কেমন আছে।

ইন্দিরা চুপচাপ বসেছিলো আরামকেদারাতে। পশ্চিমের এই বারান্দাটা তার খুব প্রিয়। শুঙ্গের আমলের এই আরামকেদারাটা বোধহয় তার সব মানসিক বিচলনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আজ অনেকদিন পর উ-বাবু কলকাতা গেছেন বিশেষ এক মামলার কাজে। একরাত থাকতে হবে সেখানে। আজ রাতে এই বিশাল বাড়িটাতে ইন্দিরা একা। কালাদিঘীর ঘটনাটা যদিও আজ প্রায়বিস্মৃত এক অতীত, ইন্দিরার মনে এর জন্য আর কোনো কালো ছায়া নেই, কিন্তু এই কষ্টটা তার মনে কখনো সখনো ভেসে আসে যে এই ঘটনায় তার সুখকল্পিত প্রথম প্রিয়মিলন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

ইন্দিরা কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর আর কোনো গঙ্গগোল ঘটেনি তার জীবনে। সময় তার থেকে যা নিয়েছিল তার চতুর্ণ দিয়ে তার জীবন ভরিয়ে দিয়েছিল। শুঙ্গের স্নেহ, স্বামীর ভালোবাসায় তার সুখের ভরা উপচে উঠেছিলো। বাড়ির দাসদাসীরা তার ব্যবহারে খুবই তুষ্ট ছিল আর তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। তবে একটা বেশ বড় কষ্টটো তার ছিলোই। তার সন্তান হয়নি। এই অভাবটা একজন মহিলার পক্ষে নিশ্চয়ই খুবই বড়, কিন্তু যে স্বামীকে পাবার কোনো আশা ছিলনা, তাকে এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে তার মনে অন্য কোনো চিন্তাই স্থান পায়নি। স্বামী-শুঙ্গের আদরেই সে পূর্ণ ছিল।

বিকেলের ছায়া প্রলম্বিত হয়ে সন্ধ্যার আঁধারকে দীর্ঘায়িত করছে, দাসী এসে খবর দিল, “মা, একটা বুড়ো মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।” ইন্দিরার মগ্নতা ভেঙ্গে গেল। অলস গলায় বলল, “বাবু বাড়ি নেই, এমন সময় কে এল আমার সাথে দেখা করতে? বলে দে, কাল বাবু ফিরলে আসতে।” দাসী বলল, “বলেছিনু মা, কিন্তু বুড়োটা নাছোড়বান্দা। বলে কিনা, মার সঙ্গে দেখা করাটা আজই দরকার।” ইন্দিরা একটু বিরক্ত হলেও শেষে বলল, “বৈঠকখানা ঘরে আলো দে আর লোকটিকে সেখানেই আসতে বল।”

অতবড় ঘরটা একটা মাত্র বাতিতে কি উজ্জ্বল হয়? ইন্দিরার বসার জায়গা ছাড়া বাকি ঘরে একটু ভৌতিকভাবে ছায়াটা নাচতে লাগল। তার মধ্যে বয়স্ক অথচ ঝজু চেহারার লোকটি উবু হয়ে অপেক্ষা করছিল। ইচ্ছে করেই একটু দেরী করে ইন্দিরা ঘরে ঢুকল। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে তাকে নমস্কার জানাল। ইন্দিরা বলল, “কি ব্যাপার, বাবু বাড়ি নেই। তোমার দরকারটা বাবুকে বললেই তো ভাল করতে।”

“না মাজননী, দরকারটা আমার আপনার সাথেই। আমি বাবু বাড়ি নেই জেনেই এসেছি। দীর্ঘকাল একটা অপরাধের বোৰা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। বলতে পারিনি কাউকে। বাপের পাপে একমাত্র

মেয়েটার জীবন ছারখার হয়ে গেল। শেষে আজ তোমার কাছে কবুল করতে এলাম। মাগো, তুমি ক্ষমা না করলে আমার শাস্তি নেই।”

ইন্দিরা একটু অবাক হল। তার কাছে কিসের অপরাধ? সেতো লোকটাকে চেনেই না। ঈষৎ বিত্ত স্বরে বলল, “আমি তো বুঝতেই পারছিনা কোন অপরাধের কথা তুমি বলছ?”

লোকটা একটু চুপ থেকে বলল, “কালাদিঘীর কথা।”

ইন্দিরা চমকে উঠল। ঘরে বাজ পড়লেও সে এতো ধাক্কা খেতো না। অস্ফুটে বলল, “কালাদিঘী? হঠাৎ আজ আবার কালাদিঘী?”

“মা, তুমি সেদিন প্রথম স্বামীর কাছে যাচ্ছিলে। কত স্বপ্ন ছিল তোমার মনে। আমি তোমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছিলাম সেদিন।”

“আজ এতদিন পর সেকথা বলে কি লাভ?” অস্ফুটে বলল ইন্দিরা।

“আমি জানি, মা। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার সব দুঃখ মুছে গেছে। কিন্তু আমার পাপ তো যায়নি। আজ সেই পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি। তোমার মত সতীলক্ষ্মী আমায় নিজমুখে ক্ষমা না করলে আমার সন্তানের জীবন শেষ হয়ে যাবে।”

“আমার তোমার উপর কোনো রাগ বা কষ্ট নেই বাঢ়া। তুমি ভালো থেকো। এখন এস।”

লোকটি উঠল না। ধীরে ধীরে বলল, “মা একটা কথা তোমায় নিবেদন করতে চাই, আমি পাপ করেছি। তার শাস্তিও পেয়েছি। কিন্তু একাজ আমি নিজের ইচ্ছেয় করিনি। যিনি একাজ করতে আমায় হৃকুম করেছিলেন...”

“হৃকুম?” ইন্দিরা সোজা হয়ে বসল। লোক দিয়ে তার ক্ষতি করার চিন্তা কার মাথায় এল? কেনই বা এল? সে তো কারোর কোনো ক্ষতি করেনি। অতো ছোটো বয়সে অন্তঃপুরবাসিনী একটি মেয়ে, যার সঙ্গী ছিল শুধু মা, বাবা, ছোট বোন ও কয়েকজন দাসী, কারো শক্র হয়ে গেল কেন?

লোকটির গলা ভেঙ্গে এলো, “তিনি আর কেউ নন মা, তোমার শুশুর।”

“কিন্তু কেন,” আর্ত কষ্টে জিজ্ঞাসা করল ইন্দিরা, “আমি তো ওঁর কোনো ক্ষতি করিনি!”

“ক্ষতি তুমি কেন করবে মা,” লোকটি বলে চলে, “তোমার শুশুরের শক্রতা তোমার বাপের সঙ্গে। অবশ্য এই শক্রতার কথা তোমার বাপও জানতেন না।”

“তাহলে?”

“তোমার মনে আছে তো, বিয়ের পর তোমার বাবা তোমায় শুশুরঘরে পাঠাননি তোমার স্বামীর রোজগার ভালো ছিলনা বলে। কর্তামশাই তোমায় আনতে যে লোক পাঠিয়েছিলেন তাকে তিনি হাসতে হাসতে ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমায় উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করার ক্ষমতা হলে তবেই তিনি তোমাকে স্বামীর ঘরে পাঠাবেন। কর্তামশাই এতে খুবই অপমানিত হয়েছিলেন আর সেই রাগ তিনি ভোলেননি। তিনি আবার ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খোকাবাবু তাতে একেবারেই বেঁকে বসেন। বেশি চাপাচাপির ফলে তিনি রাগ করে পড়াশোনার নাম করে পশ্চিমে চলে যান। শুনেছি সেখানে গিয়ে তিনি খুব উন্নতি করেছিলেন। এরপরই কর্তামশাই আবার বেয়াইবাড়ি লোক পাঠান তোমাকে আনার জন্য। কিন্তু আসলে তাঁর মনে অন্য কথা খেলা করছিল।”

“এতো কথা তুমি জানলে কি করে?”

“একথা কর্তাবাবু আমায় নিজমুখে জানালেন যে। আর কালাদিঘীতে ডাকাতির পরিকল্পনাটাও সেখনেই স্থির করা হল।”

এসব শুনতে শুনতে ইন্দিরা ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কিন্তু সে অভিজাত ও জমিদার পরিবারের মেয়ে এবং বর্তমানে একটি পরিবারের সর্বময়ী কঢ়ীও বটে। নিজেকে সংযত করার অভ্যাস তার সহজাত। খানিক সামলে সে বলল, “এসব কি বাজে কথা বলছো। এতেদিন পর, যে মানুষটি স্বর্গে গেছেন, তাঁর নামে এই দুর্নাম করতে তোমার বাধছে না?”

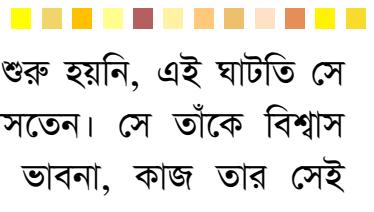
অপরাধী গলায় লোকটি বলল, “মাগো, কর্তাবাবু শরীরে থাকতে এসব বলার তো কোনো প্রশ্নই নেই। তাছাড়া তখন আমার মধ্যবয়স। মনে কোনো পাপবোধ ছিলনা। মালিকের হৃকুম তামিল করেছি, এই তো আমার কাজ। কিন্তু আজ বৃদ্ধ বয়সে মনে হয় সব দায় মালিকের উপর দিয়ে বোধহয় সারা যায় না। আমার মেয়েটির সংসার যখন হঠাতে করে ছারখার হয়ে গেল, সেদিন আমার নতুন করে তোমার সাজানো মুখখানা মনে পড়ল। হাত জোড় করে তোমার সেই করুণ কান্না আমার পিঠে চাবুক মারছিল। আমরা তো তোমার এয়োতির চিহ্ন শাঁখা লোহাটুকুও ছাড়িনি সোনার জন্য। এতেদিন তো তোমায় একলা পাইনি, আজ খোকাবাবু বাড়ি নেই বলে তোমার কাছে বোৰা নামিয়ে মাপ চাইতে এসেছি।”

বাইরে তখন ধূসর অন্ধকার। ঘরের থমথমে আবহাওয়াকে ভেঙ্গে দিয়ে ইন্দিরা উঠে দাঁড়াল। একটা কথাও না বলে বাইরে গিয়ে একজন দাসীকে হৃকুম করল লোকটিকে কিছু খেতে দিতে। অন্য একজনের হাতে একটা খামে কিছু টাকা ভরে লোকটির হাতে তার মেয়ের নাম করে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিল। সে আর বাইরে এল না। তার মনের ভিতর কষ্টের ঝড় বইছিল। শুশুরকে সে খুবই ভালোবাসতো। কিন্তু তিনি যে এমন ভেবেছিলেন কে জানতো।

একটা ফোনের শব্দে তার চটকা ভেঙ্গে গেল। কোলকাতা থেকে উ-বাবুর ফোন, তিনি কাজ শেষ না হওয়াতে কালকের বদলে পরশু ফিরবেন। ইন্দিরা ঠিক বুবাতে পারল না সে এই খবরে খুশি না দৃঢ়খিত – কোনটা হবে। তবে এই মানসিক অবস্থায় স্বামীর মুখোমুখি হতে হোলো না বলে নিশ্চিতভাবেই স্বস্তি বোধ করল। এক প্লাস জল খেয়ে সে একটু সুস্থিত হয়ে ফোনে যোগাযোগ করল তার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলির একমাত্র সাথীকে। একমাত্র তাকেই সব খুলে বলা যায়। “ওখান থেকে আমার বাড়ি মাত্র দু’ঘন্টার পথ। তুমি শীগগির এসো। এই অন্ধকারে তুমি ছাড়া আর কোনো আলো নেই,” ফোনের মধ্য দিয়ে ইন্দিরার আর্তি আছড়ে পড়ল।

সুভাষিণী খুব অবাক হল। ইন্দিরার এবস্থিধ বিচলন! ইন্দিরাকে সে খুব শক্ত মনের মেয়ে বলে জানত। সে স্থির থাকতে পারল না। তার ছেলে এখন হস্টেলে থাকে। তাই তার তেমন চাপ নেই। আর র-বাবুর সহযোগিতার কথা তো বক্ষিমবাবুই লিখে গেছেন। সে একটা চিরকুট লিখে রেখে দৌড়াল। কিন্তু পথ যে আর ফুরায় না। ইন্দিরার বাড়ি পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় উঠে সে ‘বেয়ান, বেয়ান’ বলে চিৎকার জুড়ে দিলো। সবাই জানে, সে খুব হাসিখুশি ধরনের মেয়ে। ইন্দিরার মুখোমুখি হয়ে সে খুব অবাক হয়ে গেল। একি চেহারা হয়েছে তার স্থীর! চোখ ফুলে লাল; মুখ কালিবর্ণ। হাত ধরে সুভাষিণীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ইন্দিরা দরজা বন্ধ করল, তারপর স্থীর কোলের উপর অবোরে ভেঙ্গে পড়ল।

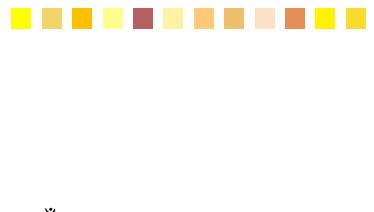
সুভাষিণী কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। শুধু হাত বুলিয়ে মাথায় দিতে লাগল। ইন্দিরাকে সময় দিল কানার মধ্য দিয়ে তার আবেগ ফুরিয়ে ফেলার। একসময় ইন্দিরা উঠে বসল। তারপর ভাঙ্গা গলায় বলল, “অনেকক্ষণ এসেছো দিদি, কিছু খেতে দিতে বলি।” সুভাষিণী হাত তুলে বারণ করে বলল, “আগে বল, কি হয়েছে, কেন ডেকেছিস।” ইন্দিরা আবার একটু ফোঁপালো, একটু সময় চুপ করে রইল, তারপর ধীরে ধীরে সব কিছু খুলে বলল। সুভাষিণী শুনতে শুনতে বুবাতে পারল গঙ্গগোলটা কোথায় হয়েছে। ইন্দিরা সরলা। তিল তিল করে শৰ্দ্দা-ভালোবাসায় যে মন্দির সে মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিল, সেখানে সে তার প্রিয়জনদের নিজের মনের মাধুরী



মিশয়েই প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় অন্য সকলের মত করে তার জীবন শুরু হয়নি, এই ঘাটতি সে প্রাণপণে পূর্ণ করার চেষ্টা করত। সে দেখেছিল তার শুশ্রে তাকে কত ভালোবাসতেন। সে তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। আজ সেই দেবতার বিচুতি, তার বিরহে সেই শুশ্রের ষড়যন্ত্রমূলক ভাবনা, কাজ তার সেই বিশ্বাসকে চূর্ণ করে দিয়েছে। এই আঘাত তার সহ্য হয়নি।

সুভাষিণী একটু হেসে ইন্দিরাকে টেনে তুলল। যত্ন করে মুখ মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, “তুই কি বোকা রে, শুনলি না, উ-বাবু আবার বিয়ে করতে চাননি বলেই পশ্চিমে চলে গিয়েছিলেন। আরে সেই তো তোর আসল জোর। দেখ, তার ভালোবাসার কত জোর যে তুই আবার ফিরে এলি তার জীবনে!” আদর করে ইন্দিরার মুখটা নেড়ে দিল সে। সত্যিই তো, একথাটা তো তার মাথায় আসেনি, তৃতীয়ার শশীর মত ক্ষীণ হাসি ভেসে উঠল ইন্দিরার মুখে। ধীরে ধীরে পূর্ণিমার আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। সে সুভাষিণীকে জড়িয়ে ধরে বলল, “ধন্য দিদি, আবার মনে পড়ল তুমি র-বাবুর প্রধানমন্ত্রী। তোমায় পেশাম।” দুহাতে চুলের গোছাকে খোঁপায় বেঁধে উঠে দাঁড়াল সে, “যাই, তোমার জন্য কিছু রাঁধিগে। সেই কখন এসেছো, আর আমায় দেখো? নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, ছি!”

দুই সখী হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলতে ঢলতে রান্নাঘরের দিকে চলল।



আলো-আঁধারি

তাপস ক্রিবণ রায়

রাত অন্ধকার হয়। অনেক আলোর বন্যায় আমরাই তাকে স্বচ্ছতায় তুলে ধরি। আর চাঁদ, দ্য ল্যাম্প অফ দ্য নাইট, রাতের প্রকৃতিকে দেখতে আকাশে ঝোলানো থাকে! এই চাঁদের আলো, মানে, জ্যোৎস্নায়, বড় মায়া জড়িয়ে থাকে। মনে পড়লেই রোদ যেমন চিটচিটে গরম আর অস্বস্তির মানসিক উত্তেজনা নিয়ে আসতে পারে, তেমনি শান্ত নিশ্চিন্ততার ভাবনা জ্যোৎস্নার মধ্যে খুঁজে পাই।

এমনি এক আলোআঁধারি জ্যোৎস্নায় শহীদ মিনারের পাশে গার্ডেনে বসে আছে রজত। গরমের দিন, রাতের দিকে গরম কমে যায়। না ঠাণ্ডা, না গরমের মাঝখানে, আরও যদি জ্যোৎস্না রাত হয়, ভালো লাগবেই। আর ঘিঞ্জি কলকাতার রাস্তাঘাট ছেড়ে ছোটবড় কোনো বাগানে কিছু সময়ের জন্য বসলে সত্যি ভালো না লেগে পারে না। খোলা হাওয়া যেটুকু পাওয়া যায়, তাতেই মনে হয় শরীর জুড়িয়ে গেল।

রজতের ভালো লাগছিল, ও একাই এসেছিল ধর্মতলায়, ইলেকট্রনিক্স আইটেমের নাকি ভালো দোকান আছে এখানে। বেহালা, যেখানে উঠেছে রজত, সেই পর্ণশ্রীর ধারেকাছে কোথাও বড় ইলেকট্রনিক্সের দোকান নেই। আর সেই যদি কোথাও বের হতে হয়, তবে ধর্মতলা গেলে ক্ষতি কি? ঘোরায় ঘোরা হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে বেশ ক'টা দোকান ঘুরে পছন্দ মত মোবাইল কিনতে পারবে। এমনই ভেবে ধর্মতলা আসা। মোবাইলের মধ্যে এল-জি'র সেট পছন্দ করল রজত। দাম সাড়ে চার হাজার টাকা, সস্তা, সুন্দর, মজবুত। পুরোনো যে মোবাইল, যেটা তার কাজে লাগছিল, সেটা অনেক দিনের পুরোনো। ওপরটা ঘষেটমে ওজ্জ্বল্য হারিয়েছে। আর মডেল বড় পুরোনো ছিল, সব দিক ভেবে নতুন নেওয়া।

সন্ধ্যের মধ্যে মোবাইল তো নেওয়া হয়ে গেল, এবার কি করা যায় ভাবছিল রজত। শহীদমিনারের পাশের গার্ডেনের কথা মনে হলো তার। এদিক-ওদিক না ঘুরে নিশ্চিন্তে ক'টা মিনিট বসা যাক ভেবে গার্ডেনে এসে বসল। আশপাশে তাকিয়ে দেখল আরও বেশ কিছু লোকজন বসে আছে। দু'তিন জায়গায় যত দূর নজর যায় জোড়ে জোড়ে বসে থাকতেও দেখা গেল। গার্ডেন মানেই তো তাই, জোড়ে এসে বসে থাকার প্রশংসন জায়গা, সামান্য আনন্দ-স্ফূর্তি, খুনসুটি, বসন্ত বয়সে সবাই এটা চায়।

খালি জায়গা নিয়েই বসে আছে রজত। পাঁচ মিনিট বসে থাকার পর উঠবে উঠবে ভাবছিল, এমনি সময় একটা মেয়ে এসে দাঁড়ালো তার সামনে, একটু দূরত্ব নিয়ে। রজত অবাক হল।

কি ব্যাপার? মেয়েটার হাবভাবে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চায়। মেয়েটি মৃদু স্বরে কি যেন বলল, রজতের বোধগম্য হল না। আবার মেয়েটি ঈষৎ চাপা স্বরে বলে উঠল, সঙ্গিনী চাই?

--মানে বুঝলাম না, রজত বলে ওঠে। মনে মনে সে ভয় পায়, খারাপ মেয়েছেলে নয় তো! পটিয়ে-পাটিয়ে পয়সাকড়ি নিয়ে ভেগে পড়তে পারে।

--ভালোবাসার লোক চাই? ঈষৎ হাসি মেয়েটির মুখে, যদিও মলিনতা ঘিরে আছে তার সমস্ত শরীর।

ভয় পেয়ে যায় রজত, নিশ্চয়ই মেয়েটি দেহপসারণী হবে। এ ধরণের ঘটনার সামনাসামনি কখনো হয়নি সে, বলে ওঠে, না, না, আমি এখন ঘরে যাব।

মেয়েটি মিষ্টি ভাবে বলে ওঠে, ঘরে তো কেউ না কেউ থাকবেই, গার্ডেনে তো আপনি একা!

--না, না, আমার কাউকে চাই না, এখনই আমি ঘরে যাব, উৎকর্ষায় বলে ওঠে রজত।

মেয়েটি বলে ওঠে, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি বাষ-ভাল্লুক নই, মানুষ, না হয় দু'টি কথা আপনার সঙ্গে প্রেমিকা হয়ে বললাম! বেশী লাগবে না, আধ ঘন্টায় বিশ টাকা দেবেন।

উঠে যেতে থাকে রজত, ভাবে, মেয়েটি বলে কি! প্রেমিকার অভিনয় করবে বিশ টাকায়! তারপর জমে গেলে আরও কত কিছুর রেট বলে বসবে। এমনি করে ফাঁসিয়ে সর্বস্বান্ত করবে।

মেয়েটি আরও একটু কাছে এল, ফিসফিস করে বলে উঠলো, জানেন, আজ সারা দিন একটি পয়সাও পাইনি, সকাল থেকে পেটে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি ছাড়া কিছুই পড়েনি, ঘরের মা আর ভাইকে কি খাওয়ার বলুন!

রজত দাঁড়ায়। মনে হয় এমনি ভাবে ওরা কথার ফাঁদ পাতে, মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর সুন্দর কথা বলে, তারপর নিয়মিত খন্দের বানায় – আর লোকেদের চরিত্র হনন করে, টাকা পয়সা আত্মসাং করে পথে বসায়।
রজত কি মনে করে পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে, মেয়েটার হাতে দিয়ে বলে, এটা রাখো।

মেয়েটি টাকা নেয় না, বলে, না এমনি এমনি আমি টাকা নিই না, আমায় বিশ্বাস করুন আমি কোনো ছলনা করছি না, এমন কি আমি আপনাকে দেহ দান করতেও আসি নি, শুধু দু'টি মিষ্টি কথার অভিনয় করে ক'টা পয়সা চাই আমি।

কি উত্তর দেবে রজত বুঝতে পারল না। বেশভূষায় মেয়েটিকে অতি সাধারণ মনে হচ্ছে। বয়স বিশ-পঁচিশের ভিতর, উগ্র সাজসজ্জা শরীরে নেই, গা থেকে পারফিউমের কোনো গন্ধ আসছে না। পরিচ্ছদে উগ্র চাকচিক্য নেই। তবে কি মেয়েটি যা বলছে তা সত্যি! কিন্তু এমনি ভাবে কি কেউ পয়সা রোজগার করতে পারে? লোকেরা এমনি ভাবে তাকে পয়সা রোজকার করতে দেবে? দু'দিন পরেই তো সে বাধ্য হবে দেহ দান করতে... তখন... যাক এতসব ভাববার তার কি দায় পড়েছে!

মেয়েটি রজতের দিকে তাকিয়ে করুণ ভাবে হাসল, বিশ্বাস করতে পারছেন না আমায়! আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি চাই না।

--না, না, আমায় যেতে হবে, আর্জেন্ট কাজ আছে।

--ঠিক আছে যান, আপনার নামটা বলবেন?

--কেন, নাম দিয়ে কি হবে?

--ধরুন অজয় আপনার নাম, আমার আপনাকে বলতে হবে, অজয়দা, কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, চলো না দু'মিনিট কোথাও বসি, আমায় কি তোমার ভালো লাগে না!

--মেয়েটি তার রোজের অভিনয়ের কিছু অংশ বলে চলে। সত্যি কি অস্তুত! জীবনে খুব কমই এমন চমকদার ঘটনা ঘটে।

কিন্তু রজতের হঠাৎ চমক তখন যখন দেখল গার্ডেনের আবহায়ায় কোনো ঝোপঝাড় থেকে দুটো মেয়ে বেরিয়ে এসে এই মেয়েটির চুল টেনে ধরল। একি! কি হচ্ছে রজতের চোখের সামনে? পরে আসা মেয়েদু'টির মধ্যে একজন বলে উঠল, হারামজাদী, বেরো এখান থেকে! আবার এসেছিস তুই! দলের অন্য মেয়েটা আরও কদর্য কিছু গালি দিয়ে, একজন চুল টেনে, আর একজন ধাক্কাতে ধাক্কাতে রজতের অভিনেত্রী প্রেমিকা মেয়েটিকে গার্ডেন থেকে বের করে দিতে তৎপর হয়ে উঠল। যেতে যেতে প্রেমিকা মেয়েটি মিনতি ভরা চোখ নিয়ে দু'তিনবার তাকাল রজতের দিকে।

সত্যি খুব খারাপ লাগছে রজতের। বেচারা, সত্যি হয়তো সারা দিন ঝালমুড়ি ছাড়া আর কিছুই তার পেটে পড়েনি। একবার মনে হল, কেন ওর হাতে পনের-বিশ টাকা গুঁজে দেয়নি!

এমনি সময় ফিরে এলো জাঁদরেল মেয়ে দুটি, রজতকে বলে উঠল, ওর পাল্লায় পড়বেন না যেন, আপনাকে দু'দিনে ছিবড়ে বানিয়ে দেবে! তারপর ওদের মুখ থেকে উত্তেজনার ভাবটা সরে গেল, শান্ত হয়ে

এক জন অন্য জনকে দেখিয়ে হেসে বলল, এর সঙ্গে চলে যান ওই গাছটার আড়ালে, ওর নাম চন্দ্রা, ওর সঙ্গে ভালবাসা করুন গিয়ে।

--না, না, আমি যাচ্ছি, রজত বলে ওঠে।

--কোথায় যাবেন, সবে তো সন্ধ্যে, রজতের হাত আলতো ভাবে সুন্দর ভঙ্গিমায় তুলে ধরে চন্দ্রা। প্রেমিকার মত হাসে সে, শরীরে উগ্র পারফিউমের গন্ধ তার। গন্ধে আশপাশের জায়গাটা পর্যন্ত উৎকট হয়ে উঠেছে। হেসে চলেছে মেয়েটা রজতের মুখের দিকে চেয়ে।

--কি হল, চলুন না, মজা পাবেন, বলে নাচের ভঙ্গি করে আবার হেসে ওঠে মেয়েটা।

কি করবে এবার রজত, সাথে রাখা মোবাইল, টাকাপয়সা সবই যদি ও নিয়ে যায়! শুনেছে রজত, কথা না শুনলে ওরা নাকি আরও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। মায়, জামা-প্যান্ট খুলে ল্যাংটো করে ছেড়ে দেয়! ভয় আরও জাঁকিয়ে বসল রজতের মনে, আর এই জন্যই বোধহয় সে এ যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল।

রজত বলে, আমার আর্জেন্ট কাজ আছে, আমি যাব।

--কোথায় যাবে তুমি! রজতের গায়ে হেলান দিয়ে আরও নিবিড় হয় চন্দ্রা।

--সরুন আমি বাড়ি যাব।

--বাড়ির ছেলে বাড়ি তো যাবেই গো, তার আগে চলো না আমরা খেলা করি দু'জনে!

হেসে টানতে থাকে রজতকে। চন্দ্রা বুবতে পারে এ ছোকরা একেবারে আনকোরা।

আশপাশের হেঁটে যাওয়া আসা গোকেরা কেউ কেউ ওদের দিকে তাকাচ্ছিল, কেউ কেউ হাসছিল। রজতের কাছে ভীষণ লজ্জাকর ছিলো ব্যাপারটা।

প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে চন্দ্রা রজতকে। পাশে ঝোপের মত জায়গা, মনে হয় কাগজী ফুল গাছের ঝোপ।

শুনেছে ওই গাছে কাঁটা থাকে।

দু'কাঁধে হাত রেখে প্রেমিকার মত সুন্দর করে বসিয়ে দিল রজতকে। আর কিছু না বলে সোজা রজতের দু'গালে চুমু খেয়ে দিল। রজত কি বাইরে থেকে শান্ত হয়ে যাচ্ছে? ভিতরে গুপ্ত স্থানে কি তার ধীরে ধীরে সাড়া জেগে উঠেছে? না, তেমন হয় নি, ভয়ে সে এখনো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে নি। ওর মনে একটাই চিন্তা, কি করে ওর হাত থেকে রেহাই পাবে!

--দেখ, সময় নেব না, পাঁচ মিনিটে তোমায় শান্ত করে দেব! বলে চন্দ্রা নিজের কোমরে হাত দিল, সামনের দিক থেকে ব্লাউজের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু খুঁজল। না, নেই, নিজের মনেই বলে উঠলো চন্দ্রা, নিশ্চয়ই পড়ে গেছে কোথাও। তার পর কিছু একটা মনে করে চিন্কার করে উঠল, ওই মাগী মেয়েটাকে তাড়াতে গিয়ে শিশিটা পড়ে গেছে কোথাও, হারামজাদী আমার পাঁচ টাকার তেল ফেলে দিল! মুহূর্ত চুপ থেকে রজতের মুখটা টেনে নিজের কাছে নিয়ে চুমু কাটল চন্দ্রা, বুকে-পিঠে হাত রেখে হাতটা ধীরে ধীরে নিম্নাঙ্গের দিকে নিয়ে গিয়ে দু'বার হাত বুলোলো, আর ছেট ছেলেকে ঝোঁকাবার মত করে বলল, আসল কিছু তো এখানে করতে পারবে না, তাই সুন্দর করে একবার আউট করে দেব, কেমন? একটু থেমে আবার বলে উঠল, তবে লক্ষ্মীটি, একটু বসো তুমি, এখনই আসছি। চন্দ্রা ঝট করে তেলের যোগাড়ে চলে গেল।

মাথা চন করে উঠল রজতের, বুদ্ধি খেলে গেল হঠাৎ, কেউ যেন তাকে বলে দিল, পালা, পালা শিগ্গীর... ও চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিল, চারিদিকে গাড়িঘোড়ার শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না, তবে হ্যাঁ, একদিক থেকে বেশ উজ্জল আলোর আভা আসছিল, সে দিকে তাকাল, অদূরে রাস্তার সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল, সারি সারি লাইনে গাড়ি যাতায়াত করছে, আর সময় নেই, ঝোপঝাড়ের ফোকর গলিয়ে ছুটল সে।

প্রায় শ'পা ছুটেই পেয়ে গেলো গার্ডেনের সীমানার দেওয়াল, এক কোমর উঁচু ছিলো সেটা, টপকাতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না রজতের। লাফ দিয়ে টপকে সে জনতা আর গাড়ির ভীড়ে মিশে গেল।

সেখান থেকে তেরো নম্বর বাস ধরে সিধা কাকার বাড়ি – পর্ণশ্রীতে পৌছে গেল। রজত কাকার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে, এমনি সামার ভেকেশনের সময় প্রতিবারই প্রায় কাকার বাড়ি ঘুরে যায়। কাকু-কাকিমা দু'জনেই তাকে ভালবাসেন, সব সময় তাঁদের কাছে ঘুরে যেতে বলেন। সেইমত এবার রজত এসেছে কাকার বাড়ি, আরও তিন দিন তার থাকার কথা।

গার্ডেনের ব্যাপার তার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। বন্ধুদের কাছে শুনেছে এধরণের ঘটনা বড় বড় শহর-নগরে ঘটে। তবে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করার চমক যেন ছিল অন্য রকম! জীবনকে কত অভিজ্ঞতা নিয়েই না এগিয়ে যেতে হয়।

ওই মেয়েটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যে তাকে ওর প্রেমিক হতে বলেছিল। ও হতে চেয়েছিল তার প্রেমিকা, বিনিময়ে বিশ টাকা সে নেবে। দিন-দিন রোজগারের পছ্ন্য কত বিচ্ছি ধরণের হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি গরীব ছিল সন্দেহ নেই, সংসারে সেই হয়তো একমাত্র রোজগেরে, সত্যি হয়তো তিন-তিনটি পেট ওর রোজগারেই চলে। ও খুব নিরীহ ধরনের ছিল, তবেই তো ওকে মার খেতে হল। আহা, বেচারা বলছিল, দিনভর কিছুই খায়নি! রজতের মন কেমন করে উঠলো।

মেয়েটির চেহারা ছিল ছিমছাম, আবছা আলো-অন্ধকারে তেমন বোবা যাচ্ছিল না কতটা সুন্দরী দেখতে ছিল। তবে রজত দেখেছে ও মার্জিত ছিল। কথাবার্তায় তো খুব মিষ্টি ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রজত এখন যদি তার দেখা পায় চিনতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, তার গলার মার্জিত সুর এখনো তার মনে গেঁথে আছে। সে যদি তার সামনে এসে কোনো কথা বলে, তার কন্ঠ নিশ্চয় রজত চিনে যাবে।

মন্দ হত না যদি আবার তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। আর চন্দ্রা, সে কেমন! নিজের মনকে প্রশং করে রজত, ওরে বাবা, সে তো সাংঘাতিক, পারলে গায়ের সব রস সে নিংড়ে নিতে পারে। ভাগ্যক্রমে ওর হাত থেকে বিনা তেলে ফসকে আসতে পেরেছে সে!

রজত ভাবলো, যাবে নাকি আরেকবার ধর্মতলা, শহীদ মিনার, সেই বাগানে, যেখনে রঙচরীরা খেলা করে! এমনই মনের কোণায় লুকোনো ইচ্ছা থেকেই একদিন আবার রজত চলে গেল শহীদ মিনার লাগোয়া সেই বাগানের কাছে। আর, আর কোনো মূল্যবান জিনিস তার সাথে রাখল না, গোনাঙ্গতি সামান্য টাকা সঙ্গে রেখে নিল।

শহীদ মিনারের আশপাশে ঘুরতে লাগলো রজত। গার্ডেনের এদিক ওদিক বাইরে লক্ষ্য করতে লাগলো। তখন স্পষ্ট দিবালোক ছিলো, ওই দিনের মত সন্দেয়ের কাছাকাছি সময় নয়, জোড়ে জোড়ে ছেলে মেয়েরা বাগানে ঢুকছে, বের হচ্ছে। এর মধ্যে কি আছে সেই মেয়েটি যে তাকে বলেছিল অজয়দার অভিনয় করতে!

রজত লক্ষ্য করে দেখল, গার্ডেনের এক কোণায়, বাইরের দিকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে এক মহিলা এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। কে জানে, ওদিনের মেয়েটি হবে কি না? রজত তাকালো মহিলার দিকে, না, সে চোখ সরিয়ে নিল, রজতের দিকে চাইবার উৎসাহ দেখাল না। তার মানে, এ মহিলা সেই মেয়ে হতে পারে না। আর এক জায়গায় রজত খেয়াল করল, বাগানের বাইরে, গেটের একদিক থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, মনে হল গার্ডেনের ভেতরে যেতে তার ইচ্ছা নেই। চেহারা-আকৃতিতে মনে হলো সে হলেও হতে পারে। রজত আরও কাছে গেল তার, মেয়েটির থেকে হাত-দশেকের মত দূরত্ব নিয়ে দাঁড়াল। বাইরের দিকে মেয়েটি কম তাকাচ্ছে। গার্ডেনের ভিতরের দিকে যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ ভেতরে ঢুকছে না। তবে কি ভেতরে ঢুকতে সে ভয় পাচ্ছে! রজত ভেবে নিল, এই সে হতে পারে, চন্দ্রা আর

তার সাথের গণিকা মেয়েটিকে তার ভয়, আবার যদি তারা গলাধাক্কা দিয়ে, চুলের মুঠি ধরে বাগান থেকে তাকে বের করে দেয়! এমনি সময় মেয়েটি রজতকে লক্ষ্য করল, তারপর দু'তিনবার তাকাল, তৃতীয়বার চোখাচোখি হতে রজত সাহসে ভর করে এক পা দু'পা করে ওর দিকে এগোতে থাকল। অনেক কাছে এগিয়ে গেল রজত, মেয়েটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

মেয়েটি মৃদু হাসল রজতের দিকে তাকিয়ে, তারপর বলল, কাকে খুঁজছেন আপনি?

কি বলবে রজত একটু সময় চুপ থেকে ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ, মানে – আপনিও কি কাউকে খুঁজছেন?

মিষ্টি হেসে ও বলল, হ্যাঁ, কোনো বন্ধুকে।

রজতের এবার খেয়াল হলো, হ্যাঁ, এ কঢ় তার পরিচিত মনে হচ্ছে! ও সাহস ভরে বলে উঠল, আচ্ছা আপনার সঙ্গে কি আমার গত পরশুদিন আলাপ হয়েছিল?

--আপনার সঙ্গে! বলে ও কিছু সময় চিন্তা করল।

--হ্যাঁ, আমার নাম অজয়, অজয়দা, নামটা আপনি দিয়ে ছিলেন, রজতের বন্ধু ধারণা এ সে না হয়ে পারে না – মেয়েটি তার রোজকার নাটকের মাঝখান থেকে অজয়দার নাটকের সংলাপ সুরণ করে উঠতে পারছে না, আরও পরিষ্কার ভাবে মনে করিয়ে দেবার জন্য বলে উঠে রজত, আপনাকেই তো দু'টো মেয়ে গার্ডেন থেকে বার করে দিয়েছিল!

এবার মাথা নাড়ল মেয়েটি, আচ্ছা আপনি ছিলেন সে দিন! সেই বোকা বোকা কম কথা বলা ছেলেটা! মেয়েটি এবার প্রাঞ্জল হাসল, রজতের আরও একটু কাছে এসে দাঁড়াল।

নিজেকে সংযত করতে পারলনা রজত, বলে ফেলল, চলুন না, গার্ডেনে ঘুরে আসি একটু সময়।

মেয়েটির মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল, না, গার্ডেনে না, চলুন আমরা গার্ডেনের বাইরে, রাস্তা দিয়ে হাঁটি।

কেন যেন রজতের ওকে আজ বড় আপন বলে মনে হচ্ছে, আপনার নাম জানতে পারি?

--নাম! বলে, ইতস্তত করে বলল, রূপালী।

--না, আপনার নাম রূপালী বলে মনে হয় না।

--কেন?

--আপনাদের তো হাজারটা নাম, রজত বড় স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে চলেছে।

--কিছু ভেবে নিয়ে মেয়েটি বলল, অরূপা, সত্যি আমার নাম অরূপা, আর আপনার নাম?

--অজয়, রজত চট করে উত্তর দেয়।

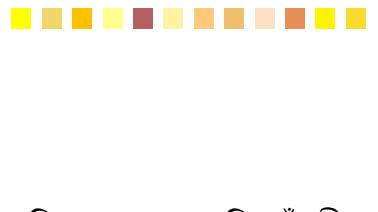
--বা, আপনিও বানানো নাম বলে দিলেন! অবশ্য বলার ইচ্ছে না থাকলে থাক, বলতে হবে না, আমি না হয় অজয়দা বলেই ডাকব।

--থাকো কোথায় তুমি? রজত নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সে কখন আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে! তবু সামলে নেবার চেষ্টা করল, সরি, তুমি বলে ফেললাম!

--ভালো লাগছে, আমিও অভিনয়ে না হয় আপনাকে তুমি ডাকব, বুরোছ! কেমন চোখকে প্রেমিকার মত ঈষৎ নাচিয়ে উঠলো অরূপা।

--ঠিক আছে, কোনো আপত্তি নেই, হেসে বলে রজত।

রজত থামল এক জায়গায়, দু' ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনে নিল। অরূপার হাতে এক ঠোঙা দিয়ে, নিজে একটা নিয়ে প্রেমলাপ করতে করতে ওরা হেঁটে চলল বেশ সময় ধরে। আস্তে আস্তে রাত বাড়তে লাগলো, অরূপার হয়তো ঘরে ফেরার সময় হয়েছে।



--অরংগা, ঘরে ফেরার তোমার সময় হল, না?

--হ্যাঁ, রাত হয়ে গেল।

--তুমি কোথায় যাবে অরংগা, মানে তোমার ঘর কোন দিকে?

--আমাদের লাইনে, কিছুই সত্যি বলতে নেই, তবে অজয়দা, আমি সত্যি বলছি তোমায়, আমি চাঁদনী
মার্কেটের দিকে থাকি, এখান থেকে কাছেই, একটা বস্তী বাড়িতে।

--আমি বেহালা, পর্ণশ্রী থাকি, কাকার বাড়ি, বেহালা কলেজের পাশেই।

অরংগা কিছু ভেবে নিয়ে বলল, তা হলে বিদায় নিতে হয়!

--হ্যাঁ, চল আমরা বাড়ি ফিরি। পকেটে হাত তুকালো রজত, পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করল,
দেবার জন্য অরংগার দিকে হাত বাড়ালো।

অরংগা কি ভেবে থমকে দাঁড়াল, রজতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আজ নয় অজয়দা, অন্য একদিন।

আজ তো সত্যিকারের বন্ধু হয়ে ঘুরলাম, আমার অভিনয় আজ অভিনয় হয়ে উঠতে পারেনি।

--তা হয় না অরংগা, তোমার সংসার আছে, হয়তো স্বামী ছেলে মেয়ে...

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রজত। মাঝখানে অরংগা বলে উঠলো, না, অজয়দা আমি অবিবাহিতা,

আমার মা আছে, এক ছোট ভাই আছে, মা আমার বিছানায় শয্যাশায়ী...

--তোমার টাকার খুব প্রয়োজন অরংগা, রাখ এটা, রজত আবার এগিয়ে ধরে টাকাটা অরংগার সামনে।

--না, অজয়দা আজ নয়, আজ তোমার কাছ থেকে কিছুতেই টাকা নিতে পারব না।

--আবার কবে দেখা হবে অরংগা?

--মন থেকে চাইলে কোথাও না কোথাও কখনো না কখনও ঠিক দেখা হয়ে যাবে অজয়দা!

উভয়ের নীরবতায় কেটে গেল কিছু সময়।

--আমি আসি, বলে অরংগা কয়েক মুহূর্ত রজতের দিকে তাকিয়ে থাকল, মনের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়ল
তার, ঘরে ফেরার তাগিদে এগিয়ে গেল রাস্তা ধরে, আর পরক্ষণেই ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

রজত দেখেছিল, অরংগার চোখের কোণদুটি জলের আভায় চকচক করছিল, কেন যেন মনে হয়েছিল

নিজের আসল নামটা অরংগাকে বলে দেয় সে। সময় আর সুযোগের অভাবে তা আর বলা হল না।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে, রজতের মনে আজও সে কথা সুন্তি হয়ে থেকে গেছে।

সূতি

অভীক দাস

নারকেলতলার মাঠে গাদা লোক জমেছে।
 সাপুড়েরা ঝাঁপ ফেলেছে একে একে,
 মাঠ যেন থই থই।

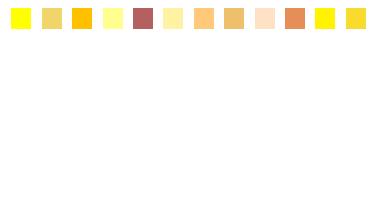
বালিকার সারির মধ্যে আমার চোখ খুঁজেছে
 চেনা একজোড়া নরম চোখ,
 শান্ত দীঘিতে মীলপদ্মের মতো ফোটা,
 কাঠবেড়ালির মতো লাফিয়ে ফেরে আমার চোখের উপর...।

কেমন করে পাবে?
 নাতিটা এসে বায়না ধরল
 “দু’টাকা দাও, সাপ খেলা দেখব।”

ক’টা পদ্ম পেরেছি তুলতে।
 ইশকুল যাবার পথে,
 ঢাল বরাবর দীঘিতে নামতে নামতে
 প্যান্টুল গেছে ছিঁড়ে, বাবলা কাঁটায়;
 বড় ভেজা ভেজা, চুইয়ে পড়ছে সরু কাঁটার
 মতন পাট পচানি জল।

পাঁকে পোঁতা পা, তার মস্ণ গন্ধ বেয়ে
 লাফিয়ে উঠে আসতে চাই
 চোরাবালি থেকে...।

সত্যি, একদম খেয়াল থাকে না বয়সটার।



আষাঢ় আকাশলীনা

মাৰা-আষাঢ় এলেই আমাৰ ঘৰেৱ ভিতৰ
জেগে উঠত আৱ একটা ঘৰ,

সে স্বপ্ন।

প্ৰথম বৰ্ষায় ফুটত বেল, ঝুই, কামিনী,
শ্ৰেতগৰ আৱ বিলেৱ জলে শালুক,
বাদল দিনে মেঘলা আকাশে মন-মাৰি নৌকা নিয়ে
উজানে ভেসে যেত জলেৱ দিকে চেয়ে।

জোলো বাতাসে স্কুল ফেৱৎ নীলপাড় সাদা শাড়িৰ আঁচল
দীৰ্ঘ থেকে দীৰ্ঘতৰ হয়ে উড়ে যেত দূৰ দিগন্তে।

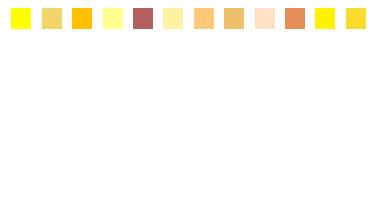
ও-আঁচল একসময় আপনিই ফিৰে আসত কাছে
কোমৱে গুঁজতে গিয়ে দেখা –

সে মাথায় বৃষ্টি আড়াল কৱেছে ওই আঁচল টেনে
শোল বছৰেৱ লজ্জা চোখে, নীচু মুখে
আন্তে আন্তে টানা আঁচল বৰ্ণাৰ মতো
নেমে আসত চোখ, নাক, ঠোঁট বেয়ে। জলে পা দিয়ে
একছুটে পেৱিয়ে যেতাম ইঙ্কুলেৱ ডাঙা।

সে জোলো হাওয়াৰ সাথে ছুটে আসত পিছন পিছন
আৱ বলত – “আকাশ একা যাস না,
মাঠেৱ জলে ঢোঁড়া সাপ আছে, আমাৰ হাত ধৰ,
নইলে পড়ে যাবি পা পিছলে।”

কাদা-ঘাস ঢাকা আলপথে ধানগাছেৱ
গা ছুঁয়ে, সদ্য যৌবনে পা দেওয়াৰ অনুভূতি নিয়ে
দু'হাত এক হয়ে জল ছিটিয়ে হাঁটা।
তাৱপৱ ও একদিন হারিয়ে গেল ভৱা স্নোতে,
ধৰা গেল না।
কত বছৰ হলো খুঁজে চলেছি তাকে...

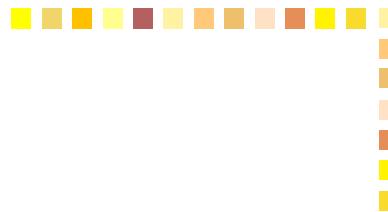
আজ তাৱ সন্ধান পোয়েছি।
সে অনেক অনেক জলেৱ তলায় আমাৰ দিকে চেয়ে আছে।
দ্বীপেৱ মতো ভাসন্ত তাৱ গায়ে
আমাৰ ছায়া দোল খাচ্ছে মেঘভাসি সুৱে।
আকাশেৱ ছবি চোখে নিয়ে
শেষ আষাঢ়ে এই ঘন বৰ্ষায়
আমাৰ সাথে ভাসছে নদীৱ জলে
নৌকাৰ পাটাতনেৱ নীচে।



বইছে

অমিত কুমার মাঝি

ছড়ানো-ছিটানো কাঠ-বাঁশ-লাঠি,
আর খড় বা টিনের আয়তকার জিনিস।
দড়ি-দড়া বা পেরেক আছে তাতে।
এদিকে-ওদিকে ছড়ানো-ছিটানো মৃতদেহ,
গন্ধ বের হচ্ছে না... খুব ছেট ছেলে
তার মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ছে... এক দল
কুকুর এসে তাকে ভাগাভাগি করে নিল।
অলিতে-গলিতে ছেঁড়া কাটা রমণীর লাশ,
বাসি নয়, টাটকা... কিছু দূরেই গাড়ির শব্দ—
পুলিশ আসার... জনতার চিৎকার শোনা যাচ্ছে।
মাঝেমাঝেই মিছিল-মিটিং-গাড়ির ছোটাছুটি...
আর রক্তপাত।
‘নতুন শক্তিশালী জাতি গড়ব’ — শুনছি মাঝেমাঝেই।
ভাবলাম, এসবের পরিবর্তন করতেই হবে।
রক্ত আমার গরম হয়েছে, চুলগুলো খাড়া।
এগোতে গিয়ে দেখি বিছানা থেকে উঠছি... ও, স্বপ্ন।
কিন্তু বাতাস বইছে বাইরে।

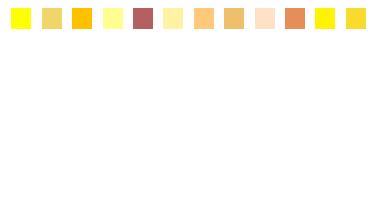


দীর্ঘতার শেষে

অর্ণব চক্রবর্তী

সূর্য এখন খর –
ক্ষয়া ছায়া পায়ের নীচে
বাতাসে পচা লাশের গন্ধ
দুপায়ে মাড়িয়ে যাওয়া
দিনে বহুবার আত্মকে।

রঞ্জিতার স্তবে চরাচর মগ্ন
হঠাতে এফ এমে ভাসা রবীন্দ্রনাথ...
শুন্দিতার তৈরবী ছুঁয়ে যাক
পোড়া সব হৃদয়কে।



পাখি হওয়ার গল্প

বন্দনা মিত্র

মা, সেই যে মেয়েটি পাখি হতে পারত, তার গল্প বল না।

- শোন তবে, এক যে ছিল মেয়ে, তার ছিল দুই ডানা।

কখন কিভাবে যেন পাখি হওয়ার বর পেয়েছিল সে,

যখন খুশি উড়তে পারত না দেখা ডানায় ভর করে

কেউ জানতে পারত না।

ডানাদুটো কেউ দেখতে পেত না বুঝি? লুকোনো থাকত?

- তাছাড়া কি? সেটাই তো বর পাওয়ার মজা।

ভোর বেলা যখন ময়ূরকষ্টী রঙের আকাশে লাল সুতোর আঁকিবুঁকি

সে ঘুম থেকে উঠে দাঁড়াত ছাদের আলসে ধরে

উড়ান দিত সবার অলঙ্কৃত্য

উড়ত যতক্ষণ না কেউ ডাক দেয়

- হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়, কাজকর্ম নেই?

পাখি নেমে আসত ভুঁয়ে।

সারাদিন রান্নাঘরে ধোঁয়ার আলপনায় ঘামতে ঘামতে

অফিসের ছোট ঘরের দমবন্ধ দেওয়ালে

ভাঙা চুনবালির কারুকাজ দেখতে দেখতে

ভৌড় বাসের অসহ্য গরমে এক অচেনা চেনা মুখ খুঁজতে খুঁজতে

সে অদৃশ্য ডানা মেলে ঘুরে বেড়াত।

তার খুব দুঃখ ছিল বুঝি মা?

- দুঃখ কোথায় – তার তো ভীষণ সুখ।

আকাশে উড়লে মানুষ ছোট পুতুলের মত লাগে।

নীচের কর্কশ চিঢ়কার ফিসফিস কানাকানি

কিছু শুনতে পাওয়া যায় না।

পাখির মনেই পড়ে না মাটিতে তার বাসার কথা।

তারপর কি হল মা?

- তারপর... তারপর একদিন সবাই মিলে তাকে খুব বকলো

কেন সে থেকে থেকেই খাঁচার দরজা খুলে আকাশে উড়ে যায়?

এটাতো নিয়ম নয়।

একটা বিরাট কাঁচি নিয়ে তার ডানাদুটো কেটে দিল ওরা।

সে মেয়ে আর পাখি হতে পারত না।

তারপর – মা তারপর?

- ডানাদুটো তুলে খুব যত্ন করে রেখে দিল সে।

মাঝে মাঝে রোদে দিত, যাতে মরচে না ধরে।

তারপর তার ছোট মেয়ে একদিন যখন তার আঁচল ধরে বসলো গল্প শুনতে,

আন্তে আন্তে ডানাদুটো বার করে তার পিঠে জুড়ে দিল।

মেয়েটাও কি পাখি হয়ে গেল মা?

- সে কথা তো তুমি বলবে মা!

ডুবসাঁতার

দীপা পান

প্রস্তুতিঃ

আমি গভীর মেঘেদের দিকে চেয়ে চেয়ে
 ক্লান্ত কামনায়।
 বহু দূরের প্রিয় কোনো জায়গা থেকে ধীরপায়ে
 ফিরে আসার পর ঘামের রেণুর মত ঝিয়মাণ
 গোপন গ্রস্তির দ্বারে...
 আজকে আমার ঢোখ টেনেছে শুকনো একটা নদী
 কার ক' ছটাক রোদ পড়েছে ভাগে
 কার ক' মুঠো বালির মত শোক –
 হিসেব কষে না-জন্মানো টান
 আর আমি ওই নদীর সাথে মিশে
 স্নোতের জন্য খুঁজতে থাকি আলো
 বৃষ্টিভারে শরীর ভাঙার স্বপ্নে লিখতে থাকি
 বিষাদমোচন সংলাপ...

উৎসবঃ

আর যখন গিরিখাতের ঠিকানা পেলাম
 জলের শব্দের উপমা মাখে নি
 পোষাক খোলার গুঞ্জন,

ক্লান্ত রঙ্গন তখন বেশ চনমনে
 একটু একটু মনে পড়েছে গতজন্মের রঙ,
 ব্রাশ ও বালতির ঠিকানা

তারপর ক্লান্তিতে হাতপাখা—

খসে যায়

কোথায় তলিয়ে যায়
 জানিনা!

সেখানে

জলের মধ্যে জলের সেতু সুঠাম – উচ্চকিত পেশী

সেখানে

আকাশের প্রতিবিম্ব উদ্যাপন করে ডুবসাঁতার...

এবং তারপরঃ

তারপর ডুব দিয়ে জেনেছি জল কতটা গভীর
 কিংবা ঢেউয়ের বিস্তার কতদূর
 আবার সাঁতরে ফিরে এসেছি ঘাটে
 প্লবতা চর্চার উৎসাহে।
 প্ল্যাক্টনের উদ্বীপনার অবশেষরূপে
 তুমি...

আসলে ফেরিঘাট;

জলের গভীরতা মেপে সংরক্ষণ করেছি তথ্য
 অসংখ্য রাত ফুরিয়ে গিয়েছে শুধু,
 অন্বেষণের উত্তাপ আল্পনা এঁকে দিচ্ছে
 মাছের ঠোঁটের বুদ্বুদ।



কবিতা লেখার ইচ্ছে

জ্যোতিষ্ক দণ্ড

লেখার ইচ্ছে কেন হয়, সে নিয়ে আর ভাবিনা আজকাল, ভয় করে ওরা জেনে যাবে, তাও লিখি – লেখা শুরু
করার আগে, মাঝে মাঝে নিজেকে বড়ো নয় মনে হয় আমার সমস্ত জ্ঞান কবিতার কাছে, এক একদিন তাদের
ভয়ে আমি আলোর ব্রহ্মের দিকে পালিয়ে যাই, আর এক একদিন আমাকে লাখি মেরে পাঠানো হয় আমার
যতবৎসা শব্দের কাছে...

এক একদিন বাইরের আলোটা ওরা নেভায় না,
শব্দ গুলোও খুব আঠালো লাগে, জানলার কাঁচে কয়েকটা দাগের মতন
ক্লান্তি লেগে থাকে বিছানার ভাঁজে...

আমি উঠে বসি, নিজেকে কুড়িয়ে নিতে বেরিয়ে আসি

ডালপালা সামনে যা পাই জড়িয়ে,

আর আমার সাথে ঠিক তখনই দেখা হয়ে যায় একটা আশ্চর্য লাইনের

তাকে কুশল জিজ্ঞেস করি,

একটা চেয়ার টেনে দিই... এক ফ্লাস জল, হাতপাখা,

আজকের পত্রিকাটা আড়চোখে খুঁজতে খুঁজতে বলি,

‘উনি তো বাড়ি নেই, এই এক্সুনি বেরোলেন...

একটু বসুন’...

একটা খুব চেনা স্বর তখন আমায় খোঁজে ভেতর ঘর থেকে,

আমাকে বকে,

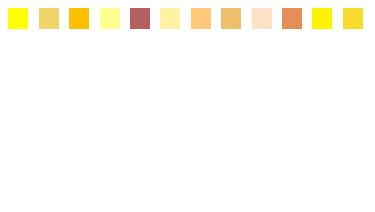
নাম ঠিকানা জানতে চায় ওদের,

আমি জিজ্ঞেস করবো ভাবি – সাহস করে একপা এগিয়ে দেখি,

সামনে সেই নরম বিছানা...

আর তার ভাঁজ ভাঁজ থেকে জোর করে মুছে দেওয়া আমার ক্লান্তি আর

কয়েকটা অন্ধকার...

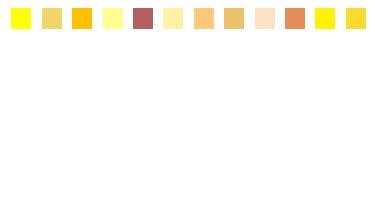


বিদায়

কৃষ্ণকুমার গুপ্ত

আমাদের আয়ু খুব সীমিত
পরিমিত সময়ের শেষ প্রান্তে উপস্থিত
আমরা দু'জন,
এখন শেষ হয়ে যাবে ফুলের ভ্রাণ,
কচুপাতার চরম সবুজতায় উপস্থিত
এক ফোঁটা টলটলে অশ্রু।
সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে আজ
ভীষণ মলিন আগামীকাল
আর দেখা হবে না কখনো,
আগামী কখনো আজকালকার মতো
জড়িয়ে থাকবে না হৃদয় জুড়ে,
সেখানে হয়ত অন্য নারী
অন্য স্বপ্ন, অন্য সকাল দুপুর।

সময় রঙ মাখে গায়ে
প্রতিনিয়ত চক্রকার এই আবর্তনে
আমরা বারবার আসি
হাসি কাঙ্গায় বেঁচে থাকি আর
অনায়াসে বলে দেই, বিদায়।



কবিতাগুচ্ছ

ময়ূরী ভট্টাচার্য

অপারমিতা

চিলেকোঠার চড়াইটা তার সপসগে ভিজে ডানাতেও উষ্ণতা খোঁজে
যদিবা অন্ধকার ঘরে ঘুলঘুলির আলোতেই ভোর হয়
অপারমিতারা দূরে টুপটুপ জোনাকির সবুজ আলো হয়ে জ্বলে
জোনাকিদের ভালোবেসে পাগল সাঁতারু

হেমন্তের শীতভাঙ্গা নদীতে ডুব দেয়
হয়ত, রাত থাকতে থাকতেই কারো মনে
কোথাও প্রেরণা জ্বলে উঠবে।

এক চিলতে

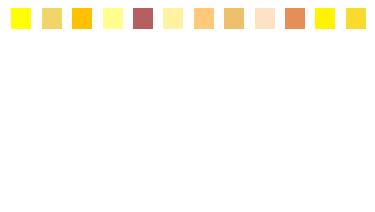
এতটুকুও ফাঁক রাখিনি
মধুকোড়ের তো পাত্র আছে
নিঃস্বের দুটো হাতই শুধু সম্ভল
তোমার সামনে যদি উজাড় করি
আমায় করণা কোরো না
রাশি রাশি চাই নি তো
যদি পারো দু-এক পশলা হেলায় দিও ফেলে
সুবর্ণরেখার জল ছেঁকে ছেঁকে স্বর্ণকণা জমায় যারা
তার চেয়েও যত্নে রাখতে পারি
তোমার মুখের এক কণা হাসি।

বিমুখ

তোমার অহেতুক নিষেধ আমি মানছি না শঙ্করপ্রসাদ
প্রচণ্ড খরার দিনেও আমি নদী সাঁতরেছি
তোমার নিষ্ঠুর অবহেলা আমায় ব্যথা দেয় না—
যত বেশি এড়িয়ে চল তুমি
জানি, নিজের অজান্তেই তত গ্রহণ কর আমায়।
নির্বাক সাক্ষাতেও ছুটি নেই তোমার;
তুমি জানো না, কে যেন অনর্গল
কথা বলেই চলে, নিভৃতে — তোমার সাথে।
সে তুমি যতই বিমুখ থাকো না কেন!

মায়া

তোমাকে কখনই কোমল মনে হয় নি।
বারবার খুঁজেছি — ধরা দাও নি।
আমার বিনিদ্র রাতে ছায়া হয়ে আসো নি কখনও।
আমার তপ্ত কপালে কখনও ক্ষমার হাত রাখো নি।
কিন্তু কী অস্তুত দেখো আজ অনেক দূর থেকে তোমাকে অন্যরপে দেখছি।
তোমার কোমল গন্ধের শরীর মায়ার আঁচলে ঢেকে দিচ্ছে সব কিছু।
আমি হারিয়ে যাচ্ছি।



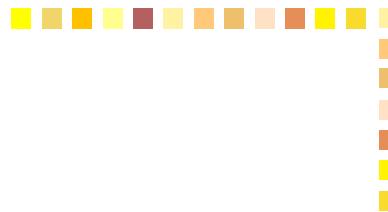
এই আমি সরে দাঁড়ালাম রমিত দে

হয়ত দেখা হবে
যা হবার হোক
জামাটা গলিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেই
ভুলে যাব অ্যাশট্রেতে একগাছা চুল,
রীতেশের চোখ চুল আমি বুবাতে পারছি না
বুবাতে পারছি না ঠিক কত স্কোয়ার ফিট-এ ছড়িয়ে রয়েছে
আমার হাড়গোড়-মৃত্যু-প্রেম...
আমার খিদে পায় খুব ঘুম পায় খুব কান্না পায়
তবে কিছুই পাচ্ছে না;
মেঝেময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটা কড়ে আঙুল
কয়েকটা চোখের পাতা
ঢকচক করে এক প্লাস জল খেয়ে
ডাইলিয়াট করে নিছি পচে যাওয়া ৩৪ টা বছর
আর আইনঞ্চে তুমি আর রীতেশ
আর কোন জামরুল গাছ নেই
গাছ ভর্তি বাড়ি একটাও দরজা নেই
এই অনেকটা দিন আমরা সবাই কেমন
কাটিয়ে দিলাম হাত নেড়ে নেড়ে
পাশের লোকের থেকে সিগারেট চেয়ে
হাতঘড়িটার ওপর সন্তাব্য শেষ ঘামটুকু ফেলে
এই শ্বাসকষ্ট আর মাথাধরা নিয়ে হাওয়াজলে
কাটিয়ে দিলাম কেমন

এসব জেনে তোমার কি হবে?

সমস্ত স্পর্শতো আমি রেখে এসেছি খালি জুতোর বাল্লে
উঁকি মারছে স্নায়, খসে যাচ্ছে আলজিভ
এই দুপুর এই রাত্রি এই আমি

সরে দাঁড়ালাম নিরক্ষর দ্বিধার পাশে
উড়ে যাও উড়ে যাও চিরটাকালের দিকে
আর আমি সবুজ আত্মার পেছন পেছন ছুটি



কালো বিড়াল

রামপ্রসাদ কর

এক আকাশ অন্ধকার মাথায়

নিয়ে বসে আছে একটা কালো বিড়াল

চারিদিকে গা ছমছমে নীরবতা

আর হাড় হিম করা অন্ধকার।

সেই কবে থেকে বসে আছে

বিড়ালটা, সমস্ত আলো নিভে

কেমন করে কালো কার্বনের

মতো অন্ধকার নামল

অফিস পাড়ায় – সব দেখছে সে।

বাতাসে ভারী পর্দা দুলে ওঠে

সিঁড়িতে কাদের আনাগোনা!

কাঁটা-চামচ আর কাপ-প্লেটের

ঝনঝন শব্দ,

করিডোরে পাতাবাহার গাছেরা

লজ্জায় শুকিয়ে কাঠ,

– কোনো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের

পদস্থলন হল বুঝি।

দমকা হাওয়ায় ঘরের আলো

এক এক করে নিতছে,

খোলা ফাইলের পাতাগুলো

সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে

উড়ছে, কে যেন

‘সৎভাবনা’ ‘স্বচ্ছতা’ ইত্যাদি শব্দ

লেখা কাগজগুলো বাক্সেটে

ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

একেবারে কোণের ঘরের

দেওয়ালের ঈশাণ কোণে খালি গায়ে,

খালি পায়ে, হাতে লাঠি, গোল চশমা পরা

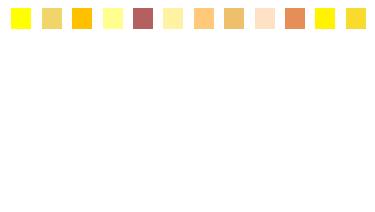
এক বৃন্দকে নড়েচড়ে

উঠতে দেখে বিড়ালটা

ভাবল এবার বোধহয়

তার চলে যাওয়ার

সময় এসেছে।



পরীক্ষা শেষের ঘন্টা

সৈকত গোস্বামী

অনভ্যাসের ভোর পাঁচটায় সেট করা
 মোবাইল অ্যালার্মের সুরেলা ডাকে
 পাতলা ঘুমের রাতটা শেষ হল।
 শেষ মূহর্তের রিভিশন, আরও কিছু
 টু-মাস্কের শর্ট কোয়েশন গলাধঃকরণ।
 কোনোটাই ছাড়া চলবে না
 হয়তো ওটাই আসবে।
 পাস কোর্সকে দিয়ে আসা
 সারা বছরের অবহেলা-সমূহের
 সম্মিলিত চোখরাঙানি
 ভুলিয়ে দেয় সময়ের টিক্ টিক্ পদক্ষেপ।
 কুড়ি মিনিট পিছিয়ে যায় স্নানের সময়,
 ‘খিদে বেশি নেই’-এর অজুহাত
 থালা থেকে কমিয়ে দেয় দু’টো রংটি,
 মিস্ হয়ে যায় ন’টা পনেরোর এইট-বি।

* * * *

কালো বোর্ডের বুক চিরে দিয়েছে সাদা চক
 রুম নম্বরঃ- ২২১
 আবার সেই আগের দিনের রুমটাই, মানেই
 আবার সেই ফাস্ট বেঞ্চে।

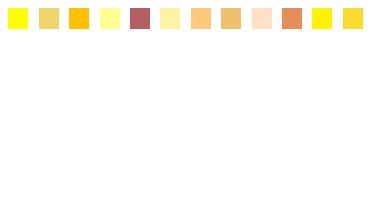
কোয়েশনপেপার এলো হাতে।
 লটারির রেজাল্ট দেখার মত
 হামলে পড়লাম।
 কয়েকপাতা উল্টেই
 হাত মুঠো করে কনুই ঝাঁকাই নীচে,
 ‘পুরো স্যারের সাজেশানটা!’

এর পরের তিনটে ঘন্টা

প্রায় সাত আট মিনিট ফাস্ট চলতে থাকা
 রিস্টওয়াচের কাঁটায় ভর দিয়ে
 সময় নিঃশব্দে যুদ্ধ চালিয়ে গেল
 সৃতিশক্তির সাথে।

* * * *

ওয়ার্নিং বেলের পাঁচ মিনিট পরের শব্দটা
 যদিও বহু বছরের পরিচিত,
 তবু আজ তা যেন বাজল
 অন্য কোনো এক সুরে।
 আজ ছিল ফিজিক্স সেকেন্ড পেপার, আজকে বাজল –
 পরীক্ষা শেষের ঘন্টা।



কবিতাদ্বয়

শশ্রুনাথ কর্মকার

একান্ত অলকানন্দা

১

চৈত্রের ক্ষেতে ফিরে আসে নরম নিঃশ্বাস
ছেঁড়াখোঁড়া শরীর আজ রাতের বিছানায় অলকানন্দা।

২

যা হ্বার দূরের অশ্বথ গাছের ছায়ায়,
অন্ধকার হয় কেঁপে কেঁপে ওঠে বাড়তি সংসার।

৩

একটাই প্রথিবী হাত নেড়ে বলে
তোমার সংসারের ছিপ ফেলে একটি পুরুষ।

৪

আগুন লেগেছে পাহাড়ের বাঁকে
পাথর ছড়িয়ে ভুলে যেও একলা ঘরে।

৫

ভুলে যাই আমার আকাশ কেমন আছে
আগুনে পোড়ো নি তো আমার অলকানন্দা।

স্পর্শ নিও

কেউ কেউ ঘরকুনো, রাতের ছায়ায় সজাগ থাকে
ভীষণ ভাবে শুনতাম –

যেমন বলেছিল সবাই, সূতি থেকে
হাতের মুঠোয় পুনঃসংযোগ, জলের প্রপাত
শুধু অরণ্যভূমির।

জীবনটা বিছিয়ে দেখেছো?

দুই হাতে চেয়েছো আগুনের সোহাগ।

জমা শ্যাওলায় বসেছে যে পাখি
দিনে দিনে বেড়ে ওঠে সে

তোমার নামের পাশে – নির্দেশ বসাতে বসাতে
পরশের সংকেত নিও।

নাড়ী

সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়

এবং তুমি ও আমি একই সমন্বয়ে
সমন্বিত যেহেতু, সংযুক্তভাবে এগিয়ে চলা
বোধকরি সেই কারণেরই জন্য।

অস্তিত্বে জর্জর, নানা ক্ষতমুখ নিয়ে
রক্তাক্ত নির্ভার বসে থাকা আমাদের।
খুঁজে পাওয়া লালাভ আলোড়ন
থেকে পার হওয়া নিষ্ঠন্তার পুকুরটি পর্যন্ত।

জীবন ও কর্মচিন্তন দুজনের
হাসপাতালে বসেই। হাতে ফল ও কঢ়ে
শুভেচ্ছা শুনতে শুনতেই।

বারোয়ারি অঙ্গোপচার থেকে সার্বজনীন
রক্তক্ষরণ ইতিহাসের হাতড়ানি তোমার, আমারও।
মর্গের পাশে দাঁড়িয়ে অমাবস্যার সূর্য দেখার অভ্যাস
এতদিনে জানা নিশ্চই?

অতীত ও ভবিষ্যতের ঠিক দুহাতে
মধ্যবর্তী অস্তিত্বের ঠিকাদারি –

অপেক্ষার খদ্যোত্পন্নখলে পাওয়া
প্রতীক্ষার নাড়ীতে দৈত অবিনশ্বর ভার।

আলোকবর্ষ বিশাস অতএব এই যে

দুজনের মধ্যে বসে জন্মান্ব দেখতে পায়।

সমর্পিতা

শিবকালী গুণ্ঠ

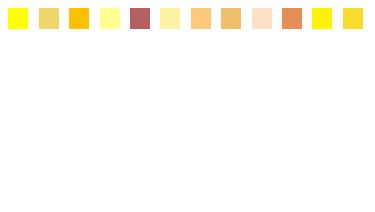
অন্ধকারের শামিয়ানায় আলোর বালর ঝুলিয়ে
 অন্ধকারের কথা কি করে বলি দীপাঞ্চিতা?
 তাও যদি জানতে চাইতে প্রতিফলিত রোশনাই এ
 আমার দুই জন্মান্ধ চোখ বর্ণন্ধ হয়েছে কিনা!
 জানি ইস্পাতসদ্বশ গালে ওই ধারালো লাল ঠোঁট দুটো
 যখন সমস্বরে বলে সমৃদ্ধির কথা,
 আমাকেও বলতে হবে
 তোমার এই আলোকমালায় সাজিয়ে নেওয়া
 চাওয়া পাওয়ার গল্প...
 মধ্যবন্তীয় উপাসনাকক্ষে গালিবর্জিত হিসাব খাতায়
 একা একা!
 সে না হয় বলে দেবো...
 বাতি ঘরের সেই আছড়ে পড়া
 দুর্দান্ত হাওয়াটার মত,
 এক একটা অভিঘাতে অভিনন্দিত করে
 তোমার মস্ত ঘোবনের স্টেপ জাম্প করা প্রত্যেকটি প্রমাণিত উপপাদ্যকে!
 যদি অন্ধকার থাকে ওই গলি পথে।
 এক হাত দিয়ে না হয় সরিয়ে দেব
 কেঞ্জের মত ঘিনঘিন করা ওই কটা স্বপ্ন মাস।
 শিথিল পেশীর ওপর ফুটে থাকা বিশ্বাসের জলছবিটা
 মুছে দেব সেই পাওয়া না পাওয়ার ন্যাতা হয়ে যাওয়া প্রশ্নে।
 শুধু অন্ধকার চাই।
 অন্ধকার চাই
 আমার উলঙ্গ শরীরের সবুজ থেকে যাওয়া বর্ণ জর্জরে!

...

উপায় নেই প্রিয়তমা।
 আলোর শামিয়ানা তলে রয়েই গেছে
 কচি জামের গন্ধ নিয়ে সেই বৃষ্টির কবিতা।
 রাস্তা পাশের বুনো ফুলটায়
 এখনও বারে পড়ে ধনুক হাসির সেই কুচো মুক্তো,
 মিশমিশে কালো তোমার শেষ চুম্বনে
 এখনও বেজে ওঠে আমার সেই বিসমিল্লা...

এখনও আছো সমর্পিতা, দীপাঞ্চিতা হয়ে!
 শেষ অন্ধকার না হলে কি করে বলি
 শেষ কবিতার কথা?
 আপাতত তাই আলোর কথাই রইলো।

(দীপাবলী, ১৪১০)



শিল্পী শিব সুদীপ্তি বিশ্বাস

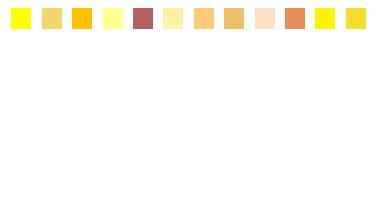
পাগলি আমি আঁকব তোকে
দে না আমায় রঙ আর তুলি
বন্ধ করু রে প্রলয় নাচন
ফেল্ না ছুঁড়ে মড়ার খুলি।

ছিঃ! ছিঃ! এ যে মুন্ডমালা !
এ মালা কি পরতে আছে?
রক্ত জবা বেশতো ভাল
ওটাই বরং রাখ্ না কাছে।

কাপড় পরে লক্ষ্মী সেজে
একটু এসে বস্ না পাশে
চুপাটি করে বসলে পরে
তবেই ভাল চিত্র আসে।

পাগলি আমি ত্রিশূল ফেলে
দ্যাখ্ না কেমন আঁকছি ছবি
আকাশ বাতাস পাহাড় এঁকে
এখন আমি উদাস কবি।

পাগলি আমি নাচব না আর
নাচব না আর প্রলয় নাচন
এখন শুধু রঙ তুলিতে
আঁকব জীবের মরণ বাঁচন।



কাঠের বাড়িতে, সুপ্রভাত

সুমন্ত পাল

আপনার মেল-এ ‘শিথিলায়ন’ শব্দটা বিজ্ঞানের পাতা থেকে উঠে এসেছে যেন
একবার এও মনে হল, এটা ‘আয়ন’ গোত্রের ইলেক্ট্রিক্যালি চার্জড় শব্দবন্ধ।
দুটো মনে হওয়াই ভুল, ডাহা ভুল
তাই এই শব্দের উত্তাস্টা এড়িয়ে যেতে পারছি না।

স্বপ্নের বাড়িতে প্রবেশটা শিথিল হবে...

এই ভাবনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মতো, অবাধে ছড়িয়ে পড়ার মতো।

সারাদিন ঝর্ণার জল এসে যেখানে ভাবনায় পড়ছে

আর ছিটকে যাচ্ছে একটু দূরে ডুবিয়ে রাখা পা দুটোর দিকে,

সেই গতি যেমন শিথিল...

কিংবা গতির শেষে স্পর্শের পাখা মেলে দেওয়া যেমন শিথিল।

এ বাড়ির বুনোটও শিথিল।

কারণ এটা কংক্রিটের বাড়ি নয়, কাঠের বাড়ি

প্রবেশপথে নয়, অন্দরপথের অদূরেই মুখচ্ছবি দেখার জন্য জলআরশি

কথামতো ছিটিয়ে থাকা আদিম, বহুবর্ণ নৃত্তি, ইত্যাদি

এদের সঙ্গে স্নানে স্নানে বেলা যায় না, বেলা মনোবিকলনের মতো নিশিত, স্ত্রি।

নিশিগঙ্কা আঁকা গালিচা, তাতে নৃত্তির সংস্থাপনও দেখুন, কেমন শিথিল।

তেতরে বাইরে এই দুই পথেই পঞ্চম সুরের আনাগোনা। পঞ্চম সুর অর্থাৎ পা।

সেই শুদ্ধ শরীরাঙ্গের সঙ্গে মানানসই হল –

দূরাদয়শক্রনিভস্য তন্ত্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।

এইমতো আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ে রাখা সেই আরও কাজল নির্জনতা

নির্জনতার তন্ত্বীরেখা, আদ্যোপান্ত শিথিল।

সেই শিথিল অয়নান্ত সঞ্চাত আবেশ, আবেশে অবরুদ্ধ এই সুপ্রভাত, আপনাকে!

কবিতান্বয়

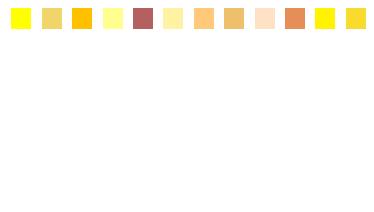
স্বগতা ত্রিপাঠী

স্বগতোক্তি – ১

শেষ বিকেলের চুইয়ে পড়া আলোয়
 শেষবার দেখেছিলাম তোমায়।
 সে বিকেল হারিয়েছে ঘড়ির কাঁটার সাথে
 আর আমরা হারিয়েছি চোরাওতে।
 আজ আরো একটা বিকেল
 ঘন নীল আঁধারে ঢেকেছে দুচোখ।
 এবার তোমায় চিনে নিতে ভুল করলাম।
 ক্ষমা কোরো।

স্বগতোক্তি – ২

রাজপথে ঐ কারা মার্চপাস্ট করে
 নীল পোষাকে।
 ঘননীল আকাশটাও আজ
 মৃত্যুরূপী।
 সদর দরজায় কড়া নাড়ার
 আওয়াজ।
 যেতে হবে এখুনি
 সব ফেলে রেখো
 একটু দাঁড়াও।
 কাউকে বিদায় বলতে হবে।



কেউ কথা রাখেনি

স্বাতী মিত্র

কোন একদিন –

ভাঙ্গা কলসীর মত চাঁদখানা

কুয়াশার ওড়না সরিয়ে

উঁকি দিয়েছিল;

বলেছিল –

সব ঠিক হয়ে যাবে,

কোন চিন্তা কোরো না;

এই শহর একদিন ঠিক

কল্পলিনী তিলোত্মা হবে।

কিছু ঠিক হয় নি। –

বারোভাতারি হয়ে

শহরটা আজ চরিত্রাইন।

দুপায়ে তার মরচেধরা শিকল,

প্রসাধনহীন দুটি চোখে

মরা মাছের দৃষ্টি,

সর্বাঙ্গে দূষিত রোগের জীবানু,

কুৎসিত অবয়বে ক্লেদান্ত দুর্গম্ব।

ছিঃ!

আর একদিন –

সূর্যবিহীন ঐ দিগন্তে

আলোর মানে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত

নাম-না-জানা এক অচিন পাখি

ঠিক করল –

ভোরের ঠিকানা খুঁজে তাকে পেতেই হবে,

ছোট দুটি ডানায় সাহস বেঁধে

এই আঁধার তাকে পেরিয়ে যেতেই হবে;

অন্ধকারকে তার যে বড় ভয়।

চাপ চাপ অন্ধকারের তটভূমিতে

অজ্ঞ ঢেউয়ে আছড়ে পড়া সমুদ্র

শিস দিয়ে গান গেয়ে উঠেছিল;

বলেছিল –

ঠিক পৌঁছে যাবে।

অন্ধকারের বুক চিরে তাই

ভীরু পাখায় উড়ে যায়

সেই ছেট পাখিটা –

শুধু আলোর আশায়,

আর ভয় পাবে না বলে,

দিগন্তের ওপারের নিশানায়।

প্রহরের পর প্রহর ফুরায়,

দিন যায়, মাস যায়,

চতুর্থ পাখনায় ক্লান্তি নামতে চায়;

তবু যতদূর চোখ যায়,

মিশমিশে আঁধারের কালিমায়

কলঙ্কিত সমুদ্র নিষ্ঠরঙ, –

কোন সুনামির অপেক্ষায় কি?

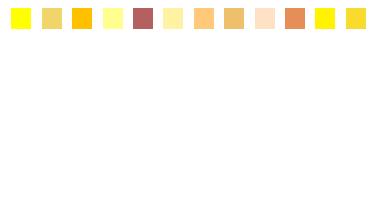
ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারের প্রতিশ্রূতিতে

আর ভোরের আলোর তুলিতে আঁকা

সুদূর দিগন্তের মায়াবী কিনারা

শুধু অলীক মরীচিকা হয়ে

দূরে, আরো দূরে সরে যায়।



কবিতার পাঁজি লেখা?

তাপস ক্রিণ রায়

শব্দের খোলসে অর্থহীন কবিতার পাঁজি লেখা?
মন ভাঙ্গ খেয়ালের তর্জমা খুঁজি শব্দকোষ ঘিরে!
তুমি আগুন জ্বেলে শান্ত হও না কেন?
শিশুদের নামতা ছড়া ভেঙে দেওয়াল লিখন জোড়া
ঘুম ছাড়ানি গান বাঁধে
বনের সিংহাসন খালি করে লোকালয় খোঁজে ভাঁড়!
একাদশীর চাঁদ খোঁজা পাগল
আঙুলে কবিতা লেখে সপাট বালির উঠোনে
কোঁকানো অসহায় হৃদপিণ্ড ছেঁড়ে শিশু
দুধহীন মায়ের বুক চাটে
সে পাগল ঝাড় দেয় সমস্ত হাট বাজার
রক্তশিরা সবুজতা ছেঁড়ে ছোটে সরু নদীর ঝাঁক
পচা মাংসপিণ্ড হাঁটে, চলে
চুলকুনি গা বাওয়া রক্তের সুখ রাগে
মস্তিষ্কের কিলবিল পোকাগুলি
মাঝরাত ভেঙে কবিতার লাইন পড়ে।

Hope

Aniruddha Sen

Never a poet, I opened my account yesterday.

When I look through my apartment window, it's a heap of rubbles beneath. Weeks before, there was a grassy patch there, with sprinkles of wild flowers. They're gone, now that a parking lot is coming up. Well no – today I saw some red and green shoots, sprouting up from a corner.

And that stirred up the unthinkable in me – I penned down my poetic tribute 'Hope'.

The first person I wanted to confide to was my poetry guru, Sumeet. Till the other day we would sit in the coffee house and discuss all hues of poetry, from Pablo Neruda to Joy Goswami over cuppas. Our housemaid, Radha, as usual, was cursing the sparrows while cleaning up the twigs and straws accumulated by them on the window sill. Signaling her to tone down, I dialed my pal.

"Hello Sumeet, I wrote a poem at last!" I triumphantly announced.

"Wow – I knew you'd finally make it!" He said, in cheerless monotone.

"In case you're interested –" I eyed my masterpiece sheepishly.

"Well, I'll call back later," he mumbled. "Have to rush to the office now."

"S-o-o soon?"

"Yeah – this bloody recession, you know! The company is downsizing and you're never sure about your ass." He sounded despondent.

Good bye hope – at least for now.

Still buoyant, I dialed my sister Rinku, my ardent fan until her marriage.

"Hello sis, what's up?" I started cautiously.

"N-nothing. Just fine."

"What's that? Were you crying?"

"N-no, what made you think so?"

"Come on, Rinki!" I pointedly asked, "Did he... beat you up again?"

"*Beat you up again!*" She mocked, "Need I repeat? Dead drunk, as usual."

"May I come and –" I was fuming.

"You may not!" She interrupted. "You've done your bit – have secured a prosperous groom for your sister. The rest is her destiny."

"But can't I –"

"Help? Sure – Keep mum! Let dad and mom have no inkling," she snapped and hung up.

So my 'hope' had another rebuff! God – is it so impossible to convey the message of the sprouts – that life is not a lost cause and there's light at the end of tunnel?

Well – how could I have forgotten Priya, my sweetheart! Never mind she's not a poetry buff, my words would for sure find a reverberation in her sensitive heart.

"Hi darling, couldn't see you for some time – how're things?" I asked. I could hardly wait to hear her cherished voice, after eons it seemed.

"Fine." She was rather circumspect in her reply, "What's new?"

"Wrote a poem on hope – want to hear?" I blurted it all in one go.

"Great – but will hear it in person, when I call on you tomorrow evening."

"Coming tomorrow?" I could hardly suppress my excitement.

"Yeah, to invite you. I'm marrying my boss."

"Don't say! He's thirty years older than you are!"

"Yeah – but rich and understanding. I always fought shy of telling you I've a brother in asylum and a senile mother, both my dependents. He'll now take care of that."

"Can't do it to me!" I wailed.

"True, dear – I can't kill a sensitive and creative soul that's you with my albatross. Well, looking forward to meeting you and listening to your poetry tomorrow. Bye."

Time froze. When I came back to myself, I found the piece of paper, my 'hope', soggy with briny drops. I lifted it affectionately, shredded it into pieces and consigned it into the waste paper basket.

It's morning. I woke up amidst chirping. The sparrow couple is busy filling the window sill with shreds of my 'hope' – in their untiring quest to build a nest.

A Time to Love

Barnali Saha

At the onset of a romantic life, a couple usually experiences a strange kind of dumb animal love. A sort of love that lives and breathes with them and there is no running away from it. For many, such love, as is felt by the turtle doves in the initial stages of romance, more often than not leads straight to the altar – and that is just the beginning of a fairy tale with highly complicated plots and subplots to be presented to the protagonists in the later years of the married life.

In a majestic outburst of jubilation and in the presence of hundreds, the bride and the groom share their 'I do's, hoping that the walk down the road to happily ever after would be a cakewalk. Immediately after the wedding, the couple's love is usually fuelled by a shared sense of insecurity and hopelessness. Still caught in the wedding tizzy, they are apt to experience a medley of confused wishes, desires and future aspirations that bring home the idea that life without the spouse is implausible, if not impossible altogether. Such emotions deepen the already deep bond of love and bind the two protagonists by a knot of a satin ribbon that might in the commoner's eye seem to last forever.

But 'forever' is a dangerous word when love is concerned, for when romance becomes routine and habits occupy the somewhat drained compartments of affection, animal love corrodes and is replaced by prudence in general. Under such circumstances, a couple is prescribed to spend a good amount of their day recalling the happy memories of the past, and thereby, constantly remind themselves that they are still in love. In course of the connubial life, there often comes a period of considerable misery and mental pain, a condition termed by shrinks and marriage experts as the 'seven-year itch' – in reference to the extemporaneous appearance of the symptoms of this malady around the seventh year of marriage. Couples that survive this mysterious disease usually finish writing the epilogue of their romance in fine hands. And those who fail to adroitly handle the situation and end up exhuming skeletons of the past are torn asunder.

And if a bond of love is broken at a mature stage of life, it is broken for good. Couples separated by this malady are extremely vulnerable. Once split, they either try their best to find a new partner or accept solitude, frozen food and maudlin soap operas. Those who try to interest themselves in new romance habitually find themselves attracted to people who are either very much like their ex-partner or a totally different from them. These people, mind you, are a very sensitive bunch and are forever debating in their minds whether diving into a new romance is feasible at all, since such an action is always accompanied by the caveat of a fresh heartbreak. But then risks are meant to be taken and no two people are alike. And there, my friend, lies the dichotomy of the situation. When the confused bunch of newly split couples is presented in solid terms the prospect of a new matrimony, they, in a great number of cases, start flashing in their mind's eyes experiences of their past relationship; and when I say experiences, I mean the bitter ones, of course, for human mind tends to brood more over distress rather than happiness. So, when they start refreshing their old memories they end up digging out the inequities that led to the severance of their old relations. A moment of

truth dawns on them, and they cringe away from new romance leaving their prospective partners clueless and distraught.

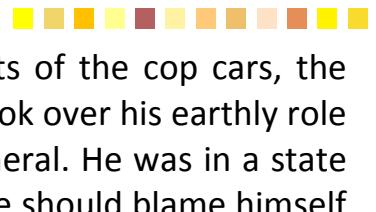
In Mark Edwards' case, however, the heartbreak and separation was not the result of the seven-year itch; it was a fatal car crash that tore him and Lisa, his wife, apart. He was not with her the time the ominous incident occurred; he was at home sitting in his plushy armchair brooding over the things Lisa had said to him during the course of an altercation they had in the morning. She was angrier than usual having found Mark talking to his ex-fiancée, Isabelle. There was an unusual vigor in her words that day and Mark found himself reduced to ashes when he was accused of being a spineless and characterless bloke among other things. Lisa had a peculiar character: happy and gay at one moment and throbbing with anger very next. She was a strange and vague girl; she seldom could make her own decisions, leave alone be independent, but she was high-strung emotionally. When Mark, in the heat of the moment, accused her of being a perennially spoiled girl and suggested that she visited a shrink, she just flew out off the handle. A distressing situation arose and a number of china was smashed. Mark's Blackberry was trampled upon and destroyed. All for the simple reason that Isabelle needed a word of advice regarding the setting up of an online craft shop at a website. She refused to listen to Mark and left the house, shouting with rage.

Mark stayed home that day. In no mood to face his colleagues at the school all beaming with *joie de vivre*, he took the day off to regard the aspects of his difficult marriage. The whole day he sat in his arm chair, his mind nonplussed, his excited nerves throbbing; his head in his palms and lips quivering with emotion as he recalled the morning incident and the thousand other fights he had with his wife. There was not even a speck of love in their relation; love had been reduced to routine and romance had bidden adieu long ago. What was left in their relation was a trash box full of unfulfilled expectations. Lisa always hated Isabelle, called her "she" and never addressed her otherwise. It was curious since it was Lisa and not Isabelle who was the other woman in Mark's life; the reason Mark's engagement with Isabelle broke in the first place. But Lisa had always been jealous of Isabelle and called her "a bitch". Often she woke up in the middle of the night to ask Mark the same old question, "Honey, is she better than me?"

Lisa usually returned home from her boutique around six in the evening. So, when the ticking clock – beating like a shocked, weary heart – announced the approach of the deadly hour, Mark began praying for help. He knew the fight hadn't abated, but he lacked the energy to continue. Lisa never came home. Not in the evening, not ever.

The call from the police station came early the next morning. The telephone began ringing with a horrendous note, waking Mark. The metallic ectophony of the telecommunication device was an augury of evil. Mark knew instantly something was wrong; in a matter of moments he would come to know what it was. He picked up the telephone.

The next so many hours passed like a whirlwind, such that Mark could never recall their passage later. A series of fast paced events went by, like the changing scenes of an action thriller: a group of uniformed policemen, a couple of bloody bodies, two cars, a head-



on collision, talk about drunk driving, the blinking red and blue lights of the cop cars, the sounds of the ambulances, a sea of confusion. Mark's doppelganger took over his earthly role carrying out his duties without any sentience. He didn't cry at the funeral. He was in a state of shock; numbed by an unforeseen disaster. He didn't even know if he should blame himself in any way for the mishap. Conscience, when available, told him he should, but logic spoke otherwise. For days he fought with the two antithetical feelings and took to heavy drinking to assuage the mental discomfort.

In the months immediately following the accident he felt a strange discomfort in his chest. A longing to hear the same old voice of his wife; the kitchen noises; the wish to see the new clippings from the 'Better Homes and Gardens' magazine which hung in the study from a number of clothespins glued to brightly colored scrap wooden boards. He wondered sitting in his lonely home in the late evenings what he would say if he saw Lisa once again. He endured endless hours of self-pity, dejection and a series of other confused emotions. A feeling of lethargy overtook him and life in general took on the appearance of one long inebriated journey.

On certain bright mornings when he woke up with morbid headaches, he often questioned himself what he was doing with his life. He tried to make himself understand that life with or without Lisa must continue in its regular course, and it was high-time he accepted that fact and gave life a new chance. He made routines and to-do lists; tried going out with friends and colleagues and even went on a couple of dates to put his life back on track. He was unsuccessful in all cases. After a few outings, the vapid conversations with friends seemed unbearable and the prospect of seeing a new person next to him in bed appeared loathsome. He drew himself in his shell and started drinking once again. He didn't know why he drank, he just did. The wriggling nameless pain that nudged him was forever impatient.

Mark knew it was not love that caused this pain since he and Lisa were already drifting apart when the accident took place and might have had a separation soon, had she not died. So, it was not love but solitude in general that cowed him. The idea of finding the empty house sitting all by itself in an empty plot of land at the end of a given day sent shivers down his spine. The uninhabited corners of the dwelling bearing vestiges of a dead relationship, the pictures hanging in the hallway, and the overall creepiness of the house made it unbearable. One night the pain was worse than usual. He had spent the whole evening drinking from a bottle of Mexican tequila and was filled with self-loathing. He blamed himself gratuitously for Lisa's death and inculpated himself for several other disgraceful incidents that had happened in his life. He even tried calling Isabelle, but she wouldn't talk to him and put down the receiver without one word. She was evidently scared after she heard about Lisa's death and feared the police might blame her for the death in some way. The investigation was long over, still she wouldn't talk to Mark anymore. In desperation, around midnight, he put on his running shoes and walked out of the house. The night was cool and pleasant and the crickets were busy with their drones. Mark took a couple of deep breaths and began walking down the sidewalk. The houses on either side were dark and sleepy; those which had the windows opened allowed a ray or two of faint light to escape through the sides of the drawn drapes. The street lamps, which stood like lonely lighthouses at regular intervals, illuminated the

neighborhood with their yellowish glow. It was a pleasant, dreamy and peaceful night. Mark walked in slow steps, the intoxicated feeling started to abate in the cool air and he felt refreshed. The tumultuous thoughts that wrought him also started to disperse, and after he had walked a mile or two, he felt positively rejuvenated. He did some soul searching and for the first time in the eleven months that passed since his wife had died, he felt peace. He made himself promises, he counted the positive aspects of his character and intended to nurture them; he decided to finish the memoir he had started writing some time back. By the time Mark reached home, the soft light of the morning sun had already started to set the world aglow. He eyed the morning sun and went inside. The next day he forced himself out in the evening, and in a week brisk walking after a day at school became an indelible part of his routine. In a month he felt better, almost like those cancer patients who are awarded a new life when there was no hope for survival. Mark lost a great deal of old weight and felt refreshed and invigorated. He gave up frozen meals and began to cook.

He saw her at the Annual Artisans' Festival that was being held at the Richmond Park. It was a very hot summer afternoon. Mark was out on his daily run and after jogging up a few blocks he found himself in front of the park entrance. The park was dotted with several white tents and temporary stalls, food-carts, face painting tents, children's activity corners. A live musical performance by some girl with a heavy country voice was underway and most of the crowd had gathered around her. There were only a handful of people and a few dogs that were roaming about checking out the stalls. The stalls displayed a range of crafts from traditional paintings to handmade jewelry, furniture and woodwork. Mark walked in and began to look around. He stood outside a unique shop that sold goods made from recycled stuff and was appreciating a wind chime made of Coke bottle caps when he heard her laugh. It was a mouthful of laughter, a fresh and melodious little gag. Mark turned round and saw her. She was having a nice conversation with the store owner of Artisan Clocks – a stall that displayed brightly colored hand painted wooden clocks with little wooden pendulums. She stood with her back to him, her yellow curly hair tied in a loose ponytail. Mark walked in the direction of the store; his mind blank, his heart ready for some unknown excitement.

There were a number of other people in the store, all casually checking out the goods, but he wasn't interested in the goods, he wanted to have a look at her.

"It was great meeting you, dear. Do visit us next year," said the store lady to the girl, cordially, handing her a package and a couple of dollar bills.

"Sure!" she replied, the same melodious voice like drops of honey, smooth and delicious. Then she turned around and faced Mark. She was a young woman, probably in her mid-twenties, well-built, and had a round, friendly face and a couple of deep brown eyes decorated with heavy eyelashes. She was wearing a maroon t-shirt that said 'Department of Social Sciences University of Southern Illinois' in bold white letters. A little blue from the cotton candy she had just consumed smeared across her upper lip area like a delicate beauty mark. Mark was smitten.

"Excuse me," she said, looking confused. Mark woke up from his reverie and realized he was blocking her way. She smiled at him.

"I am so sorry," he said, apologetically. A rush of blood warmed his face.

"It's okay," she said and walked out.

"How may I help you, sir?" the store lady asked Mark.

"Oh! Nothing! Just browsing," he replied with a confused smile and walked out to pursue the girl.

Mark followed her around. She stopped and checked the items of several over-expensive pottery stores. Mark looked at her. She was an ordinary girl, a little on the plump side. There were marked deposits of adipose tissue around her waist. She had freckles too. But there was a strange kind of magnetic attraction in her that pulled Mark; he could not say if it was the floral scent she was wearing, the blue cotton candy mark or her laughter, but he felt like drowning into a forbidden pool. Standing in the middle of the park on the hot summer afternoon, Mark Edwards felt love-struck.

He never hoped it would happen to him. He knew not how it happened, it just did. A rush of blood pumped through his heart and it began to beat with a curious lub-dub noise as he approached near her. She did not notice him, however. She walked around some more checking out the other stores and then walked in the direction of the parking lot, the package hanging from her fist. Mark walked behind her, consciously maintaining a distance lest she should think he was a stalker or something. She approached a red Buick and headed out of the park.

It was more than a week before he saw her again; Mark had the ingenious idea of doing his daily runs in the university campus. It occurred to him one evening, two days before his actual experimentation of the idea, to search the university website and find out more about her. For a pretty long while he had been fighting roughly with his mind, asking it to calm down, do some work and forget the cotton candy mark. But love is such a strange emotion, an untamed, a deaf-mute kind of a feeling, always yearning for something that it knows in its heart is impossible to gain. In his midmorning reveries he admired her gentleness, her musical voice and wished he knew a way to get in touch with her again. She was a mystery to him, an imperfect Southern mystery – a woman who in many ways was so different, yet so delicate and perfect for him.

He called himself stupid and was filled with abashment for his teenaged stance at a mature age of 37. The emotion did not suit him; what did he know of love? A mundane computer science teacher at The Goreville Community High School, what could he possibly know about a deep and poetical, polished and revered emotional we fondly call 'love'? Thinking about it he got the jitters; he had never felt like this before, not about Lisa, not about Isabelle, not about any woman for that matter. It was strange, it was new, and it was love. At least Mark thought so, for the more he tried to launder the dirty linens of his soul, the more violent the emotions became. His mind wouldn't simply listen to him and would spend the twenty four hours of a day, if given a chance, on vague thoughts about her. Mark knew it was time for action.

The university website provided a grand list of students and grad students, assistant professors and associate professors who belonged to the Social Science Department, but they had no pictures posted in the site. Mark had no way to find out if she was a grad student or a master's student. She certainly could not be a professor; she was too young for that. The website, however, presented a well marked map of the campus which showed the campus lake only yards away from the Social Sciences building and boasted of a well maintained walking and biking trail of a mile and a half around the lake. The precise information proved useful since Mark had his brainwave in no time. He smiled, sideways, a sort of mischievous smile unbecoming of a mature man; yet, what the heck? Love is love.

It took him approximately one hour fifteen minutes to leave his home, walk three miles to the university campus, ask random people and find the Department of Social Science. Eventually, he found himself standing in front of brick building of moderate dimensions neighbored by tall trees with nameplates on them. Mark walked around the building. The parking lot at the back of the building had a number of cars. He spotted a red Buick. 'Genius!' he wanted to shout, but somehow controlled himself. It was now a matter of mere moments before he knew he would see her. He had no idea what he should do once he saw her; go and ask her for a date or continue ogling. What if she did not show up? Mark, sadly, had no backup plan. He felt optimistic; he trusted he wouldn't need a plan B.

He was tired after the four something miles walk and sat down at a bench under a tree facing the building. It was six in the evening and he had waited for almost half an hour, yet there was no sign of her. His mind was wild with excitement. The blood inside his body rushed with Bacchanalian ecstasy; the dancing, prancing, confused feelings pestered him; they wanted to know how long? Mark did not know what to say. He got up and began to pace up the graveled road that led to the campus lake. Hardly had he taken a step or two when he heard a laughter, the musical voice said, "See you tomorrow, Nancy." Mark sprung around as if stung by a beetle. She was there, right in front of him, the hair flowing in the wind, the face glistening in the sun, the eyes sparkling with unknown mysteries. Mark noticed it all. She seemed unreal, a mirage of some sort, a passing fancy that never stands stable. In a moment she was gone; the red Buick backed up and then headed out. The plan had worked. Mark smiled and paced up toward the campus lake for a little breather.

"Can I offer you a ride?"

Mark looked up and saw her peering out of a passenger seat window of a red Buick with an anxious eye. Mark nodded.

"Come on in," she said, opening the door for him and clearing away a couple of magazines and soda bottles that occupied the passenger seat.

Mark seated himself and sighed. He was exhausted, his legs hurt, he was hyperventilating, and his throat was dry.

"Are you all right?" she asked with concern. "Here, drink some water." Mark took the pink water bottle she handed and drank from it. Instantly he felt better. The water was sweet and tasty, a touch of cold. He closed his eyes.

She started the car and looked at him. "Feeling better?"

"Yes, thank you," Mark replied.

"You come here often?" she asked.

"Oh yes; everyday for almost a week now. You see, I am preparing for the marathon and have been doing daily four to five miles of brisk walking and occasional running."

"Really? Wow, that's great," she said with a smile. "So where do you want me to drop you?"

"I live on Elmer Street; you can drop me at the intersection and I will walk the few yards," said Mark. He tried to drink her features in surreptitiously. He was meeting her after four long days and he wished he could show her how grateful he felt to her for showing up like a good angel in a moment when he felt he wouldn't see her anymore. People are right when they say wishes do come true.

"Elmer Street is on my way; I can drop you at your place. You shouldn't walk now, you know."

"I guess I overdid it," Mark said apologetically.

"I am afraid so," she said, smiling.

"I am Mark Edwards, by the way," Mark said, extending his hand. Awfully stupid, he thought later, since she was driving.

"I am Hillary. Hillary Perfloff." She touched his extended palm with the fingers of her right hand.

"I am a graduate student at the university's Social Science Department," She said. Of course that was not new information. Mark knew all about the Social Science Department and her. He was somewhat hurt by the fact that she had not noticed him ever pacing up and down the graveled road right outside the department.

"So, what do you do, Mark?" she asked casually.

"Oh... I... I am a computer science teacher at The Goreville Community High School," he replied clearing his throat.

"You lived here long?" she asked.

"Yes, all my life. My parents lived and died here so I never left the place. What about you? Where are you from?"

"I am from Tennessee. Nashville, Tennessee. My family lives there. I have been going to school here for the past five years."

"Cool," Mark replied.

"Actually, I am finished with my graduate work. I will be getting my degree this fall," she said brightening up.

"Wonderful," Mark replied with less enthusiasm than he had actually wanted to put in those words. She would be leaving the place soon; that wasn't good news.

"Will you be staying here or shifting?" he asked with considerable curiosity.

"Oh... I am of going to Bangladesh for a year with couple of others in my department," she replied turning the car right into Elmer Street and slowing down. "Which way now?" she asked.

"The yellow house on the left," Mark said. "It is a few yards, I can manage, don't worry."

"Are you sure?" she asked anxiously.

"Oh... yes," Mark smiled and she unlocked the car door.

"It was nice meeting you, Hillary," Mark said into the open window.

"It was great meeting you too, Mark. You take care, huh."

"Yeah, I will."

"Bye then," she said turning on the engine.

Mark realized something. "Listen, Hillary," he shouted.

"Yes?" she said peering out of the window.

"I know we've just met, but would you care to join me this Friday evening for a movie and a dinner?"

"Is it a date? If it is then I am not interested." She said point-blank.

"No, no... No date. Just a friendly treat to say 'thank you.'"

"You don't have to, you know," she said.

"I really want to, please."

"Okay then, if it is not a date then I am in," she smiled. "You can pick me up at the school around say 7:30."

"I don't drive," Mark replied contritely.

"Okay, then maybe I can pick you up around, say..." she thought for a moment, "eight-ish, would that be good?"

"That would be wonderful," Mark said and pointed to his house. "That is my house over there."

She looked at the house for a moment and said, "Okay then... See you on Friday. Bye!"

"Bye."

They had gone out at least five times, and although Hillary always insisted that the outings were just 'friendly dinners' and nothing else, Mark knew they meant more. He had come to know her really well. He discovered her liking for chocolate, for every time they went for a bite she always ordered chocolate milkshakes; discovered she hated chick-flicks and girly stuff even though she herself indulged in several of them like carrying a pink pen and at least five different flavored lip glosses in her bag and watching romantic comedies on Netflix when she couldn't sleep at night. She loved to talk about politics and social issues, hunger and poverty and how she wanted to help but lacked the machinery needed to bring about a change. She was a dreamer and a strong optimist; she believed that someday she might do something groundbreaking. In fact, Mark felt, that she forced a fresh dose of raw energy into her bloodstream every day; she was so lively. Mark doubted if she ever encountered real pain in life.

Their conversations at the dinner table in a restaurant would mostly consist of useless topics, such as the movie they had just seen and how the actress looked dumb and whorish in her black dress carrying a fake gun or how the dialogues in the movie were ‘too mushy and unreal’. Mark wondered if she could handle reality at all. He told her about his wife.

In general, both Mark and Hillary ignored personal topics. All he knew about her personal life was that she stayed with a couple of roommates, all ladies, of course, in a university apartment and her family stayed in Nashville, Tennessee. She never talked about the members of her family, who they were or what they did. She never mentioned if she had a boyfriend or a fiancé somewhere. Mark couldn’t ask her, he was too modest to do so, but there seemed to be no other way. Here he was spending all his energy and efforts trying to woo this woman without having a slightest idea what she was up to romantically. He thought the talk about Lisa might open her up.

But it did not. She listened to him, all serious; the vivaciousness of her face gave way to an expression of deep pathos mixed with confusion. She appeared genuinely moved. She cupped his hand and pressed it, saying, “I am sorry, I really am,” with misty eyes and then got up to leave. “I need to go back home.”

Mark felt embarrassed to have brought up such a somber topic on a casual dining out.

“I am sorry if I have hurt you in any way,” he said and he meant it.

“It’s nothing,” she said, clearing her throat and trying her best to look normal when she was positively aggrieved. Mark was perturbed. He had been quite careful during the course of the conversation and had only given her bare facts like the date and place of the accident, and no hurtful details. What exactly upset her, there was no way to find out until she was ready to share it with him.

Mark asked her if she would like to go for a stroll in the park. “You might feel better in the fresh air,” he said.

“Okay, let’s go from here. The people are staring at me.” Mark looked around and there was nobody around.

They sat on a bench gazing off across the stream to the mounds opposite. The evening breeze was tender and calm, the gnats and insects carried out a curious orchestra of droning and buzzing noises. The stream was relaxed and at ease, a number of ducks paddled upstream. It was a time between the end of dusk and the inception of night; Mark’s watch said 8:00 PM. A bulbous white moon stared at them from a purple sky. A number of casual walkers, bikers, roller-skaters and children still peopled the park. People laughed and giggled, talked in low voices and played Frisbee and ball. Hillary stared at the little mounds and eventually spoke in a hollow voice. Mark listened.

“I had a boyfriend, Andrew was his name. Andrew Ingram. He was from Dexter, Missouri. He was a grad student too; we were the same age. He was very enthusiastic and we had a lot in common. We shared ideas and thoughts, we debated. We were serious about our relation. We had been together for two years and he was returning from a weekend trip home. He called me from his place and said that his parents wanted to meet me. He was excited and said he had lots of things to tell me. I was visiting a friend at the time in Anna,

and we decided to meet on Tuesday morning at school. I was happy too. I loved him very much."

Hillary stopped for a breather. She choked. A couple of drops of tears fell from her brown eyes and streamed down her face onto her lap. She began again. "He drove a 1994 Ford Aspire; it was an old car and was out of shape. He was traveling westbound on Highway 60 when another car, a speeding Pontiac driving eastbound crossed the centerline and hit his car. A head-on collision. He died on the spot. He was a bloody lump. The woman who hit his car died too. She was a young woman."

"She was Lisa." Mark nodded with a deep understanding.

Hillary sighed and wiped her face with her left hand. Mark looked away. A train of images halted before his eyes and in the softly rolling water of the stream he saw pictures: images of Lisa, her face, the fights, her fits of anger; her two depressing eyes staring at him with a questioning look and her mouth lippling the same old question, "Honey, is *she* better than me?"

The Cursed Idol

Ratanlal Basu

It was all foggy. Everything on the road below was invisible, and the steep downhill path, slippery with dew. I had to clamber down the Tibet Road cautiously. Still, it was very exhilarating and I felt as though I was moving along an uncanny path in a dreamland. The tender caress of fog on my exposed face was exciting. I had to go further down to reach the *paan* and cigarette stall. Once I turned the corner, the stall was now visible through the tapestry of fog. I started traipsing in the direction of the stall and a meek female voice gave me a start. I turned my head and noticed a stout Nepali woman, aged around thirty, standing only a few feet from me. She repeated, “*samay keti bhayo?*” – and then, finding me to be a Bengali, she asked in broken Bangla, “What’s the time by your watch?” I pulled back the sleeve of the jacket to peek at the watch and replied, “Seven thirty.” She walked a few paces ahead, only to turn around and remark, “You seem to be a tourist.”

“Yes, I’m from Kolkata.”

“How long have you been here?”

“Arrived just yesterday.”

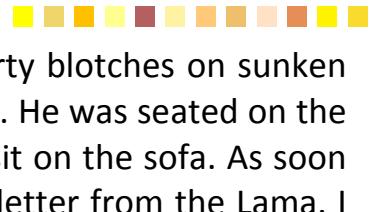
“Which hotel have you checked in?”

Before I could reply, I heard the harsh voice of the Bihari stall owner, “Renu, leave this place immediately or I’ll call the police. You’re again disturbing the tourists?”

She seemed to panic at the name of the police, and left the place hurriedly after uttering obscenities in Nepali at the stall owner who chased her away. He was still panting for breath after returning to the shop. I was really bewildered at the sudden turn of events. Collecting himself, the stall owner explained that this woman was a call girl, used to luring tourists to sexual orgies in exchange for money. He said, “It’s good for you that I intercepted in time and she could not extract the name of your hotel. But I am apprehensive that she would find out nonetheless. So, inform the matter to the manager in advance. Otherwise, if she queries about you at the hotel reception, they might think otherwise of you. But I know your character and you’re to be cautious, so that it’s not besmirched without any reason.”

Returning to the hotel, I related the matter to the manager and he started laughing aloud thinking about the condition of an orthodox person like me facing a call girl. He told me that Renu was not a prostitute in the true sense, as she used to reside with her widower father and a ten year old son. Her husband had eloped with another girl and was now settled at Darjeeling. He told me that there were very few streetwalkers in the town as such; perhaps she was an exception. The professional escorts could be there, but they didn’t disturb the innocent tourists. They made contact through the internet.

I forgot the matter soon and hastened to meet the Lama at the Tibetan institute. He gave me the good news that he had learnt about antique Tibetan stuff in the house of an old man. The agent of the man would contact me in the evening at my hotel.



The agent came in the evening – a Nepali teenage boy with dirty blotches on sunken cheeks, and his shabby coat, unwashed for years, emitted a filthy odor. He was seated on the floor of the lobby as the manager would not permit such a fellow to sit on the sofa. As soon as I entered the lobby, the boy stood up, bowed and offered me the letter from the Lama. I was startled to notice that his teeth were snow-white in sharp contrast to his demeanor and outfit. The brief note indicated that this boy would lead me to the old curio man.

After getting my assent, the boy announced he would arrange for a hired vehicle, a resort for the night stay and all other accoutrements required for the venture. I gave him the necessary advance for booking a vehicle and the resort, as well as five hundred rupees as his fee and some extra cash to buy a fresh sweater and coat, emphasizing that he should immediately get properly washed with soap and hot water. The manager explained to him in Nepali that he ought to be neat and clean before escorting a wealthy gentleman like me.

The night saw me happy that soon I would be in possession of some rare authentic Tibetan curios which my rich collection lacked. My father was a rich businessman and I was the lone issue of my parents. I did a PhD in archaeology from a US university and had decided to be a professor at some university there. But the sudden death of both the parents in a plane crash made me utterly lonely; returning home I sold all the shares of my father's company, invested the money in shares of reputed corporations and took to traveling sites of pilgrimage, but peace of mind was to be found nowhere. While touring Rajasthan I came across a Bengali lady professor from Kolkata and we fell in love with each other. She was a nice lady and did away with all my loneliness. I loved her deeply and was obedient and faithful to her. She inspired me to be a freelance journalist and write articles on antiques. My father already had a good collection and I went on enriching it by collecting rare articles from various places. However, I did not have any collection of Tibetan curios. So now I was elated to have the opportunity to get access to them.

The boy came on time next morning and looked fresh and jovial in his new outfit. We reached Namchi market by noon; after lunch at a hotel, we bought our dinner packets, drinking water, candles and other essentials for the night stay at the newly constructed resort which had no electricity connection yet. It occurred to me that the large half-built resort at that desolate place in candle light would be eerie and appropriate for inspecting antique Tibetan curios. The path was craggy and the vehicle jolted vehemently. By late afternoon we reached the resort amidst a small valley covered with pines and rhododendrons. The place looked beautiful and uncanny in the reddish glow of the setting sun. The driver left with the vehicle for Namchi market, mentioning that he would return by early morning to pick us up.

The boy raced down a narrow causeway and was lost behind the turn of the hill. It was dark inside; I lit the candles, and the half-finished room, where we would be staying, looked mystical. The other rooms were locked. There were two wooden cots in our room. The boy had already brought mattresses which were rolled up at the corner of the room. He would unpack them after he returned. I went out to the balcony and looked around. All sides except the fourth sloped gently up the tree-clad hills, while the fourth went steeply down through

bushes and thickets. So, it was not a valley proper but a saddle point. The Bhutia hotel owner had chosen an excellent place for the resort but he would have to spend much to get electricity and water connections.

The boy emerged at the turn of the hill and I hastened to open the door. He was almost running and was panting now. After settling down, he informed me that the old man could not come up to the resort and so I would have to visit his place to browse through the curios. I got ready in no time and accompanied the boy down the steep causeway. It was broken and narrow and I stumbled twice, but the bushes on both the sides saved me from falling down. The wooden house of the old man was at the upper end of the small village with houses scattering down a valley that sloped gently down to meet the steep hills around. It was already evening and I switched on my torch.

The house was at the end of the village and other houses, not more than forty, were away from this house. He liked to live alone in peaceful quiet, I thought. The house consisted of a small bedroom and a kitchen and was lighted by a dim lamp. The man had a large puckered face and deep creases on the forehead, the hair around the baldness were all creamy white and there was no trace of hair on the face except a small goatee down the chin; the snub nose was very large and his small eyes were luminous and intelligent. He greeted me with affable smile and requested me to be seated on the stone slab placed at the corner of the room. At the far end of the room there was a beautiful statue of Buddha. He asked if I would like to have *chhaang* (the locally made strong alcoholic drink) which I instantly declined. I, however, consented to spice-tea.

After tea I came right to business and the man asked me to follow him. He carefully closed the entrance door, asked the boy to stand guard and took me stooping through the small door to a narrow passage which caved into the hillside and ended up at the approach of a flight of stairs going steeply down. He carried a lamp and I lighted my torch to step carefully down the steep staircase. At last we reached an underground room much larger than the upper one and lo, there were innumerable antique articles stacked on a stone ledge that jutted out of the sidewall which was but the hillside. Examining the articles I was utterly disappointed as most of them were trash, occasionally displayed in curio shops at Gangtok and Darjeeling. The old man smiled enigmatically and said, 'I know what you're thinking, sir. But I've not given you so much trouble for these trifles. I'll show you something that you must like, I hope. This is a rare thing and had been brought along by my ancestor right from Tibet.'

The way he talked ignited my curiosity. An enigmatic smile played on his lips and in the flickering light of the lamp he looked like an aboriginal man. I felt as though I was transported by a time machine to the pre-historic ages and an eerie sensation coursed down my spine. The old man removed the trash articles and took out a wooden box about two feet long. He slowly raised the lid and hesitated for a while, his looks betraying panic, and in a trembling voice he muttered, 'Here's something that I'm sure would interest you, but I must relate the hazards associated with it.' He slowly handed out an idol and I bent forward to peer at it. In

the flickering light the metallic linings of the reddish robe of the fourteen inch idol glistened and almost blinded my eyes. The man held the figure in front of the lamp. My eyes got transfixed at the enchanting idol. The body was adorned with an ornamented tight-fitted red robe and only the head was open. The sharp nose and the blue eyes (made of topaz stone, the man told me later on) revealed mockery and cruel sadism but it expressed cajolery at the same time. The sharp heavy boobs, glued tightly to the robe, sloped down to the flat belly and slim waist line which again bulged at the back into heavy enticing butts that curved gently down to the thighs and slender legs. I remained spellbound for some time. My trance broke at the blubbering of the old man: 'You have liked it I'm sure and would be ready to pay the price I would offer, but babu, think twice before you possess this idol of the vindictive goddess.'

'I don't believe that an idol could be alive and vindictive. So I must have such an invaluable thing and am ready to pay your price.'

'It's your choice, but still it would be a sin on my part if I don't disclose everything.'

The man started relating the story of the idol made of a very hard but light Burmese teak and plastered with a rubbery substance. It was originally the property of his Tibetan ancestor who was a *tantric* engaged in occult rites. He had brought this idol from Burma and disregarding the warnings of his preceptor, he started secret worship of the goddess. One night, everybody in the house was waken by his shrill frightened voice. Breaking open his door the next morning, a local lama found him dead with his eyes bulging out in front of the idol. Following the removal of the corpse, the lama entered the room alone and adorned the idol with this sacred robe. Thereafter, he sealed the room, and for two generations the idol remained in the room which was never opened.

This old man's grandfather brought it along while he left Tibet for Sikkim. Nobody, however, opened the box containing the idol, and it was kept in an underground room of their house in the village. That is, until the wife of this old man discovered it; finding the robe dirty, she had taken it out for a wash, putting it on the idol again thereafter. But that very night she became insane and committed suicide after a few days.

Nobody except this old man knew the reason of her insanity. But again, he forgot to take adequate precaution, and one day his only son was missing. Considering it a bad omen, the man entered the cellar at night only to find his son dead embracing the idol. Once again a pious lama was invited to adorn the idol with a new sacred robe as his son had torn open the old one.

I hardly believed this cock and bull story but was still puzzled at his endeavor to dissuade me and lose the opportunity to earn sumptuous money in exchange for something he had no use of. I reasoned it out in this way. Although he was badly in need of money, he was subconsciously unwilling to part with this invaluable ancestral property; this subconscious possessiveness had goaded him to fabricate such a blood chilling story. I did not hesitate a moment to express my strong desire to possess the article. We came out of the cellar and I paid him much more than the amount he had demanded. He once again cautioned me not to uncover the body of the idol. I assured him, and left knowing well that I

would never be able to resist the temptation to divest this voluptuous body of the robe. With my scientific bent of my mind, I was confident that no misfortune would befall me at watching the enticing nudity. All the way back, I thought of rearranging the story with further fabrications along with the article on the idol. I must first consult experts on *Bajrajaan-Buddhist* idols about the origin of the worship of this goddess in Burma and Tibet. The idol resembled the image of *Yakshinis* observed in many Buddhist monasteries and *gumphas*.

Returning to hotel I called my wife and informed her that I was in possession of a rare curio which she would like for sure. I also talked for some time with my charming son, a class three student of a reputed English medium school. He asked me to buy a Sikkim stamped t-shirt he had seen one of his classmates wearing. In the evening I went to the Nehru market and bought the t-shirt, and from the Lal market below bought some beautiful sweaters for my wife and son, and also sacred wheels and tiny bells, a specialty of Sikkim. I sat for some time in the flower adorned mall and watched the play of multicolored light on the dancing fountains. The fountain right in front of me was tinged orange; the vapors sprinkling around gave my face a gentle touch and my vision gradually lost into the mystic land of the glowing vapor. I visualized the enlarged idol of the *Yakshini* dancing enticingly, swaying her voluptuous figure and inviting me.

I abruptly stood up and rushed unconsciously towards the fountain and stumbled on the grill fencing raising roars of laughter from the boys and girls seated around. They might have taken me to be a drunkard. I soon came to senses and in utter embarrassment for my stupidity hastened to leave the place. I returned to the hotel and stacked the gifts in my suitcase. An uncanny hilarity took possession of me and I started crooning a film song. The dancing idol with all its lustful gestures had taken possession of me, and in my mind's eye it soon assumed the shape of Renu, the call-girl I happened to meet near the cigarette stall and I felt a strong desire for her. I was a bit embarrassed as I had never experienced earlier such an amorous inclination towards a woman other than my wife. But I could not shake Renu off my mind and she, intermingling with the *Yakshini*, made me hot and crazy.

I felt very tired after dinner and switched off even the night lamp and fell fast asleep. I had a bad dream of a vehement quarrel with my wife. In a fit of anger I started abusing her in filthy language. She remained morose and silent all through and this raised my anger beyond control. I dragged her by the hair. My son tried to intervene and I pushed him aside. His head crashed against the wall and my sleep broke. Even in the cold weather my garments were soaked in sweat. I got up in a terrible mood and changed the shirt and pajamas. Then all of a sudden I remembered the rare Tibetan idol. In the darkness of the room I groped for the box and it was there. I lifted the lid and was astonished to find a glow emanating from the idol making it visible with all its alluring voluptuousness. I handed it out and held it near my face. The foam coating must contain some phosphorescent element which had made it glowing in the darkness. The eyes were sparkling as though inviting me and the large pointed boobs seemed to be heaving. I remained spellbound for a while. An excitement was building up; I felt horny, and disregarding all the warnings of the old man, I stripped open the body of the

idol, and it made me crazy. I touched the boobs which had spongy softness and elasticity. I ran my fingers through the entire idol again and again. The butts and the triangle were all spongy like the boobs. Would the idol kill me like the son of the old man? No, it was a cock and bull story, I thought. I could not resist kissing the idol from head to feet most passionately and wildly. I held her tight against my lips for a long time. Although I did not die, unlike the old man's unfortunate son, I kept my mouth tightly shut as I apprehended that the foam coating might contain some poisonous substance that had killed the son of the old man. I felt extremely sleepy and replaced the idol in the box and fell asleep as soon as I touched the bed. I dreamt of the call girl Renu embracing me passionately ending up in wild love making.

I rose late the next morning. The idol and Renu streamed through my mind alternately and eventually mingled into one, enhancing my desire for Renu. I thought I should somehow find her. It was foggy all around. I took my breakfast and traipsed through the ocean of fog for the cigarette stall. As soon as I approached the steep rise that led to the turn where the pan shop was situated, I was startled by a loud giggle. Hot blood rushed up my spine as Renu emerged from the fog. She smiled lustfully and greeted me. I brazenly ran my devouring eyes through her skimpily clad voluptuous body. The bulge of her large boobs on the pink sweater made me almost hysterical and I found a striking resemblance of her with the idol. She got closer to me and swayed her heavy butts in the style of a dancer to send blood up my spine again. I caught hold of her hand and she smiled approvingly. I felt I must have her by any means and at any cost. I patted her on the back and muttered in a conspiratorial voice, 'Let's go somewhere.' She giggled with the horny swaying of her body and said, 'Come with me then!' I followed her through the dense fog without knowing where she was leading me.

Soon we were moving down a narrow causeway and we had to remain close to each other. Occasionally, my conscience and conservative nature would overcome me and the call girl would appear like a vampire leading me to my doom. But soon all such inhibitory feelings vanished and my inner mind mocked my utter foolishness. The fog had become denser. I could not resist kissing her madly and she returned warmly. 'My house is not far off,' she said in an insinuating tone. She was right and in a short while we were in her bed in a heavenly union as I had never experienced before. I thought what a fool I had been to marry a weakling Bengali girl, and in a moment all my hitherto-cherished self-styled morality was swept away. I felt the joy of freedom from inhibitions that had prevented me so far from enjoying life in full. Her body in deep embrace once again reminded me of the idol and I felt Renu was turning into the idol. I pressed her head against my chest and said passionately, 'Would you marry me and go away with me to some place?'

'You are already married and you have a son too, you told me,' she said in a mocking tone.

'Hell with them. I would divorce the wife if necessary.'

'Everybody says so in bed and then forgets.'

'But I'm authentic. I no longer have any attraction for my wife after having the experience of real pleasure.'



'Then are you ready to make provisions for my father and son?'

'How much do you need for them?'

She giggled, scrutinizing my face, and said, 'Fifty thousand now for buying my father articles for his grocery shop and ten thousand every month. This is for them and for me I want a bank balance, say of fifty thousand more.' She told that she had a bank account and she may also accept account payee check.

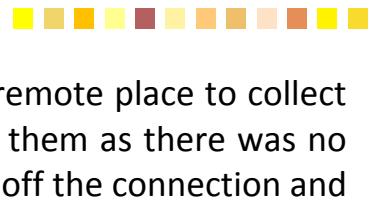
The amount was trifling for me and I readily agreed. She at first could not believe my words, but when I assured her that I would issue her a check right after returning to hotel and pay the cash the next day after withdrawing the money from my Siliguri account, she was ecstatic and dragged me into another blissful orgy. She said I need not take the trouble of withdrawing money from the bank and may pay the entire amount in checks.

I took her along. Coming to the turn of the road close to the hotel, I asked her to wait there as I did not like the hotel manager to have any knowledge of my hobnobbing with this call girl. I issued a check of two lakh rupees, making her eyes bulge out in astonishment as she could not believe her eyes. She turned her eyes toward me to study if I was joking with her or trying to lead her to trouble. I assured her that it was real and within a few days the amount would be transferred to her account. I gave her ten thousand rupees in cash and told I would pay the required cash the next day.

For other expenses I needed money and so I had to go to Siliguri the next day. I booked room at a hotel at Ranipole over mobile phone and checked out of the hotel at Tibet Road. Renu accompanied me to Ranipole. Dropping her along with my belongings at the new hotel I went to Siliguri and withdrawing adequate money from various accounts returned by the same vehicle.

The night was heavenly with wild love making. Renu fell fast asleep out of exhaustion but I could not sleep. The idol drew me like magic and almost in a hypnotic fit I got to the box, opened it and was excited to visualize the striking resemblance between Renu and the idol. My gaze remained transfixed for a long time on the enlivened idol. I got so excited that I had to rouse Renu from sleep. She was drowsy at first but soon her vigor and passion returned and we were lost into the bliss-land again.

Next morning we returned to Gangtok leaving all the belongings except the idol-box at the Ranipole hotel. Renu convinced her father that she had got a good job at Siliguri that would keep her away for some time but she would meet him and her son once a week. They could guess what sort of job it was but did not mind, as they were accustomed to her staying away for such jobs. What mattered to them was the money and this time it was a very attractive one. She stayed at Gangtok for a few days to buy articles for her father's shop and garments and books for the boy. But she spent every night with me at Ranipole. Finally we left for Siliguri. In the meantime I had rented a house of a Marwari smuggler at a desolate place near the Gulma-Mohargaon tea estate. The first floor was meant for his men who occasionally arrived to take contraband goods stored in the cellar. The upper storey, offered to me was, however, completely vacant.



I called my wife and informed her that I would have to go to a remote place to collect some rare curios and for about a fortnight I won't be able to contact them as there was no mobile tower at the place. Her voice revealed worry and sadness. I cut off the connection and switched off the cell phone. For a moment I felt my conscience prick at my brutal treatment of her and my innocent son, but Renu's emergence in some transparent apparel swept away the silly feelings. Soon she got ready for the journey and the hired car had come on time and was honking to alert us.

The vehicle as directed by me dropped us at the entrance of the house that was about hundred meters from the main road and surrounded by bushy sal, pine and jarul trees. It was completely invisible from the main road. I paid off the car and we went upstairs. Renu had bought a broom and other household necessities. In a moment she got busy sweeping and cleaning the rooms and I waited at the balcony watching the Kanchenjungha peaks. They were now covered with specks of reddish clouds that appeared ominous to me. To my consternation, it sent tremors down my spine. The uncanny clouds above seemed to take the shape of the *Yakshini* idol, menacingly casting her vindictive glances at me. I could no longer withstand it and hastened back to the room.

Renu soon got accustomed to the new life, and like a true wife performed all the family chores including shopping from the Sukna market, cooking, sweeping and mopping the floors, and washing clothes. At times I used to roam around the nearby places and meet various people at Siliguri. Renu was always jovial notwithstanding her daily chores. She visited her father and son after a week and told me that they were very happy at her new job which meant plenty of money according to their standards.

Renu decamped with three lakh rupees and my diamond-set gold rings which I had kept in the drawer of the table. She would never return I knew. She knew very well that I would not be able to pursue her because of my social position. I, however, had nothing to say against her.

The night before she fled, my sleep was suddenly broken by her shrill cry and I hastened out of bed switching on the light. I found her standing near the bathroom door and trembling in terror. I reached up to her just in time to hold her before she lost consciousness and carried her to bed. Strangely, the idol box, which had been at the far end of the room, was now in front of the bathroom door. Mesmerized, I returned to the box; my hair rose on its end to find the lid of the box jerking upwards as if trying frantically to be free from the pressure of the heavy spice-grinding stone-slab, which, I guessed, Renu had placed over the lid. Suddenly I turned intrepid and, removing the stone slab, opened the lid of the box. The idol stopped struggling and turned quiet, but its eyes revealed blood-chilling vengeance. I could not endure its vehement glances and put the stone in place again after shutting the lid. I was horrified, too, but did not reveal it to Renu who had regained consciousness by this time. She held me tight and implored that we leave this room at once and spend the rest of the night in the adjacent smaller room. I carried all our belongings to the smaller room after I

had shifted Renu, locked the door of the larger room, and remained sleepless on the floor of the smaller room for a long time. Renu seemed unwilling to recount at that moment what had terrorized her and I did not insist. Eventually we fell asleep out of exhaustion.

In the morning, Renu prepared breakfast as usual. When we sat down to eat, she told me why she had panicked. She had to go to the toilet in the middle of the night. She did not switch on the light lest it should disturb my sleep. But as she groped her way towards the bathroom door, she was astonished to notice a ray of light emanating from something close to the bathroom. Looking closely she discovered the box, the lid of which was wide open, and the nude idol inside was emitting rays of light and its terrifying eyes were rolling with unimaginable vengeance. With a quick presence of mind, she forced down the lid and put the stone-slab over it. The sound of something constantly striking the inner side of the lid terrorized her and she could not help shrieking before she lost consciousness.

I went out for a walk in the high road; upon returning, I discovered Renu gone. She left the main door wide open. Instinctively, I opened the bag containing money, check books, and ATM cards. She had taken only the cash. Later upon opening the drawer, I found the costly rings gone, too.

I no longer had the indiscretion to open the door of the larger room and inspect the idol, although at times I felt a strong inner urge to do so. A deep, primal fear urged me to leave the house at once leaving the idol where it was.

I stacked all my garments and other essential articles in my suitcase and the handbag and walked up to Sukna where I withdrew money from an ATM and hired a vehicle for Siliguri. I booked a room at a hotel of dubious reputation near Siliguri North railway station. Lying in bed in the hotel room I started planning the future course of my life. It occurred to me for a while to call my wife and return to my peaceful ethical living. But I could not contain the idea for a long time. I felt a deep hatred for my worthless wife, as the blissful nights with Renu flashed across my mind. No, it would be a sheer folly to return to her, I thought. I was now completely metamorphosed and had no way to get back to my former life. It occurred to me that with money I could get access to plenty of voluptuous call girls and decided to look for one right at that moment. At times I thought that everything concerning the idol was simply an illusion and that I should go back to the rented house, but an uncanny terror held me back.

I consulted the manager and he showed me a large number of profiles. I selected a few and he contacted them. Only two of them were free that night. I chose a twenty eight year old Bengali widow and made an appointment with her at dinner in a bar-cum hotel. She came on time; after an early dinner, we had a vigorous session. She was charming, and besides, she knew some *Kamasutra* tricks that gave me intense pleasure. She had some important family business to take care of that night and left after one wild session, promising to return the next evening; seeking to reassure me, she accepted only half of her usual fee. I had already proposed to her for going out with me to some place for about a month. She gladly accepted the proposal for a month's Bhutan trip. She was virtually free from obligations as she had no

issues and her parents used to reside with her elder brother; but she needed a few days' preparation for such a lengthy stay. I decided not to remain attached to a single woman, and so did not want to engage in any long term attachment with this widow – unlike in the case of Renu. I was very much relieved as the thought of the idol no longer perturbed me. Unlike Renu, this woman seemed to have no resemblance with the idol and I was gratified to think that the relation with her had made me free from the curse of the idol.

So I was on the eve of a vigorous and worth living life. I felt happy and fell asleep as soon as I had switched off the light.

At midnight my sleep broke as I stumbled on something hard. At first, I thought it was a dream, but soon realized it was real enough, and I had so far been sleepwalking along the Hill Cart Road. The hotel at Siliguri had a whole-night bar and the main gate remained open all through the night. So it had not been difficult for me to sneak out unnoticed.

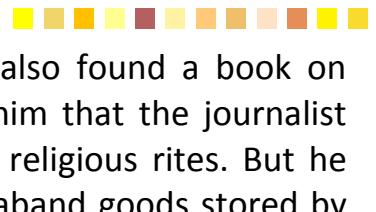
But I had never before suffered from this sleepwalking syndrome. I felt something was attracting me with irresistible force. Looking around in the light of the street lamps, I realized I was not far from the rented house and the idol now reappeared before my mind's eye. I hastened up, ignored the pain on the forehead because of the hard fall and accelerated my pace. I had no longer any fear for the idol. On the contrary, I felt a deep attraction for the *Yakshini*. As I got closer to the path leading to the house, I visualized the nude idol enlarged into a voluptuous full sized woman, standing at the entrance to the house with arms spread out to receive me. I started running towards the blissful union.

Last night my feet had skidded on a banana peel and I fell unconscious by the shoulder of the high road. When I came to, it was still dark; I was awash with horror when I remembered how I happened to be there. I did not lose a moment to run away from the proximity of the cursed idol and race back to the hotel. I entered right into the bar, so that the gatekeeper could not suspect anything fishy; after spending some time amidst crazy drunkards, I returned to my room and fell asleep.

Manisha, the escort, called me early in the morning to inform with regret that she had decided to meet her parents that day, and therefore, would be unable to attend me at night, but would over-compensate the next day. I felt blank and dejected, but decided against contacting the second best from the escort profile. As the day drew to a close, I started feeling some change within me. Fragments of disjointed imageries started rushing through my head in quick succession, and eventually I was seized with an intense desire to encounter the idol again.

I'm to stop writing the diary right now as my brain is getting jumbled and I'm visualizing the foggy image of the *Yakshini* beckoning me for the eternal union.

Inspector Mitra remained transfixed for a long while after going through the diary that he found in the hotel room of the famous journalist Alok Majumdar. The late Mr. Majumdar was run over by some heavy vehicle on the highway the last night. All these were the trashy



and frenzied scribbling of a psychotic person, he thought. He had also found a book on Tibetan tantric cult in the suitcase of the journalist. It occurred to him that the journalist might have lost his head because of some erratic practice of occult religious rites. But he must first find out the hidden house and the idol; At least, the contraband goods stored by the smuggler would be unearthed.

Inspector Mitra drove alone by his police Jeep. He discovered the house easily, and broke into the larger room where he found the box. The exquisite nude idol made him spellbound. Nobody else had yet learnt about the diary and the idol. He covered the box with a sheet of newspaper and hid it under the seat of the vehicle. He then informed the local police station. Soon a large contingent of constables led by a second officer arrived at the spot. Searching the house, plenty of cocaine and heroin stashed in the cellar was discovered and seized, and the Marwari was arrested. Interrogating the smuggler closely convinced Inspector Mitra that he had no idea about the idol. After completion of the necessary formalities, he dined at a hotel and burnt the diary after returning home. Luckily his wife and daughter had not yet returned from Kolkata. So he was free to enjoy the charm of the voluptuous idol.

He switched off the light, shut the windows and opened the box in complete darkness and was astonished to find the idol luminous, as was written in the diary. He took it in his hands and held it in front of him. An eerie sensation coursed through him as the idol in his hand seemed to be vibrant with life, and the scintillating eyes, inviting him.

Let all my love flow...

Arunava Mukherjea

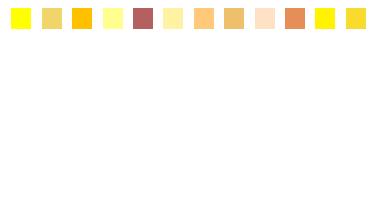
Translating Rabindranath Tagore: “ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা”

This Tagore song doesn't seem to be as well-known as many many other Tagore songs that we often hear. But this is a beautiful song. Though this translation may not reflect the song's original intent completely, our second generation Bengali children will know from this translation most of what Tagore wanted to say here.

Let all my love flow towards you, lord,
and my hopes within reach your ears!

Let my heart, wherever it may be,
always answer your call;
and let my chains of bondage break off, lord,
as I slowly drift towards you.

I must now empty my beggar's plate
that others have filled,
I am already blessed
with so many secret gifts from you;
and my dear friend, my confidante,
let all that was beautiful in this life, lord,
come alive again as I sing for you!



Beautiful

Indrajit Sen Sharma

I was walking along the road

And I saw a flower.

It's red in color

And it smells nice.

When I asked, "What's this called?"

Someone told me this is rose – but a wild one.

Oh – a rose, it's always beautiful

Wow – let me enjoy its beauty.

I go to the tree, and look for the flowers

And suddenly I saw the leaves and the thorns.

Aren't these also beautiful!

Or they're more beautiful than the rose.

I've never thought in this way.

So now I look closer and closer

Which one is beautiful.

Is it the whole combination

Or the individuals.

I look into the rose first.

And I look into this deeply.

It's the bud, the petals and the bee on it.

And another closer look.

Which is beautiful ?

Suddenly there is nothing

except the rose

– no beauty, no ugliness

Nothing but the flower.

Uh! Not even the flower.

There is something there,

Which I've known as a flower

And which once I knew as beautiful.

But now there is nothing there.

What about the leaves and thorns?

These are also there.

As good and bad as the rose

Same.

Nothing is there.

But the whole is there.

Isn't it the same around.

I saw around.

Something or the other these are called.

Road, brick, house, cars.

The whole is there.

Finding Happiness

Shoumika Ganguli

Is it just a smile?

Or is it holding hands while walking a mile?

Is it an assonant melody

That makes us happy?

Is it as beautiful as our first sight?

Or is it deriving pleasure through innocent fight?

Is it as serene and pure as morning dew?

Or is it closing our eyes and instantly visiting places new?

Is it the pain experienced in our first fall?

Or is it the adventure of walking the first step supported by the wall

Is it like the tears to go to school on day one?

Or is it like the fear of punishment as the teachers summon?

Is it the agony of the first failure?

Or is it a jamboree for a victory assured?

Is it like the excitement of sowing seeds?

Or is it as curious as watching it grow at a high speed?

Is it comatose like the adolescent crush?

Or is it like the hundreds of dream we entrust?

Is it the solace under the shade of mother?

Or is it the feeling of saying, "I'm there for you forever"

Is it a lonely loiters around the hostel corridor?

Or is it like the permission after an earnest implore?

Is it like running the way back home on every vacation?

Or is it the hope of pioneering at least one resolution?

Is it as complicated as finding true love?

Or is it the pain of a broken heart addressed by a cigarette puff?

Is it the fresh smell of the wet earth?

Or is it later lamenting for misunderstanding someone's true worth?

Is it enjoying soft music on a candle-light dinner?

Or is it getting lost in one's eyes and returning no sooner?

Is it like researching on tricks to convincingly lie?

Or is it the uncontrolled tears when friends say goodbye?



Is it like shopping impulsively and buying everything visible with the first salary?

Or is it the feeling of responsibility while growing up and starting a family?

Is it as pure and tender as the touch of an infant?

Or is it like the confidence to confide mistakes being blatant?

Is like watching ones like me grow?

Or is it the relief of saving a life from inferno?

Is it spending the whole life as it is?

Or is it repenting at the end for the works that we never did?

Is it just the pleasure of being ordinary?

Or is it grumbling at the end of spending two-third of the life amidst worry?

Is it like watching the eyes of those dearest being content?

Or is it accepting defeat and saying, "fate never allowed me to be a person of substance"

Is it helping the one in jeopardy?

Or is it reaching out to support to absolve fights, the only remedy?

Is it like giving food to those who starve?

Or is it voicing the protest against hypocrisy so sharp?

Is it like bringing smiles to the down-trodden?

Or is it advising the clueless not to follow the path forbidden?

Is it like standing out amongst the ordinary?

Or is it watching smiles and barriers fall in incognito more satisfactory?

What's that takes a full life for finding its definition?

What is it that's difficult to find but is everyone's aspiration?

Is it called HAPPINESS?

Or is it walking the long road of life and in the end looking back
to confront the truth that it was rather a pursuit of happiness?

Oyster Life

Sudipta Biswas

Now, in this beautiful world
We'll spend an oyster-life.

I'll hover throughout the night
Keeping my palm on your palm.
Giving up all calculations
With leaf and with star
We'll spend an oyster-life.

Pearl like white foam will condense.
Bright day will come out from the mist
Suddenly, getting a single penny or two
Poor children will present us a bright smile.
Now we'll spend a bright oyster-life.

In the clear sky of the mountain
Very bright stars will come out.
Not with flowers
But by collecting leaves from the ground
We'll pray to the jungle-goddess.
Thus we'll spend a sacred oyster-life.

A red rose blooming in the garden
Other trees, clapping their leaves,
Congratulating her. Now please come,
we'll spend a rosy oyster-life.

If anybody recognizes us
I'll present them a flower from my poetry books.
Oh! Look at the sun-yolk in the eastern sky.
With the sacred *Gayatri-mantra*
Now, let us spend a holy oyster-life.

This winter, not with any poppy leaf or rose
I'll hibernate with you, only with you, butterfly.
Now, let us spend a drowsy oyster-life.

Two lives will unite into one
In the tranquil moonlit night
We'll fly in the sky, where
The moon and cloud will fight.

Let a bird build her nest
Let a bee build a hive
Let us dissolve all disputes
Let us spend an oyster-life.

সুন্দরবনের ভূত

অরূপ চৌধুরী

ধীপময় সুন্দরবন। বাঘ সাপ কুমীরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করা মানুষেরাও বড়ই বিচ্ছিন্ন। হেঁতাল, বাইন, গরান আর সুন্দরীগাছের মাঝে জোয়ারভাঁটা আর আলোছায়ার সঙ্গে মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে বহু বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংক্ষার-কুসংক্ষার, আর তৎসঙ্গে, ভয়। ভূতে মানুষের ভয়, এমনটাই আমরা জানি। কিন্তু সুন্দরবনে দেখেছি, যদিও প্রচুর ভূতের উপস্থিতি – বনেবাদাড়ে আর মানুষের মনে, ভূতকে ওরা কিন্তু ভয় পায়না। ভূতও আছে, মানুষজনও আছে। এমনকি, কোথাও ভূতেরা বন্ধু পরিত্রাতা, কোথাও বা বিপদে রক্ষাকর্তা। মজাদার রসিক ভূতও আছে।

কৌতুহল বশত, আমি যে সব গ্রামে যেতাম, অবশ্যই ভূতের খোঁজ নিতাম। ধীরে ধীরে ভূতের খবরের সংগ্রহ আমার বেড়ে চলল; দেখলাম, বহু ধরণের অস্তুত সুন্দর সব ভূতেরা বাস করে এখানে। বর্ণনা মিলিয়ে আঁকলাম তাদের ছবি। মানুষজন দেখে খুশী হয়ে আরও সাহায্য করল শুধু তাই নয়, কোথাও ভুল হলে শুধরে দিত ছবিগুলো। বর্ণনাগুলো অবশ্য সুন্দরবনবাসীদেরই। ওদের বর্ণনা শুনে কেউ কখনো এর আগে এমন করে লেখেনি বা ছবি আঁকেনি। তাই ছড়োছড়ি পড়ে গেল আমাকে ভূত যোগান দেবার। সব তথ্যই যে খুব ভালভাবে পাওয়া গেল তা নয়, তবু বেশ কিছু ভূতের হৃদিশ পাওয়া গেল, যা শুনে মনে হল, যে মানুষের মনের কোলে বাস করা এই প্রাণীরা থাক না চিরকাল জাগরুক হয়ে?

ভূতের কথায় শিশুরা ভয় পায়, আবার মজাও পায়। বয়স্ক মানুষেরা শ্রদ্ধা সমীহ করে; অনেক সময় জেনে বুঝে অন্যায় করা থেকে বিরত হয় এই ভেবে, যে পাছে ভূতে ধরে। ভূত বেঁচে আছে গ্রামীণ আড়ায়, গল্পে, হেঁশেলে বা পুকুরঘাটে। তাই সুন্দরবনের ঐতিহ্য শুধু বাঘ-কুমীর নয়, ভূত আর তার গল্পও।

সাহেব ভূত



শামশের মোল্লা বলেছিল, সে নাকি সুন্দরবনের মাঝ সমুদ্রে এমন ভূত দেখেছে। এরা জাহাজের ডেক-এর ওপর উঠে দাপাদাপি করে। আবার অকস্মাত জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারও ক্ষতি করেছে – এমনটা শেনা যায়নি। হারউড-পয়েন্ট অঞ্চলে অনেকে সাহেব ভূত দেখেছে বলে শুনেছি। জলদস্যদের হাত থেকে জাহাজকে রক্ষা করে বলে বিশ্বাস। মানুষের সমীহ পায়।

নেতিধোপানি থেকে আমলাবেতি গ্রাম। সর্বত্রই আমি “হাওয়ার” কথা শুনেছি। সারা বছরই হাওয়ার দাপট থাকে। কোন নির্দিষ্ট আকার বা বর্ণনা পাওয়া যায় না। শুধু সবাই জানে, হাওয়া তার লম্বা চুলদাঢ়ি দিয়ে সব এলোমেলো করে যায়। কারো ক্ষতি করে না। হাওয়া-কে গ্রাম দেশের মানুষ মান্য করে। অনেক সময়, হাওয়া মানুষের উপকারও করে। তবে, হাওয়ার প্রভাবে বহু সময় ছেটদের, এমনকি বড়দেরও অসুখ করে। গ্রামের গুনিন ওঝারা তাই হাওয়া কাটাতে ঝারফুক করে।



হাঁড়ি ভূত



গোসাবা অঞ্চলে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে হাঁড়ি ভূত হাঁড়িতে চড়লে তার কপাল খারাপ। চাল ডাল যা-ই বসাওনা কেন, নিমেষে পুড়ে থাক হয়ে যাবে। জল বসালে হাঁড়ি ফুটো হয়ে উনুন পর্যন্ত নিতে যায় – হাঁড়ি ভূতের অত্যাচারে। তাই ভূতে চড়া হাঁড়িতে দুধ জ্বাল দিয়ে সেই দুধ কুরুকে খাওয়াতে হয় – তবেই নাকি ভূত ছাড়ে। অন্যথায় হাঁড়ি ভেঙ্গে সমুদ্রে ভাসানো ছাড়া গতি নেই। গোলগাল মুখ, ছোট-বড় দু'টি কান বালা; ওপরে পাটিতে একটা, নিচে তিনখানা দাঁত। খাড়াখাড়া চুল, হাঁ করে শুধু খেতে চায়। ভাসমান অবস্থায় কখনো আবার ডিগবাজিও থায়। সর্বদাই উর্ধ্বদৃষ্টি।

পেঁচো



পেঁচো নয়। এর নাম পেঁচো। দেখতে বড়সড় ভুতুম পেঁচার মতন। কান আছে। কিন্তু পা দু'খানা অনেকটা মানুষের মতন, আর গায়ে সাদা কাপড় জড়ান। চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে থাকে। দেখলে কেউ বলবে না যে পেঁচো কি সাজাতিক জিনিষ। লোকে বলে - “পেঁচোতে পেয়েছে”। যাকে ধরে তার দফারফা শেষ করে দেয়। মনে পরে, ছোট বেলায় আমার মায়ের মামা – ভুলুদাদুর রাজপুরের বাড়িতে, কুটিল দাসি নামে এক বি কাজ করত। তার স্বামী ছিল গুণিন। মন্ত্র বলে ভূত, অপদেবতা আনতে পারত। সে পেঁচো নামাত, মানে কাউকে পেঁচোতে ধরলে, মন্ত্র বলে পেঁচো তাড়াত। সুন্দরবনের পেঁচো তাড়াবার কেউ আছে কিনা জানি না। তবে, পেঁচোয় ধরা মানুষ দেখেছি। তারা খুব নোংরা হয়, আর কুঁড়ের বাদশা। গায়ে গন্ধ, তবু চান করবে না। ভাত খেয়ে, বিছানায় এঁটো হাত মুছে রাখবে। আর সারা দিন শুধু বসে ঝিমোবে। মাঝে মাঝে মাথা নাড়বে আর উদাস চোখে চেয়ে থাকবে। প্রচলিত বিশ্বাস মেনে, পেঁচোর ঘরে নিম হলুদ পাতা ঝুলিয়ে রাখা, শুকনো লঙ্কা পোড়া দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

লিক্পিকে ভূত



নরম, লিক্পিকে, কিছুটা ভেজা। ধরতে গেলে সরাং করে পিছলে যায়। মাথাটা চ্যাপ্টা, তিনকোণা। যখন তাকায়, একটা চোখ খোলে, অন্যটা বন্ধ করে রাখে। মাথায় বখাটে ছেলেদের মত চুল, মুখে ব্যাঁকা হাসি – যেন ও ছাড়া আর সকলেই ভুলে ভরা। সরু লম্বা শরীরটা গাছের ডালে জড়িয়ে নিশ্চুপে ঝিম মেরে পড়ে থাকে। মানুষকে অপ্রস্তুত করতে ওস্তাদ। লম্বা লেজের মাথায় যে লোম আছে, সেগুলো দিয়ে মুখে ঘাড়ে আচমকা ঝাপটা বা সুরসুরি দিয়ে লোককে ঘাবড়ে দিতে ওস্তাদ। নতুন জামাই বা বরযাত্রীদের নাকি বহুবার থতমত খাইয়ে ছেড়েছে এই ভূত। এমনটাই বললেন বিধবা পল্লীর সনাতনী মাসিমা।

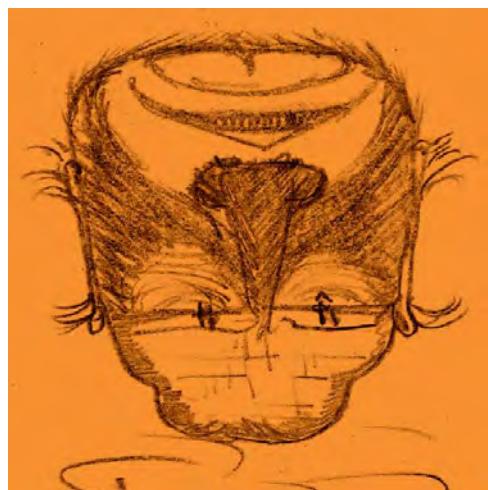


লটু



কথাটা আসলে নাটু বা নাটো। মানে, বেঁটে। সুন্দরবনের লোকেরা ‘ন’ কে বহুসময় ‘ল’ বলে। তাই লোকমুখে নাটু – লাটু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাথাটা গোল। টাকে সামান্য দু’চারগাছা চুল। কিছু না বুবোই বোকার মত হাসে। গায়ে মাকড়সার মত জাল বোনা। হাতে, পায়ে চারখানা মাত্র আঙ্গুল। তাও আবার টিকটিকির মতন। দেয়ালে বা ছাদে উল্টো হয়ে ঝুলতে দেখা যায়। পা বেঁটে। গাঁটে, গাঁটে ফোলা। যখন তখন যেখানে সেখানে হাজির হয়ে গোলমাল বাধায় ও হাসে। কোন মানুষকে যখন লটু ভূত ধরে, লোকে বলে লটুতে পেয়েছে।

গোল্লু



গোল গাল মুখখানা। মাথা ও কপাল ছোট। চুল অতি সামান্য। কিন্তু, মুখ খানা বেশ ভারী আর তিনকোনা। চোখ ছোট। গালে প্রচুর বলিরেখা। তরমুজের মত বড়সড় মাথাখানা ভাসতে ভাসতে আসছে। তবে তা উল্টো হয়ে। সাধারণত মাঝ রাতে এরা আসে। এর দেখা পেলে, ভয় লাগবেনা এমন প্রাণী কে আছে? শুনেছি কুকুররা নাকি গোল্লু আসার আভাস পায়। মুখে অনবরত বু-বু-বু আওয়াজ করে চলেছে। গোল্লু খাবার খেতে চায়। ওর পেট নেই। তবু খুব ক্ষিদে। তাই গোল্লু ভূত বাড়িতে এলে মানুষ তাড়াতাড়ি খাদ্য যা থাকে তাই উঠোনে বার করে দেয়। খেয়ে খুশি গোল্লু বর দিয়ে যায়। তার বরে মানুষের বিপদ কাটে। গহন সুন্দরবনে, গোল্লু সাধারণ মানুষের সঙ্গী হয়ে আজও বেঁচে আছে।

পানু-মানু



পুকুরে দুটো ডাব ভাসছে। কেউ ভাবল গাছ থেকে পড়েছে। ধরতে গেল। অমনি ডাব দু’টো সরাঙ করে ডুব মারল। এর নাম পানু-মানু। জোড়া ভূত। তবে সবাই দেখতে পায় না। মানুষ কে ভুল বোঝাতে ওস্তাদ। গ্রাম দেশের বাচ্চারা পানু-মানুর হাতে পড়লে আর রক্ষা নাই। কিন্তু, ভূত বলে অবহেলা কোর না। স্বামীর আর শাশুড়ির সাথে গোলমাল করে, গ্রামের বউরা পুকুরে ডুব মেরে আত্মহত্যা করতে গেলে, পানু-মানু তাদের বাঁচায়। ডুবতে দেয় না। আবার, অনেক সময়, গরিব মানুষেরা পুকুরের পাশে বসে অভাবের জ্বালায় কাঁদতে থাকে। পানু-মানু তখন জলের তলা থেকে বাসন তুলে তা ভাসিয়ে দেয়। যে পায়, সে পানু-মানুকে আশীর্বাদ করে বাড়ি যায়।

কোন ছায়া বা কায়া নয়। নয় কোন অঙ্গুত শব্দ। স্বেফ নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ায়। মনে কর, কোথাও বসে কথা বলছ। বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। কখন যে কে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতেও পারনি। শুধু আঁশটে গন্ধ পেলে, যেন মাছের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। বড় অপ্রস্তুত অবস্থা। ক্রমশ তীব্র হচ্ছে গন্ধ। গাঞ্জিয়ে উঠছে। বমি পায় পায় অবস্থা। কি করবে ভাবছ। তখনি শুনলে ফিক্‌করে হেসে কেউ সরে গেল। এরই নাম চুপড়ি। কোমর পর্যন্ত আছে। বাকিটা নেই। কোমরে চুপড়ি বা ঝুড়ি। তাতে মাছ আছে। তবে তা বাসি বা পচা। যারা চুপড়ি দেখেছে, তারা বলে যে ওর পা দুটো আছে কিন্তু নেই। মানে ছায়া, ছায়া। চুপড়ি, দিনে দুপুরে বা রাতেও দেখা যায়। তবে কার কোনও ক্ষতি করে না। হাঁটুর ওপর সাদা কাপড় পরে, ওরা ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গী ঐ আঁশঝুড়ি।

নাস্বা



কিছু পর মনে হল কে যেন আমাকে টপকে যেতে চাইছে। তার দীর্ঘ ছায়া আমার ছায়ার ওপর বার বার পড়ছিল। এবার একটা চাপা অস্ত্রিত। সরে দাঁড়ালাম। যে পেছনে আসছে, তাকে পথ করে দেবার জন্যে। কিন্তু কেউ গেল না। ছায়াহীন রাস্তায় আমি একা দাঁড়িয়ে। বাড়ি ফিরে এল বেশ জ্বর। সে জ্বরের ঘোর আর কাটে না। নানা রকম অঙ্গুত কথা বলেছিলাম জ্বরের বিকারে। বাড়ির মানুষজন শুনেছেন যে আমি – এই পরিতোষ, যে নাকি কোনদিন সংস্কৃত পড়িনি, বিশুদ্ধ উচ্চারণে ওই জ্বরের মধ্যে চগ্নী আবৃত্তি করে গেছি! ওর কথা অবিশ্বাস করতে পারিনি, কারণ কানু ময়রা, যে নাকি ওর জ্বরের সময় বরফ দিয়েছিল, তার কাছেও একই কথাই শুনেছি।

অলঙ্করণঃ অরূপ চৌধুরী



চেনা পথ, অচেনা কথা

ইন্দিরা মুখার্জি



বিদায়ী ফাণনের গায়ে তখন চোখঝালসানো চৈতী আগুন, কিন্তু ছুটির অমোঘ আকর্ষণ আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোলের আগের দিন, ভোরে, খড়গপুর থেকে বোলপুরের পথে... “তোমায় নতুন করে পাবো বলে”। দেখা হয়েছে বহুবার চোখ মেলে, তবুও ঘর থেকে দু’পা ফেলেই আবার হাঁটি চেনা পথে, আবার নতুন করে আবিষ্কার করি গ্রামবাংলাকে। পথের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়ি বারবার, কালের গাড়ি আরোহণ করে। লিখে চলি পথের পাঁচালী। ভোর ৬’টায় শুরু করি যাত্রা, সঙ্গে এক থার্মোস চা, কিছু কুকিস, মাফিন আর কয়েকটা কচি শশা নিয়ে।

এবার আমরা গেছিলাম বীরভূমের দুবরাজপুরে, সত্যজিৎ রায়ের অত্যন্ত প্রিয় একটি শুটিংস্পটে। মামা-ভাগনে পাহাড় এবং হেতমপুর রাজবাড়ি দেখতে। গুপ্তি গাইন বাঘা বাইন, হীরক রাজার দেশে আর অভিযানের শুটিং হয়েছিল এই দুটি জায়গায়।

পূবের আলোয় ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে একে একে পড়ল সারি সারি শালগাছ অধৃষ্টিত গ্রাম, মেঠোপথের ধারে সাতকুই বাজার। এসে গেল কংসাবতী নদীর ওপর বীরেন্দ্র সেতু। আজ কংসাবতী ‘কাঁসাই’ হয়েছে। একে শীত সবে মাত্র বিদায় নিয়েছে। তাই চোখের কোলে কালি ঢালা। শুকনো তার বালির চর। মধ্যে মধ্যে পায়ের গোড়ালি ডোবানো জলের রেখা একেবেঁকে চলে গেছে বহু দূরে। এভাবে ১৫ কিলোমিটার চলার পরই শহর মেদিনীপুরের গায়ে ধর্ম’র মোড়। ধর্ম থেকে স্টেট হাইওয়ে ৭ ধরলাম; আরো ২০ কিলোমিটার পর কেশপুর এবং স্টেট হাইওয়ে থেকে ১৯ কিলোমিটার চলার পর চন্দ্রকোণা। কেশপুর যেতে যেতে পথে পড়ল পাঁচখুরি চক, বগছড়ি গ্রাম।

সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছিল তখন শালবনের মাথায়, বসন্তের কচি সবুজ পাতায়। চেনা পথ যেন আরো নবীন সজীবতায় ভরে উঠেছিল। সজনে গাছ তার ভর-ভরন্ত রূপ নিয়ে, চিরন্নির মত ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁটা ঝুলে রয়েছে তার গায়ে মাথায়।

বসন্তের মোরাম-রাস্তায় পলাশের কুঁড়ি, আমের মুকুল, বাদাম গাছের পাতাবরা গুঁড়ি দেখে সেই পলাশ
বরা সকালে মনে হল

শিমুল-তলায় মেয়ের বাড়ি, পলাশ-উঠোন ভরা
অশোক-দালান পেরিয়ে পাবে কৃষ্ণচূড়ার সাড়া,
সজনেফুলের গন্ধ বাতাস, শিমুলরাঙা মাটি
পলাশবৃষ্টি মেঘের বাড়ি, রঙীন ধূলোমুঠি!



কবিতার খাতা নিয়ে ঝুঁকে পড়েছি তখন; শিমুল-বারান্দা তখন স্বপ্নময়। মনের ধারাপাতে তখন কেবল বসন্ত।

সেদিনও বরেছে একমুঠো পলাশ,
কমলা রঙের পলাশ, বাদামী তার বোঁটা,
পাতা ছিল না একটাও তার আশেপাশে।
ভাবনার পাতা উলটে চলেছি একে একে...
পলাশ বরেছিল কার্নিশে,
কমলা রঙের পলাশ, বাদামী তার বোঁটা,
উঁকি দিয়ে চলে গেছিল
বসন্তের একচিলতে রোদগোলা সকাল।



পড়ল মুগবসান বাজার, নেড়াদেউল
গ্রাম। খড়গপুর থেকে এতক্ষণ সোজা উত্তরদিকে
যাচ্ছিলাম। চন্দ্রকোণা পেরিয়ে পূবদিকে ঘুরলাম।
বাঁদিকে পড়ল ক্ষীরপাই। কুঁয়াপুর গ্রাম, দক্ষিণ
বাজার পেরোলাম। চন্দ্রকোণার কাছে
গোঁসাইবাজারে পড়ল বিষ্ণুপুরের আদতে তৈরী
পোড়ামাটির অপূর্ব এক মন্দির ও তার
ধর্মসাবশেষ।

হালদারদীঘি গ্রাম, হাসপাতাল চক। এ
যেন পুকুর-সর্বস্ব গ্রাম। দীঘিভরা সবুজ জল
তখন টলোমলো প্রতিবিম্বে। পড়ল জাড়া,

শ্রীনগর, রামজীবনপুর আর তারপরই রামকৃষ্ণদেবের সূতিবিজড়িত কামারপুকুর।

ফেকোঘাট থেকে ডান দিকে ঘুরে আরামবাগের রাস্তায় আমরা নিলাম প্রথম হল্ট, ধূমায়িত চা আর মাফিন দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম। আবার শুরু পথচলা। দ্বারকেশ্বর নদী পেরোতে হল। পড়ল মফস্বল শহর বুলচন্দ্রপুর, উচালন, শেহারাবাজার।

দামোদর নদীর ওপর কৃষক সেতু পেরিয়ে, ছেটবড় কালোদীঘির জলকে সরিয়ে রেখে আমরা বর্ধমান শহরের গা দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ২ ধরে কিছুটা গিয়েই ন্যাশনাল হাইওয়ে ২৮ যা গিয়ে ছোঁয় ১০৮ শিবমন্দির। শেরশাহসুরীর গ্র্যান্ডট্র্যাঙ্ক রোডের বিশাল রেলওয়ে ট্র্যাকের চারলাইনের লেভেল ক্রসিং পথ আটকালো কিছুক্ষণ।

তারপর আবার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে। তালপুকুর, তালদীঘি পরিবেষ্টিত গ্রামবাংলা এবার চলল সাথে সাথে।



বর্ধমান জেলাকে কেন “গ্র্যানারি অফ ওয়েস্টবেঙ্গল” বলে তা বুঝলাম। পথের ধারে মরাই ভরা ধান, গ্রামের চালাঘরের পাশে বিশাল ধানের গোলা যেন পৌষ্পরবে ভুরি ভোজ খাইয়েও অফুরান। মনে হল

ওগো আমার, আমার গাঁয়ের, রাণীর গায়ের সোনা
দুচোখ ভরে দেখব সোনা, সোনার তুমি হাতে গোনা

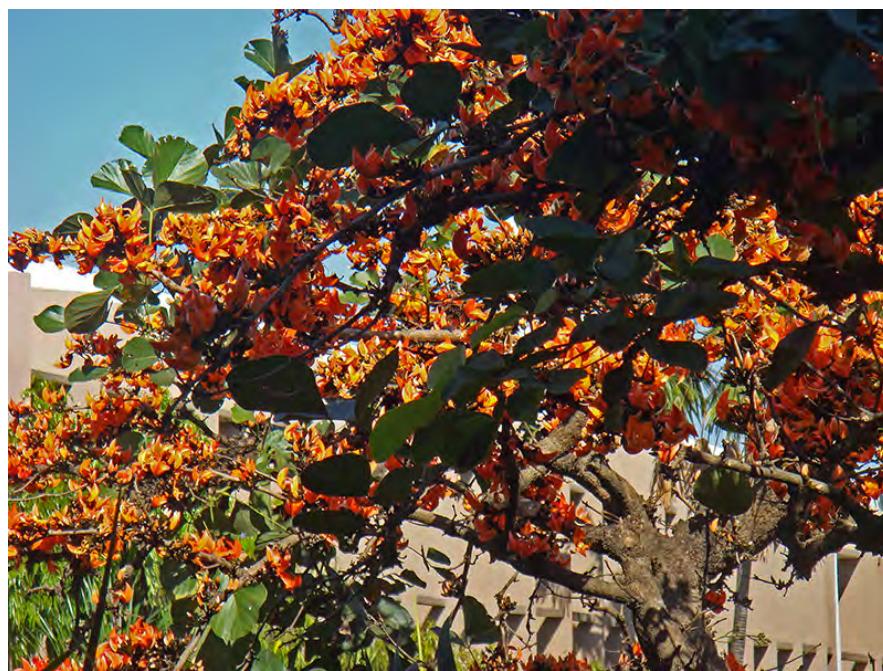
তাবনার খেয়া বইতে বইতে অজয়নদীর ওপর অবনস্তু এসে গেল। বর্ধমানের হাত ধরে বীরভূমে পাদিলাম। নূরপুর গ্রাম এল। তখন ঘড়িতে এগারোটার সূর্য। কিছুপরেই বোলপুর। দুপুর সূর্যকে মাথায় রেখে কবিগুরুর কর্মভূমিতে, ছাতিম, শিমুল, পলাশের শহর শান্তিনিকেতনে আর তারপরেই প্রাণিক পৌছলাম। চেনা পথ, অচেনা আনন্দে ভরে ওঠে বারবার। বোলপুরের প্রকৃতির রঙ এক এক সময় এক এক রকম। ফুলের বৈচিত্রে, পাতাবাহারের রঙিনতায় গ্রামবাংলার এই রাঙামাটি বোধহয় একসময় কবিগুরুকে আকৃষ্ট করেছিল। আর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী না থাকলে সাধারণ মানুষ এই অঞ্চলের প্রতি টান অনুভব করত না। দু'দিন ছুটি চাই শুধু।



হাওড়া থেকে গণদেবতা, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, শহীদ এক্সপ্রেস, ইন্টার সিটি এক্সপ্রেস, বিশ্বভারতী এক্সপ্রেস, আর সরাইঘাট এক্সপ্রেস; এই এতগুলি ভিন্ন সময়ের ট্রেন আছে বোলপুর বা প্রাণিক পৌছবার জন্য। আর কোনো অপরিকল্পিত ছুটির পিকনিক হলে গাড়ি নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে পড়লেই হল। শেরশাহ সুরীর মধ্যযুগীয় রাস্তার ওপর ইংরেজ তৈরী করেছিল গ্র্যান্ড ট্র্যাক্স রোড এবং সেটিকে এনএইচ-২ আখ্যা দিয়ে ভারত সরকার গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারালের কোলকাতা দিল্লী শাখা তৈরী করে। বর্ণালী-চতুর্ভুজ-সড়ক-যোজনার সার্থকতায় ভ্রমণের আনন্দ ছাপিয়ে যায়। মনে হয় কে বলে বাংলা আমার নিঃস্ব? মানুষ রীতিমত টোল ট্যাক্স দিয়ে গাড়িতে ভ্রমণ করছে এখন। ধন্যবাদ বিশ্বায়ন! ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI) মেন্টেন্যাল করছে! ধন্যবাদ NHAI!

চারলেনের রাস্তায় স্রোতের মত নিয়ম মেনে গাড়ি চলছে ঠিক বিদেশের মত; মাঝখানের ডিভাইডারে দৃষ্টিনন্দন বোগনভেলিয়া, করবী আর কলকে ফুলের বাতাসীয়া দোলা দেখে কৃতজ্ঞতা জানাই NHAI ইঞ্জিনিয়ারের রঞ্চিশীলতাকে।

গাড়িতে যাবার কথা বললাম এই কারণে। আর বললাম এভাবে গেলে কোনো প্ল্যান ছাড়াই বেরোনো যায়। ট্রেনের টিকিট কাটা, স্টেশন যাওয়া, সময় মত ট্রেন ধরার হ্যাপা নেই। আর ব্যস্ততার জীবনে হঠাৎ মনে



করলেই বেরিয়ে পড়া যায় এইসব কাছেপিঠের জায়গায়। কোলকাতা থেকে গাড়ি করে গেলে বোলপুর পৌছতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টা। ভোর-ভোর বেরঞ্জে অনেকবার ঘন্টা তিনেকের মধ্যেও পৌছে গেছি। মাঝে শক্তিগড়ে দাঁড়িয়ে প্রাতরাশ সেরে নেওয়া যায় গরম কচুরি আর চা দিয়ে। এন এইচ-২ ধরে সোজা যেতে হবে পানাগড় অবধি। পানাগড়ের ভাঙ্গা ট্রাকের সারি পেরিয়ে তারপর ডান দিকে পানাগড়-মোরগ্রাম হাইওয়ের বাঁকে ঘুরে, অজয় নদী পেরিয়ে, শাল, সোনাখুরি, ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল। ইলামবাজারের ঘন জঙ্গলমহল। এতসব যারা কলকাতা থেকে যাবেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলা হল।

শিল্পায়নে ব্রতী হয়ে আমরা “অরণ্যমেধ” যজ্ঞে সামিল হয়েছি, তবুও বাংলার সবুজ এখনো যা আছে তা অনেক রাজ্যের ঈর্ষা আর আমাদের গর্ব। তারপরেই কবিগুরুর কর্মভূমিতে, ছাতিম, শিমুল, পলাশের শহর শান্তিনিকেতনে।

শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতীর আশ্রম পেরিয়ে রতনপল্লী, বনপুলক, শ্যামবাটি, তালতোড়কে সরিয়ে রেখে দুপুর সূর্যকে মাথায় নিয়ে বোলপুর বা প্রাণ্তিক পৌছে সেরে নেওয়া যেতে পারে দুপুরের খাওয়া। বোলপুর বা প্রাণ্তিকে অনেক হোটেলে আছে থাকার ব্যবস্থা। কলকাতা থেকে বুক করে এলেই হল।

শ্যামবাটির মোড়ে সেচ দণ্ডের ক্যানালের জল বয়ে চলেছে। ভরা বর্ষায় এই জলের অমোঘ আকর্ষণ আমাকে আরো টানে। প্রতি শনিবারে ক্যানালের ধারে খোয়াইয়ের হাট বসে। এটি আর কোথাও দেখিনি। সূর্যাস্তের ঠিক ঘন্টা দুয়েক আগে থেকে বসে এই হাট। কত শিল্পীরা নিজ নিজ শিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেন সেখানে, আর সাথে থাকে বাটুলের গান। রাঙামাটির পথ ধরে আমরাও পৌছে যাই সেখানে। ডোকরার গয়না, কত রকম ফলের বীজ দিয়ে তৈরী গয়না, কাঁথার কাজের বাহার, পটশিল্প, বাটুলগানের আনুষাঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র, তালপাতা, পোড়ামাটির কাজ, বাটিকের কাজ, আরো কত কিছু এনে তারা বিক্রি করে। কিন্তু অন্ধকার হবার পূর্বমুহূর্তেই পাততাড়ি গোটাতে হয় তাদের। সোনাখুরির ছায়ায় প্রাণ্তিকের বনবীথি যেন ঘুরে ফিরে নতুন করে ধরা দেয় আমার কাছে।

প্রাণ্তিকে সে রাতটা থেকে পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরঞ্জে হল মামাভাগনে পাহাড় ও হেতমপুর রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

প্রাণ্তিক থেকে সোজা খোয়াইয়ের পথ ধরে শ্রীনিকেতনের দিকে ইলামবাজারের জঙ্গলের পথ। ইলামবাজার থেকে একদিকে পানাগড়ের রাস্তা। সেদিকে না গিয়ে আমরা দুবরাজপুরের রাস্তা ধরলাম। দুবরাজপুর থেকে আরো ১২ কিলোমিটার গেলে পড়বে বক্রেশ্বর... যেখানে সতীর “মন” পড়েছিল।

এই জলাধারটি বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের জল সরবরাহ করে। এবার আসি বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য। “বীরভূমের মাহাত্ম্য” বইটিতে বলা গল্প অনুযায়ী (মহাভারত অবশ্য অন্য কাহিনী বলে), সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিবাহের সময় ইন্দ্র সুরত নামে এক মুনিকে ভীষণ অপমান করেছিলেন। যার ফলে সেই সুরত মুনির শরীরে আটটি ভয়ংকর ভাঁজ পড়ে যার জন্য তাঁর নাম হয় “অষ্টাবক্র” মুনি। এই অষ্টাবক্র মুনি বহুদিন শিবের তপস্যা করার পর শিবের আশীর্বাদে মুক্তি পান। তাই এই বক্রেশ্বর শিব খুব জাগ্রত। এখানে দশটি উষ্ণ প্রস্তরণ আছে যাদের জল গড়ে ৬৫ থেকে ৬৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সতীর “মন” বা ভ্রুগুলের মধ্যবর্তী অংশ পতিত হয়। আপাত অনাড়ম্বর মহিষমর্দিনী মায়ের মন্দিরে দাঁড়ালে বেশ ছমছমে অনুভূতি হয়। আর সাথে বক্রেশ্বরের শিবমন্দিরটিও দেখে ঘোরা যায়। বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রেস্তরণে স্নানের ব্যবস্থাও আছে।

ইলামবাজারের জঙ্গলের পথে লম্বা লম্বা শাল-সোনাবুরি-ইউক্যালিপটাস গাছগুলো যেন গাড়ির সাথে আপেক্ষিক গতিময়তায় চলতে শুরু করে। ইলামবাজার জঙ্গল পেরিয়ে ইলামবাজার পৌঁছে ডানদিকে ঘুরে সুপুর গ্রাম পেরিয়ে পড়ল দুবরাজপুর। বসন্তের সবুজ কচিপাতায় ভরে গেছে গাছ, আর চৈতী হাওয়ায় মাতাল প্রকৃতি। ডাঙায় সবুজ ধান, পুরুরের জলে গ্রামের চালাঘরের ঠান্ডা ছায়া, ধানের গোলার ছায়া, তালগাছের ছায়া। নীল আকাশের চাদরে শিমূল, মাদারফুলের লাল লাল ছাপ, মধ্যে মধ্যে অশোকের কমলা কুঁড়ি। দুবরাজপুর কামারশালের মোড় পেরিয়ে দুবরাজপুর সিভিল আর ক্রিমিনাল কোর্ট, থানা, মিউনিসিপালিটি আর তারপরই রাজবাড়ি। সেখান থেকে এক কিলোমিটার গেলে পড়বে মামা-ভাগনে পাহাড়।

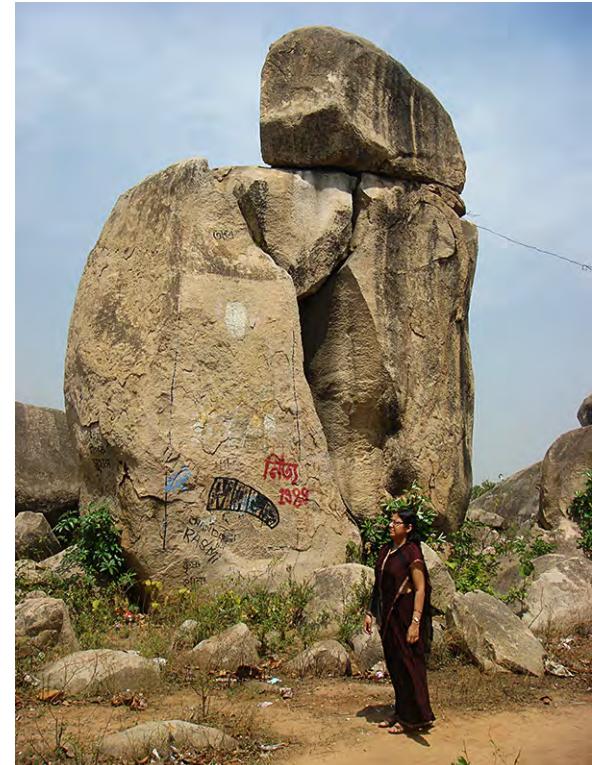


নীল এক আকাশের নীচে একসাথে কত কত জীবন্ত পাহাড়ের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। কত কত পাথর, নানা আকৃতির কত কত নাম না জানা পাহাড় হয়ে উঠেছে সেগুলো। কোনোটি সূর্যের কাছ থেকে ঢেকে রেখেছে নিজেকে। কেউ আবার চাঁদের মোমজোছনায় ভিজিবে বলে সকলের থেকে আলাদা করেছে নিজেকে। কোনটির গায়ে হেলে পড়েছে সজনের ডাল, কোনটির গায়ে শিমূল।

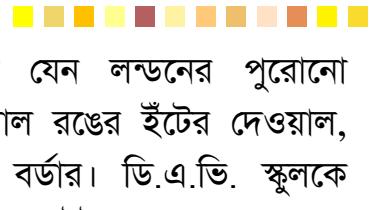
যৌথ পরিবার ভেঙে আজ টুকরো টুকরো অণু-পরিবার হয়ে গেছে, কিন্তু কত জল-বাড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প-সুনামি-আয়লার তাঙ্গবেও টিকে রয়ে গেছে এই পাহাড়-পরিবারটি। জেঠতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো, মামাতো পাহাড়-ভাইবোনেরা তাদের বন্ধুতায় রচনা করেছে এক প্রাকৃতিক নৈকট্য, এক নেসর্গিক আনন্দ-সংসার। এই সংসারে নেই কোনো হিংসা-বিবাদ, স্বার্থ সংঘাত। শুধু আছে টিকে থাকার গর্ব আর অনাবিল, অকৃপণ দানশীলতা।

মুঞ্চ হলাম বিস্ময়ে। উঁচু, নীচু, ছোট, বড়দের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কেবলই মনে হয়েছে, আহা যদি হিমালয়ের কাছাকাছি এরা থাকত তাহলে তুষারপাতের স্বর্ণীয় সুখ পেত এরা! রড়োডেন্ড্রনও বুঝি বরত এদের বুকে! বরফ গলা নদীর জলে ধূয়ে যেত এদের না পাওয়ার দুঃখ! ঘেসিয়ারের তিরতির করে বারনার শব্দও শুনতে পেত এরা! পশ্চিম বাংলার এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক শুক্রতা বুঝি এদের স্বৈর্য এবং ধৈর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে তাই কালের প্রতিটি দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে এরা হয়ে উঠেছে মহাস্থবির জাতক। এক এক সময়ে মনে হল আমরা বুঝি কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পেলেও পেতে পারি। কিছু পরেই কোনো এক পাহাড়ের শিলাখণ্ডে বিলীয়মান জীবাশ্ম দেখে থমকে গেছি। সেদিন পাহাড়ে দোল খেলছিল অনেকেই। পাহাড়-পরিবারের ইকোসিস্টেম কিছুটা অশান্ত হলেও প্রকৃতির দোল আর দোলের প্রকৃতি পাহাড়কে আরো রঙিন করেছিল। মাঝেমাঝেই কানে ভেসে আসছিল “হোলি হ্যায়” এর উভেজনা। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল একটু জল অনুষঙ্গের কথা। জল-পাহাড় একসাথে জমে যায় সবখানে, সবকালে।

মনে পড়ল সত্যজিতের গুপীবাঘাকে। উঁচু পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে বারেবারে ওরা হাতে তালি দিয়েছিল আর বলেছিল শুণি! ভাবলাম দেখি যদি তালি দিয়ে শুণি বলে পৌঁছে যেতে পারি রাজার কাছে। বর্ষায় না জনি কত সবুজ মসেরা কার্পেট পেতে রাখে এই পাথরে! কত কোঁকড়াচুলের ফার্ণ-সুন্দরীরা হাত নেড়ে অভিবাদন জানায় ট্যুরিস্টদের। না থাকুক সিকিমের অর্কিড, রড়োডেন্ড্রন, ম্যাগনোলিয়ারা। আমার বাংলার বসন্তের হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়া-পলাশ পাপড়ি তো আছে এদের আশেপাশে। আর আছে সজনে আর নিমফুলের গন্ধ বাতাস। এই নীল নির্জনতায় তারা আছে তাদের মত, মিলেমিশে, এক হয়ে। পাহাড়ের উল্টোদিকে কিছুদূর গেলেই ‘নীল-নির্জন’ দ্যাম যা একটি ট্যুরিষ্ট স্পটও বটে।



পাহাড়দের সাথে আলাপ-পরিচয় সেবে দেখে নিলাম পাহাড়েশ্বর শিবলিঙ্গ। সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা। রঙিন আবীরে পাহাড়েশ্বর ছিলেন জাগ্রত। এক মজার দোল খেলা হল তাঁর সাথে। ফেরার পথে স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মিনিট পাঁচকের মধ্যেই হাজির হলাম হেতমপুর রাজবাড়ির সামনে।



প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার। ঠিক যেন লন্ডনের পুরোনো কলেজগুলোর স্টাইলে তৈরী। লাল রঙের ইঁটের দেওয়াল, মধ্যে মধ্যে কালো আর হলুদ বর্ডার। ডি.এ.ভি. স্কুলকে দানপত্র করে দিয়েছে রাজবাড়ির এস্টেট। আর অন্দরমহলে এখন ইস্কুল বসে টেন প্লাস টু... প্রকান্ড বাগান-চতুরে অকেজো, অনাদৃত পাথরের ভাঙা ফোয়ারা, ভাঙা পরীদের চাঁদের হাট, মধ্যে মধ্যে নিমগাছ। রাজবাড়ির কিছুটায় রয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তবে সত্যি সত্যি একদিন যে রাজকীয়তায় আচ্ছন্ন ছিল এই অঞ্চল তা এখানে পা দিয়েই বোঝা গেল। পাশেই একটি মন্দির রয়েছে আর কিছু দূরেই হেতমপুর কলেজের ছাত্রাবাস চোখে পড়ল। রাজবাড়ির প্রধান ফটক দিয়ে আমাদের গাড়িটি বেরিয়ে আসার সময় আমি বাইরে নেমে একটা ছবি নিলাম। মনে হল কেউ যেন আমাকে পেছনে ডেকে বলল, “কোথা থেকে আসা হল বললে না তো! ভালো লাগল, তবু তোমরা এলে বলে! আবার এসো কিন্তু!”



পত্রের পাঁচালি

সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়

যা নিয়ে আজ লিখতে চলেছি, আজকের ই-মেল আর মোবাইলের রমরমার যুগে তার প্রয়োজনীয়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। মনে পড়ে স্কুলে পড়ার সময়, ক্লাসে একজন শিক্ষকের সরস মন্তব্য ছিল – ১৫ পয়সা দামের একটি পোস্টকার্ডের প্রতি আমাদের অবহেলা কখনো কখনো জুতোর শুকতলার প্রতি অবহেলাকেও ছাপিয়ে যায় (তখনও মাননীয় সরকার পোস্টকার্ডকে মূল্যবৃদ্ধির সম্মানে সম্মানিত করেননি)। বাস্তবিক, আজকাল খুব প্রয়োজন বাদ দিলে, আমরা চিঠি লেখার জন্য কলম ধরতে হলেই কুঁড়ের বাদশা বনে যাই। অথচ একসময় চিঠিই ছিল দূর থেকে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম, এমনকি সাহিত্যের আঙিনাতে আজও তার জন্য একটা জায়গা রেখে দেওয়া আছে। সেই আত্যজনই, যিনি কী ভাবে যেন সম্পূর্ণ বিতাড়ন্টুকু এড়িয়ে গেছেন, হলেন আমার এই লেখার বিষয়বস্তু।

চিঠি নিয়ে যত আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলো মনে হয় মোটামুটি তিন রকমের – ব্যাকরণভিত্তিক, সাহিত্যভিত্তিক, আড়তভিত্তিক। ব্যাকরণের ‘ব্যা’-করণ থেকে স্কুল ছাড়লেই অব্যাহতি পাওয়া যায়, কিন্তু সারাজীবন মেনে চলতে হয়, কারণ হাজার হোক অফিসের বসকে ‘মাই ডিয়ার’ বলা চলে না। সাহিত্যভিত্তিক আর আড়তভিত্তিকের তফাঞ্টা একটু সূক্ষ্ম। প্রথমটা সাহিত্যের রঙে একটু রঙীন বাবু, দ্বিতীয়টা মুখের ভাষার পোশাকে আম-আদমি। প্রথমটা পত্রলিখনকে সম্মের চোখে দেখে, দ্বিতীয়টা চিঠি লেখাকে ঠেক দেওয়ার আমেজে নিয়ে যায়। আমি আমার এই পরিসরে আড়তার স্বাদই পরিবেশন করতে চাই।

আমার ছেলেবেলা কেটেছিল গ্রামের বাড়িতে। চিঠি ছিল প্রিয়জনের সাথে যোগাযোগের একমাত্র গতি। তখন মামা-বাড়িতে দাদুকে যখন চিঠি লেখা হত, বায়না করতাম, আমিও একটু লিখি। পোস্টকার্ডের একটুখানি কোন কোণে, যথোচিত সম্মোধনে, মায়ের নিজের বয়ানে একলাইন হয়তো লিখতে পেতাম। কিন্তু তা-ই ছিল কত না আনন্দের বিষয়। আর যখন উত্তর আসত, তখন আমার জন্য একটু লেখা থাকলেই কৃতকৃতার্থ হতাম। আমি তো আম-আদমি, স্বয়ং রবি ঠাকুর, যাঁর চিঠিগুলি সাহিত্যকীর্তির অনুপম নির্দর্শন, তাঁকেও জীবনে প্রথম চিঠি লিখতে হয়েছিল তাঁদের বাড়ির এক কেরানীর নির্দেশ অনুসারে। সবাই অবশ্য রবি ঠাকুরের বাবা নন যে কচি হাতের লেখার উত্তর দেন। কারণ কচিকাঁচারা প্রথম চিঠি লিখতে গিয়ে অনেক মজার মজার ভুলও করে ফেলে। মনে পড়ে, এরকমই এক অপোগণ্ড প্রবাসী বাবাকে চিঠি লিখেছিল, “ছাগলছানাটি বড় হয়েছেন। কচি কচি ঘাস খেয়ে মা দু’বার বমি করেছে দাদার মুখে। শুনবে আমরা ভালো আছি। ইতি – ”। গঙ্গোলটা যে যতিচিহ্নগত, তা আশা করি পাঠক বুবৈবেন। যখন ক্লাস ফাইভে আমার সুদীর্ঘ বারো বছরের ছাত্রাবাস জীবনের শুরু হল, তখন একটা প্রাণ্ণি ছিল চিঠি লেখার স্বাধীনতা। আগ্রহের আতিশয়ে প্রতি রবিবার চিঠি লিখতাম বাড়িতে।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, স্বনির্ভর হওয়ার সাথে সাথে চিঠি লেখাটা ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিষয়বস্তু আর চিঠির প্রাপক চিঠির গুরুত্ব নির্ধারণ করে। একটা কথা মানতেই হয় চিঠি লেখার প্রারম্ভিক ল্যাঠা প্রচুর। পোস্টঅফিস যাও রে, খাম বা পোস্টকার্ড কেনো রে, লিখে আবার সেখানেই ফেলে এস রে। তাগিদ যদি গুরুতর হয়, তবে সেটাই এতটা ‘কসরত’ করিয়ে ছাড়ে। যেমন – কাজের অবসর, বা অন্য কোনো ‘অফিশিয়াল লেটার’। নইলে মনে বলে ‘লিখ’, আর হাতে ধরে খিল। অতীতে উপায়ন্ত্র ছিল না বলে লোককে যে’রকম চিঠি লেখার আয়োজন করতে হত, তা একটা আলাদা রম্যরচনার

বিষয়। ‘বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ বইটাতে এরকমই একটা ছবি আছে। কয়েক ক্রোশ হেঁটে পোস্টকার্ড কিনে এনে চিঠি লিখে শেষে দেখা গেল যাঁকে লেখা হচ্ছে তিনি বিগত হয়েছেন। আমাদের এক শিক্ষকের ছাত্রাবস্থার এক অভিজ্ঞতার কথা বলি। তাঁর বন্ধু পুজোর দশমীর পর কলকাতা থেকে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে তার বাবাকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে জাঁকালো এক চিঠি লিখবে মনে করেছিল। কিন্তু আটদিন ধরে সে কেবল রাতে মনে করে, আর সকালে ভুলে যায়। শেষে তার চিঠির বয়ান হয়েছিল –

“পূজনীয় বাবা,

টাকা পাঠাইয়া প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

বিশেষ আর কী?

ইতি – ”

এ-প্রসঙ্গে বলা ভালো, জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর বইয়ের কাটতি সম্পর্কে প্রকাশককে চিঠি দিয়েছিলেন, “?”, আর প্রকাশকের উত্তর ছিল “!”, অর্থাৎ ‘দারুণ’!

অনেক সময় আবার চিঠি লেখার থেকে চিঠি ‘ড্রপ’ করা বিষম জ্বালা। এক ভদ্রলোক তাঁর প্রতিবেশীকে সকালবেলা একটি চিঠি ‘পোস্ট’ করতে অনুরোধ করেছিলেন। সঙ্ক্ষেবলা দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করেন, “ফেলেছেন তো?” প্রতিবেশীর রাগত উত্তর, “এত অবিশ্বাস! নিজের চিঠি নিজেই ফেলুন তাহলে।” এই বলে সেই চিঠি আবার ফিরিয়ে দেন। আরেকজন তাঁর বন্ধুকে জন্মদিনের আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। ঐ বিশেষ দিনে তাঁর বন্ধু খালি হাতে তাঁর বাড়িতে এসেছেন। বন্ধু কথার পিঠে জিজ্ঞাসা করেন, “আজ তোমার বাড়িতে কীসের ধূম?” প্রথম ভদ্রলোক তখন দেখেন তাঁর লেখা চিঠি বুকপকেট থেকে আর বের হয়নি। পোস্ট করবেন বলে বেরিয়ে তারপর তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, বহু চেষ্টা করেও তিনি মনে করতে পারেননি। আরেকজন তো ঠিকানা লিখে বয়ানটা ধীরে ধীরে লিখবেন ভেবেছিলেন এবং বয়ানটা মনেই রেখে ফাঁকা চিঠি পোস্ট করেছিলেন। আমি নিজে অনেকসময় এক মাস আগের তারিখ বসিয়েছি।

কিন্তু অনেক সময় চিঠি লেখায় প্রাণের টান কলমের টানের থেকে বেশি হয়। যেমন, প্রেমপত্র। লিখতে যেমন লাগে সময়, তেমন লাগে কল্পনা। তবু একটা নমুনা, “আমাদের এই প্রেম টিসকো স্টীলের মত শক্ত, ফেভিকলের জোড়ার মত অটুট। আশা করি, বামফ্রণ্টের মত দীর্ঘজীবী হবে।” তবু প্রাণের ত্বর্ষা থামে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক সৈনিক তাঁর স্ত্রীকে হাজারখানেক চিঠি দিয়েছিলেন।

অনেকের আবার চিঠি লেখার বাতিক থাকে। জনেকের অভিজ্ঞতা – তাঁর এক শিক্ষক সহকর্মীকে কলেজের অধ্যক্ষ কমপক্ষে বিশ’টা ‘কমপ্লেইন লেটার’ লিখেছিলেন। সেই সহকর্মীর সখেদ উত্তি ছিল, “জানেন, একেক সময় মনে হয়, আপনারা যাঁরা কমপ্লেইন লেটার দেখেননি, তাঁদের জন্য এগুলো এক্জিবিট করি।” ভদ্রলোকের প্রশ্ন, “করেননি কেন?” সহকর্মীর নির্বিকার উত্তর, “ইংরাজীটা বড় ভুল যে!” ফ্রান্সের এক রাজা তাঁর প্রবাসী বখাটে ছেলেকে উপদেশ দিয়ে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, এবং ছেলেটি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে আরো উপদেশ চাইত। আসলে সে যা করত, তা হল, অটোগ্রাফ শিকারীদের বাবার চিঠি বেছে দিত। রবীন্দ্রনাথের ছন্নপত্রের অনেক চিঠি সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থার বিবরণ মাত্র, তবু বাতিক থামেনি।

এ তো গেল লেখকের জ্বালার কথা। প্রাপকের জ্বালার কথাও কম না। অনেকের হাতের লেখা বুঝে চিঠি পড়া এতই দুর্ঘট যে মনে হয় চিঠির সাথে লেখককে পোস্ট করা উচিত ছিল। শুনেছিলাম সাহিত্যসম্মান বক্ষিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রকে এক চিঠি লিখেছিলেন। সেটা না বুঝতে পেরে দীনবন্ধুবাবু একটা কাগজে হিজিবিজি

এঁকে পাঠিয়েছিলেন। অনেকের চিঠি লেখার বাতিকের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে প্রাপক। এরকম একজন উত্তর দিয়েছিল, “যদি পার, এবারে বরং নিজেকে চিঠি লেখা অভ্যাস করো।” আবার অনেক প্রাপক চিঠি কদর দেন। যেমন এক ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল, চিঠি উল্টো করে ধরে পড়া। কারণ জিঞ্জাসা করলে বলতেন, “যিনি লেখেন, অনেক কষ্ট করে লেখেন। তাঁর শ্রম মাঠে মারা যেন না যায়, তাই উল্টো করে পরি, যাতে তাড়াতাড়ি শেষ না হয়।”

আমার এই পত্র-পাঁচালির অনেকটা পথ পেরিয়ে এবার থামতে হয়। থামার আগে একটা কথা বলে যাই যে চিঠি লেখা হয়ত কাগজের ওপর হাতে লেখাতে অবলুপ্ত হতে চলেছে, কিন্তু আবার নতুন রূপে প্রকাশ পেতে চলেছে ই-মেলের মাধ্যমে। তাকে নতুন নামে ডাকছি, কিন্তু সে ঐ একই কাজ আরো দ্রুত করছে। কিন্তু আবার এ কথাটাও সত্য, কলমটা ধরে কাগজের ওপর প্রাণের ভাষা লিখলে তাতে হৃদ্যতার পরশ যতটুকু থাকে, ইমেলে কি সেই আবেগ পাওয়া যায়? আবেগটা কেমন জোলো হয়ে যায়। আবার এটাও হতে পারে, সে আবেগ নতুন রকমে আসে, তাকে ধরতে গেলে একটু আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী চাই।

সবাই হয়তো বলবেন, সারাটা লেখার মধ্যে অন্যদের কীর্তির কথাই বেশী বললাম, আর শেষে বিজ্ঞের মত নিজের মতামত দিয়ে শেষ করছি, যেন আমি এ ব্যাপারে কত বড় ওস্তাদ। তাই বিদায়ের আগে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, যেটা কেবল চিঠি লেখার মাধ্যমেই করতে পেরেছিলাম। একবার কোনো এক কনফারেন্স-এ যোগ দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের চিঠি লিখতে হয়েছিল। ব্যাপারটা বিরক্তিকর, তার ওপর কাকে সম্মোধন করব খুঁজে পাই না। তাড়াতাড়িতে কনফারেন্স ওয়েবসাইট থেকে একটা নাম জেনে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই চিঠি লিখলাম। চিঠির উত্তর এলো, “আপনার আগ্রহ দেখে আমরা আপ্স্টুত। তবে আপনি যাঁকে সম্মোধন করেছেন, তিনি পাঁচ বছর আগেই গত হয়েছেন, এবং তাঁর সুরণেই এই কনফারেন্স। দয়া করে ওয়েবসাইট-টা ভালো করে পড়বেন।”

স্বর্গীয় সুভাষ চক্ৰবৰ্তীর উক্তি ছিল, “মৰা মানুষ বাঁচানো ছাড়া আৱ সব কাজই আমি পারি।” আৱ বৰ্তমান লেখক?

“মৰা মানুষ বাঁচাইয়া প্ৰমাণ কৱিলেন তিনি কীৱৰপ কৰ্মী।”

Space Travel for last 50 years

Kumar Som

Dreams give us the tremendous power to conceive what might be possible. The three main stalwarts who dreamt that space travel was possible were Tsiolkovsky, Robert Goddard and Von Braun. Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935), an unassuming Russian school teacher, wrote a paper explaining mathematically that the horizontal speed required minimum orbit around the Earth of 5 miles per second can be achieved by means of multistage rocket fired by liquid oxygen and liquid hydrogen. Robert Goddard, an American Physics professor, invented the first liquid propelled rocket, and from 1930 to 1941 launched rockets of increased complexity and powerful capability. Though the foundations of space science were chalked out during the 1700s but it took 200 years before the ideas could be put into practice. Wernher Von Braun, a German engineer, worked in the design of deadly V2 rocket that spread the venom of death killing many during World War in the Western front. But it was the German V2 rocket that showed the way to others for building powerful rockets in succession. He was the pioneer who pushed rocket science to its pinnacle by developing powerful rockets with incremental capacities, starting with Redstone Atlas which had begun development in 1950s as Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs) and finally the Saturn rockets that put the victorious astronauts on the Moon from 1969 to 1972.

Space is a large laboratory where experiments in many novel fields that scientists and engineers carried out in the last fifty years have been enriching our daily lives. The whole period of space exploration, during this time, may be considered to consist of many successive eras starting in the 1950s, such as the Cold War era, the Apollo Moon era, the era of Space shuttle, robotics, the International Space Station, and Sky-lab, the recent era of commercial activities involving telecommunication, navigational, meteorological and Earth Resources satellites, and last but not the least, the present Constellation program, i.e. Heavy lift Ares I and Ares V Rockets, and the Orion Spacecraft. The plan was to land by 2020 on Moon and then Mars; however, it has been recently discontinued owing to paucity of funds.

The Cold War era was the home of space exploration; the warring superpowers during the 1950s prompted the development of powerful rockets for launching their ICBMs that pushed them to the brink of space. It was on April 12, 1961 that Yuri Gagarin of Russia in 53.6 kg Vostok 1 reached the outer limits of space. There has been no looking back since. Advances in trajectory control and astrodynamics have made it possible by continued space experimentation to put a spacecraft manned or unmanned, exploring and navigating through gravitational forces of solar system to any point on space with precision. Mankind had advanced thus far to the limits of space. Its astronauts are able to carry out extravehicular activity (walking in space).

To visit another planet like Moon beyond low earth orbit (200 miles above earth) we needed one Mother Spacecraft docked with another Lander craft. During the Apollo moon missions, astronauts could dock and undock at will while detaching the Lander and landing on the Moon; at the end of the mission, they would take off from the Moon in the jet powered Lander, dock to the Mother spacecraft, and then safely get back to Earth. Astronauts

mastered these skills with pinpoint accuracy with advances in trajectory control negotiating the gravitational forces of planets, as well as in astrodynamics (science of dynamic movement in space), utilizing rocket power and thrusters fitted on the body and wings of the spacecraft.

Rocket jet propulsion is based on the fact that if a vehicle ejects chemical exhaust at a high speed through a nozzle, in a given direction, a force acts in opposite direction. This is briefly according to Newton's third law of motion, which states that to every action there is an equal and opposite reaction. Possibility of putting vehicles into orbit around the Earth was understood by Isaac Newton in the late 1600s as an aftermath of his discovery of law of gravitation. While aeronautics is a science of flying aircraft in the atmosphere, astronautics is the science of space flight; it is the knowledge of navigating the wilderness of space, with the spacecraft negotiating different gravitational forces of the solar system.

A reliable rocket is the first requirement for a successful launch into space when it transforms the inherent chemical energy of the fuel into kinetic energy. Rockets operate by firing a liquid or solid propellant which gives its forward thrust to propel it to outer space. Outside Earth's atmosphere, in space the rocket engine carries not only its fuel but also an oxidizer, unlike any air breathing engine or commercial aircraft that takes oxygen from the Earth's atmosphere. As the velocity which can be obtained by using chemical reactions is limited, chemical rockets require very large quantities of propellant when used for missions requiring large velocity requirements. Greater and heavier spacecraft payloads require large velocities, and hence, larger rockets, sometimes multistage rockets – which means one rocket firing after another is used to provide extra thrust in stages. Huge quantity of propellant is needed to reach and go beyond the low earth orbit (around 250 miles from earth), getting into the Moon's or Mars' arena.

Apollo Moon era was the most technological advancement-rich era in space history. During this time, astronaut piloting skills, as well as essential processes like docking and undocking the Lander to the Mother Spacecraft, were executed with military precision. Kennedy's famous speech on May 25, 1961 was the key impetus for space victory, when he declared that he will land Man on the Moon and bring him back to mother earth. It was a challenging promise because then astronauts had to leave low earth orbit for the Moon's gravitational field quarter million miles away.

The whole process was planned in three stages. First, a man was sent in a metal capsule, Mercury craft, to test his ability to remain there. Secondly, astronauts went into another improved craft, Gemini, which could maneuver around its three axes, and allowed space walks and docking with another spacecraft. The third and final victory spacecraft Apollo was designed and attached with another spacecraft, the Lander, which could dock and undock at will to land on the Moon and take off.

Man landed on the Moon on April 11, 1969. Since then, a total of 12 men have walked on the Moon; there was Lunar excursion module built and used later and all men spent about 300 hours on lunar surface. A fitting conclusion to the Apollo Moon era was a Sky Lab orbiting station during 1973-74 which brought the competition to full circle. In 1975 the USA and Soviet Union achieved the first joint Apollo Soyuz project, a true picture of space co-operation.

The Space Shuttle era started in 1981 by the test flight of Columbia Shuttle. However, the concept had spread out for over many years starting out much before the Apollo Moon era. It started when a German engineer Sanger foresaw such a possibility where a spacecraft would need to be flown as a rocket assisted spacecraft to begin with, and as an aircraft landing on a horizontal runway at end of the mission, unlike the metal capsules launched in space earlier. The airplane having been invented by the Wright Brothers in 1903, the concept of an aircraft flying at higher and higher speeds was being tried out successfully. Some of the jet powered fighter-plane pilots managed to reach the speed of sound (760 miles per hour at sea level). Since then humankind knew that airplanes could be pushed to fly at hypersonic speeds.

X (experimental) planes were designed to be flown with rocket engines; NASA started a new project of designing and flying X-15. One of the dreams of flying space crafts came true from the lessons learnt from the X-15 program between 1959 to 1968. X-15 brought to light the structural and aerodynamic problems at hypersonic speeds. It was indeed a space plane forerunner and prompted NASA to design flight-capable vehicles – like a Space Shuttle – that

could be utilized as space workhorses replacing the old metal capsules. As a prerequisite, a fleet of airplanes reaching low earth orbit needed to be flown and experimented upon by the end of 1970. Finally a Space Shuttle was born from many alternatives as the most viable solution to the issue of designing a partially reusable spacecraft.

Space Shuttle is essentially a rocket launched from earth's surface which is able to enter a low earth orbit and then re-enter Earth and land as an aircraft. The only other parallel to Space shuttle is the Russian Buran powered by Energia rocket with a payload of 30 tonnes which flew an orbital test flight in November 1988. A Space Shuttle, on the other hand, can put a payload of slightly more than 24 tones in low earth orbit. It consists of a large orange colored external tank (ET), two solid rocket boosters (SRBs) and an Orbiter vehicle similar in shape to a Boeing aircraft where crew and payload is carried.



Space shuttle Atlantis, with orange colored ET, two SRBs and the orbiter;
documentation of mission STS-45 (Courtesy: US Naval Academy, Annapolis, MD)

The Shuttle launches vertically like a rocket, lifting off on SRBs and then by the power of its three main engines which are fuelled by liquid hydrogen and liquid oxygen from the external tank. Upon reaching the speed of 17,500 miles per hour (7.8 km/s) necessary to

enter a low earth orbit, the main engines are shut down, the external tank (that can be reused) jettisoned, and the Orbital Maneuvering System (OMS) engines started to adjust the orbit. Orbiter carries a crew of five to seven; its payload capacity is 50,000 lbs (about 24 tonnes). Upon completion of its mission, the Orbiter fires OMS thrusters to drop out of orbit and reach the lower atmosphere to glide down and land back on a horizontal runway. The Space Shuttle is the world's most complex huge machine and a technological marvel of computer, electronics and high speed super-charged engines. It is also a marvel of material science, with about 3600 ceramic tiles covering its body to absorb the extreme heat on reentry. Recently, there has been a lot of advancements in the mirror-like cockpit display (such as in modern aircrafts) and many engine-heat and vibrational sensors that warn the pilot against disasters of the kind that have occurred in the past. The International Space Station formed in co-operation with ten nations is still in the low earth orbit, and needs occasional servicing by the Space Shuttle. However, the Space Shuttle has been phased out, with its last flight on July 21, 2011. It was planned to be replaced by the Constellation program, which has since been shut down. In September 2011, NASA announced working on a future platform to launch space crafts from.

Tremendous commercial activities have taken place since we started venturing into space. Telecommunications satellites have brought people of the world closer to each other by improving telephone communications and TV broadcasts. Navigational satellites can be of dual use, civil and military. Meteorological satellites observe Earth from space, keeping an eye on changing weather conditions over the world. The Earth Source satellites operate in a relatively low earth orbit, altitude of 500-1000 km; their field of application is geology, hydrology, oceanography and agriculture. These satellites are used to study crops and vegetations, among other things. Beyond commercial activities, there are scientific satellites doing fundamental physics research, astronomical missions, engineering and materials research, and finally observing the Earth from a distance.

Space probes for over last 30 years have reached all the planets of our solar system; some are still probing. Scientific probes of planets have yielded a great deal of information; very thin discs of dust have been discovered around Jupiter and Uranus; the surfaces of Venus and Mercury have been studied in detail. Unmanned Voyager spacecraft has visited all the planets outside the orbit of Mars. Unmanned Space probes, landing on Moon and Mars, have provided useful scientific information required for future explorations.



Flag of the US carried on board Apollo 14 during its moon mission under the command of Astronaut Alan Shepard
(Courtesy: US Naval Academy, Annapolis, MD)

Mars. Unmanned Space probes, landing on Moon and Mars, have provided useful scientific information required for future explorations.

In conclusion, we as human beings have achieved a lot in Space-related pursuits – from the staggering first flights, putting the first astronaut in orbit; landing on the Moon; and sending over a hundred space shuttles in many flights. We have conquered the science and technical know-how of sending a man to Space and allowing the performance of a “walk in space”; we have mastered the technique of docking one spacecraft to another; we have learnt how to take advantage of the gravitational forces of different planetary bodies and steer a spacecraft to any point in space. However, with the present technology we still cannot immediately colonize Moon and Mars. If we keep going in this manner, we may land in future on the Moon again, and perhaps on Mars and beyond.

Editors' Note: Our readers in the United States may soon be able to witness first-hand some of the fascinating devices and equipments mentioned in the article. Following the conclusion of the Space Shuttle program, NASA announced its intention to transfer space-worthy Orbiters to educational institutions or museums. As of now, the decision is to display **Atlantis** at the Kennedy Space Center, Florida, **Discovery** at the Udvar-Hazy Center of the Smithsonian Institution's National Air and Space Museum near Washington DC, **Endeavour** at the California Science Center in Los Angeles, and **Enterprise** (atmospheric test orbiter) at the Intrepid Sea-Air-Space Museum in New York City. NASA also made **Space Shuttle thermal protection system tiles** available to schools and universities. In addition, **flight and mid-deck training hardware** was destined for the National Air and Space Museum and the National Museum of the US Air Force. The **full fuselage mockup**, which includes the payload bay and aft section but no wings, was to go to the Museum of Flight in Seattle; **Mission Simulation and Training Facility's fixed simulator**, to the Adler Planetarium in Chicago; the **motion simulator**, to the Aerospace Engineering Department of the Texas A&M University; and other **simulators used in shuttle astronaut training**, to the Wings of Dreams Aviation Museum in Starke, Florida and the Virginia Air and Space Center. (via Wikipedia). Unfortunately, however, NASA's good intentions are currently embroiled in political and bureaucratic hurdles. But once it is cleared up, you may be able to see these glorious pieces of history up close.

West Bengal in the throes of Change

Prabir Ghose

All Bengalis who live away from Bengal and feel homesick at regular intervals must have known by now that West Bengal is going through a phase of *paribartan* – or change. Beginning with its name – henceforth West Bengal is *Paschim Banga*... Please note for reference.

It has finally come to pass – West Bengal is in the throes of change. Everyone is upbeat about how Kolkata would be transformed to London, how the River Ganga would resemble the Thames, how Darjeeling would offer competition to Switzerland. We are also expecting a film city to come up in Uttarpara on the banks of the Ganges – so that Bengali film folk need not go to other cities to process their films.

Then there was a really good idea worth emulating... listening to strains of *Rabindrasangeet* (Tagore songs) as one waited at the traffic crossings for the light to change from red to green. The system was introduced; however, some mischief mongers stole the USB drives from the music systems! Unless the attitude of the masses change, such innovations would, obviously, be meaningless.

Alongside these efforts to change the mindset of Bengalis is the removal of obnoxious hoardings from the roads – it would have been real good if one could have looked at the blue skies once in a while, instead of always living under the shadows of heroes who promote cold drinks or heroines who promote body lotions or deodorant sprays...

Renaming all landmarks after Tagore or Nazrul Islam might be laudable, but simultaneously there are many other areas that need to be improved. Actually, to think of it, landmarks should remain as the old more familiar names... moreover, the youth of today might find it hard to relate to complicated names – this is the age of SMS and abbreviations, the hi-bye, LOL, gr8 etc ...

However, while the number of *Sarbojanin Durga Puja*s (community-organized celebration worshipping the Goddess Durga) has gone up from 1200 in 2004 to nearly 2500 this year, Bengalis have lost out on those fast foods like *tele-bhaja* and *moghrai parantha*s... it is now the age of pizzas and momos. And – in the category of sweets one of the newest entrants is the *sandesh* meant for the diabetic, the sugar-free sweet. More *paribartan*...

One remembers the only ‘mall’ in the Kolkata of the 60s – it was the Kamalalaya Stores on Dharamtolla Street... in its premises one could spend the whole day looking at and purchasing items from clothes to bedrolls to toys; the establishment even had a cafeteria for refreshments... in those days there was no plastic money and it was a different style of life...

Old-timers like me feel helpless in the malls of today where buy-2-get-one-free is the mantra...

Village Vignettes

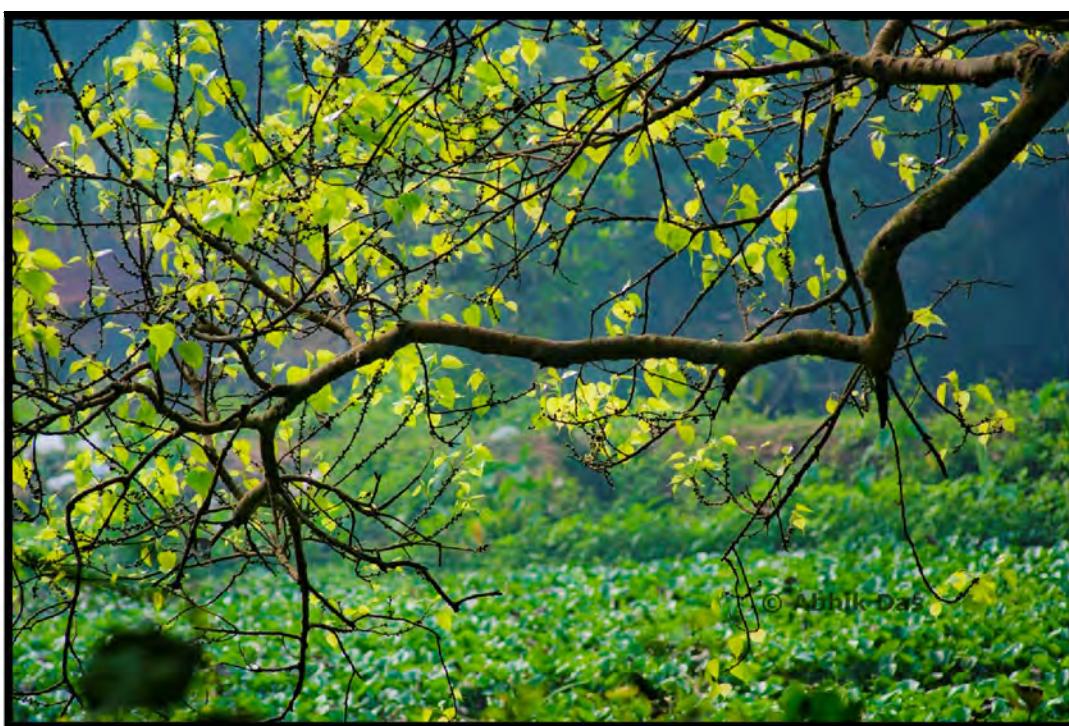
Abhik Das

Before Meeting



© Abhik Das

Branches



© Abhik Das

Flying*Sundown*

We



Honey Time





Mountain Vignettes

Abhruk Lahiri

Photos taken at Goecha La (elevation 4940 m), a high mountain pass in Sikkim, India, in the Himalaya range; this pass gives a view of the southeast face of Mt. Kanchenjunga.







©Abhiruk Lahiri



©Abhiruk Lahiri

Earth Vignettes

Chitralekha Sarkar

Flamingo



CHITRALEKHA SARKAR

Chilean Flamingoes at the Sea World, San Antonio, USA (April, 2011); about 31-57 inches tall, weighing 1.9-3 kg. Mainly found in tropical and subtropical areas, these are highly social and decorative birds.

Hoover Dam



CHITRALEKHA SARKAR

5 years (1931-35) to construct, the Hoover Dam stands at the border of Arizona and Nevada, on the Colorado river. It's an Arch Gravity type structure, 726.4 ft in height, built to prevent flooding.

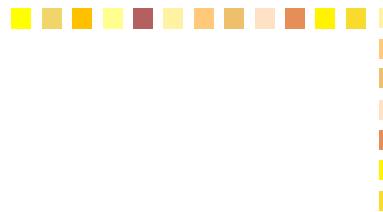
Cloud Layers

Sparingly populated, beautiful and peaceful, Mukteswar (June, 2011) sits atop a high ridge in a secluded corner of the Kumaon Mountains in Uttarakhand, India, situated at an altitude of 7,500 ft above sea level

Red Rock Canyon, Las Vegas, USA



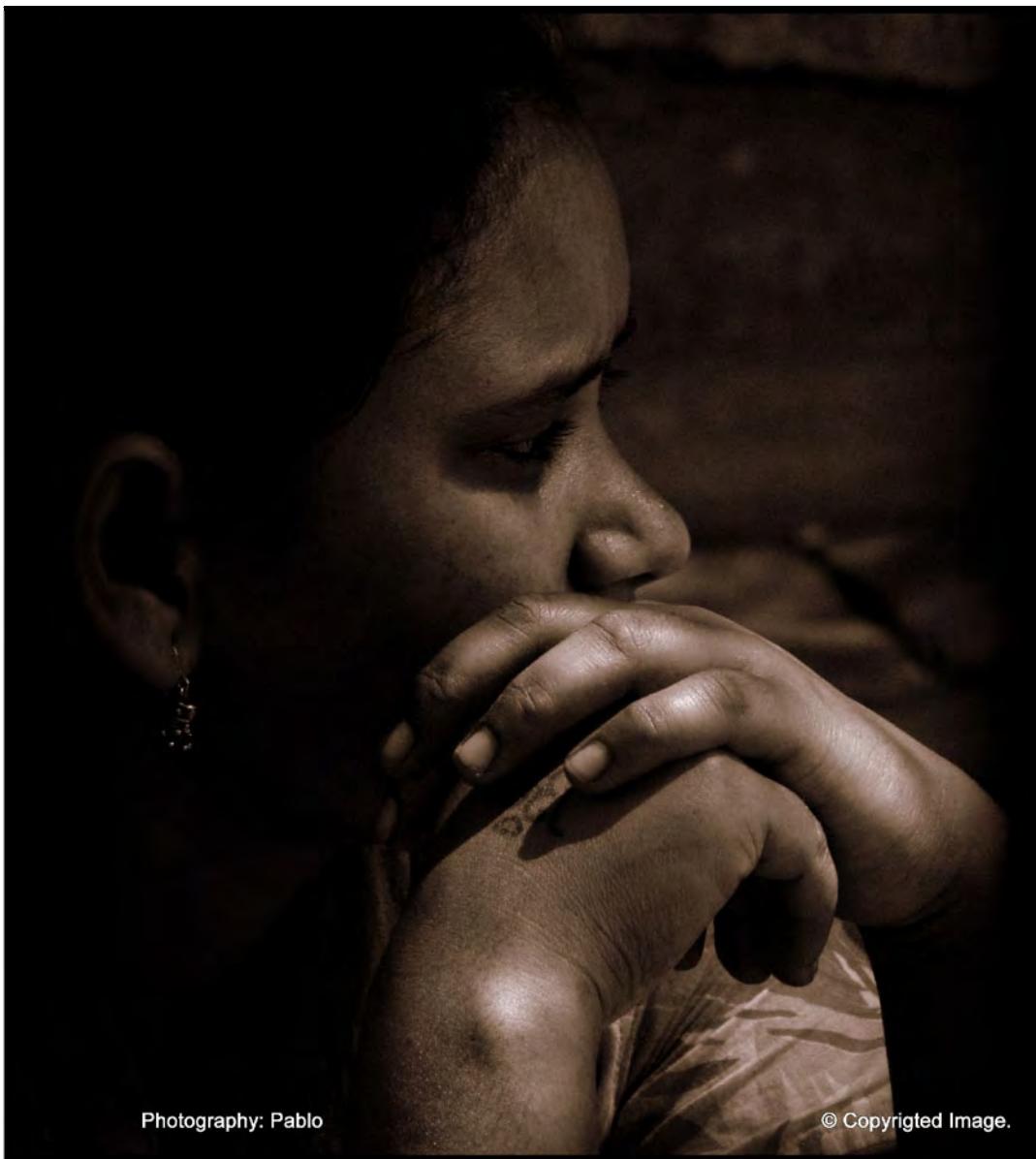
Red Rock has a complex geological history; it was located under a deep ocean basin during the Paleozoic Era 600 MYA. Over millions of years, it helped create the dramatic landscape characterizing the region – currently a hotspot for hiking, biking, rock scrambling and rock climbing



Human Vignettes

Pablo

বিষণ্ণতা – sadness



হতাশ্বা – Despair



Photography: Pablo

© Copyrighted Image.

প্রাতীক্ষা – Waiting



Photography: Pablo

© Copyrighted Image.



সিঁড়ির সংসার - Family on the Stairs



Random Vignettes

Parthasarathi Mitra

পঞ্জীসংকুল

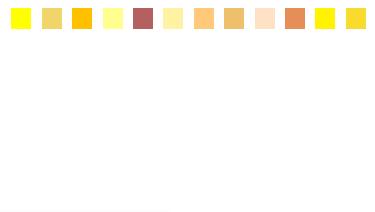


Lake behind Fee Avenue Library at Melbourne, Florida - March 2010

বালুকাঙ্গাপত্য



International Sand Festival at Radisson Resort, Cocoa Beach, Florida – April 2010



Seaside Vignettes

Pratap Sen Chowdhury

Pondicherry



©Pratap Sen Chowdhury

Puri



©Pratap Sen Chowdhury

Vital Vignettes

Sarbjaya Mukhopadhyay

আলো



© সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়

প্রাণ



© সর্বজয়া মুখোপাধ্যায়

Random Vignettes

Tirthankar Ghosh

White Ibis from Ranganathittu Bird Sanctuary, Karnataka, India



Situated on the banks of River Kaveri, the Ranganathittu Bird Sanctuary includes six islets as well. The isolated islets and the abundance of aquatic insects during the monsoon make this sanctuary a favorite abode for birds. A record number of 1,400 painted storks visited the area in 1999-2000. Local inhabitants like kingfishers and peacocks are also found in this avian bliss.

An evening at Phewa Lake, Pokhara, Nepal



Phewa Tal (Lake) is one of Nepal's most beautiful spots in Pokhara city, surrounded by a combination of monkey-filled forests and high white peaks. 1.5 km long, it's the second largest lake in Nepal. The reflections in the mirror-like water in the early mornings are something one must see at least once before one dies. Boats are available on hire to row oneself across the lake.

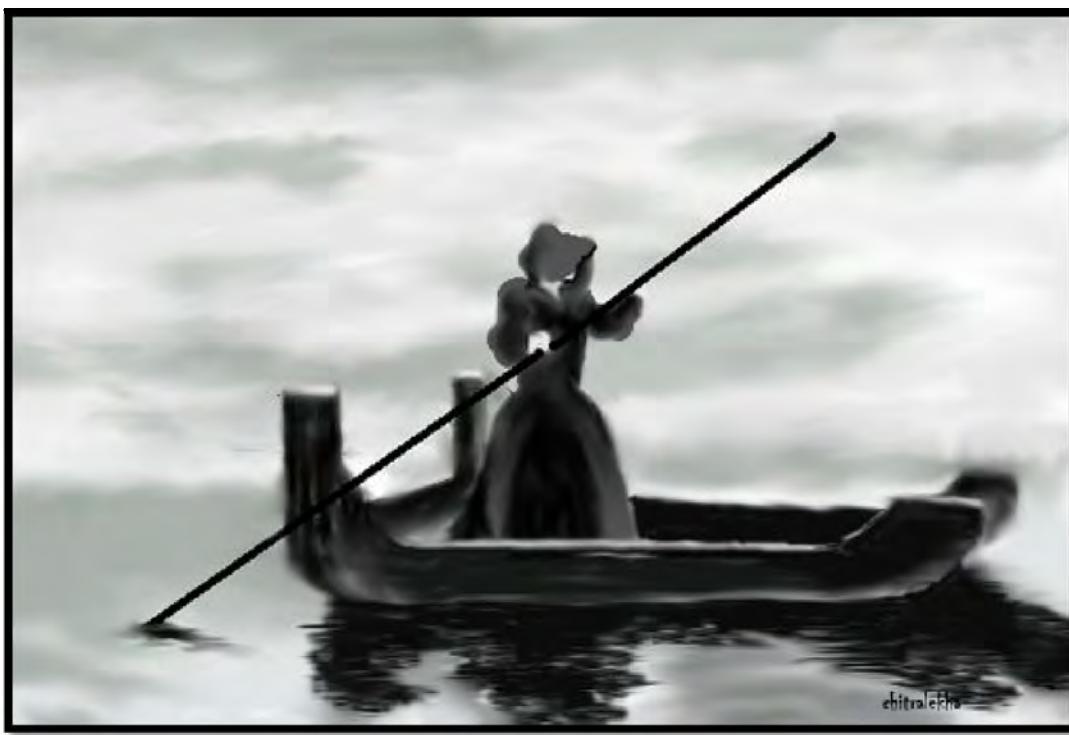
A single Crow on a boat at Phewa Lake, Pokhara, Nepal



Tirthankar Ghosh

Artwork

Chitralekha Sarkar

Moonlight*Boat*

Editors' note: talented Chitralekha deserves additional plaudits because both these samples of her artwork were created digitally, not in any advanced software with myriads of options, but in the good old Microsoft Paint – that too, simply using the mouse. Trust us when we say, it ain't easy.

নীড় কলরব

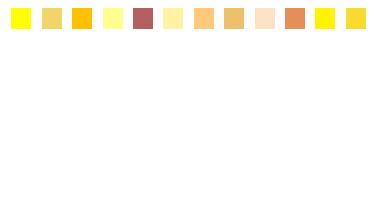
দেৰাৰ্ছনা ভট্টাচাৰ্য

চড়ই কৱেন কিচিৰ মিচিৰ
শালিক ছানা দিচ্ছে হানা
পায়ৱা হাঁকেন বকম্ বকম্
চালেৱ আগে ভাত ছড়ালে
ময়ূৰ পেখম রঙ বাহারি
আসছে বুঝি বৰ্ষা রাণী
ঘৰ নাই থাক পূৰ্ণ যে তার
কোকিল ডাকে নতুন সাজে
ৱোজেৱ ভোৱে বেহাগ সুৱে
লাল ঝুঁটি আৱ লম্বা ঠোঁটে
বাঁশিৰ মত লম্বা ঠোঁট
শ্বেত বসনে লাগছে ভাৱী
ছোঁ মাৰে যেই এক নজৱে
পড়ল যদি চিলেৱ নজৱ
কাক বলে তায় সবাই চেনে
আবৰ্জনা কুড়িয়ে ফেলে
কান ফাটানো কাঃ কাঃ স্বৱে
ৰাঙ্গুদাৱেৱ নাম পেয়েছে
মাছৱাঙ্গা তার নামটি খাসা
যেই না পাওয়া মাছেৱ দেখা
কপাত্ কৱে আস্ত সে মাছ
রাঙ্গিয়ে দেহ নানা রঙে
ঠকাস ঠকাস খুটুৱ খুটুৱ
আস্ত গাছে ফোকল কৱে
কাঠেৱ কাজে ব্যস্ত ভাৱী
ভাৱছ কে সে কাঠঠোকৱা
নাইবা হলো ইঁট সুৱকি
খড়কুটোতেই ব্যস্ত ভাৱী
শেখায়নি কেউ হাতটি ধৰে
তবুও খাসা বাঁধন ঠাসা
থপাস থপাস পুকুৱ জলে
জলেৱ পৱে স্থলেও চলে

ছোটো খুদেৱ বাড়।
চিলেকোঠাৰ ঘৰ।
ৱকম বোৰা তার।
মুখটি কৱেন ভার।
ৱাঞ্চিন জামা গায।
নাচ দেখাৰে তাই।
ছন্দ সুৱেৱ জোৱ।
বসন্তেৱ ঐ ভোৱ।
কঁকঁৱ কঁকঁৱ রাগ।
মোৱগ ভায়াৱ ডাক।
আৱ লম্বা দুটি পা।
বক-বকালিৱ ছা।
সকল মুন্দু পাত।
সবাই কুপোকাত।
ৱঙ্গটি বেজায় কালো।
কাজ পেয়েছে ভালো।
মনেৱ সুখে গায।
বেজায় খুশি তায।
জলেৱ ধাৱে ঘৰ।
অমনি চেপে ধৰ।
মুখেৱ মধ্যে ঠুসি।
মাছৱাঙ্গা তাই খুশি।
কাঠ কাটে দিন ভোৱ।
মস্ত ঠোঁটে জোৱ।
সময় নেইকো আৱ।
নামটি হলো তার।
নাইবা সিমেন্ট ঠাসা।
বুনতে নিজেৱ বাসা।
বলেনি কেউ কৱ।
বাৰুই পাখিৰ ঘৰ।
জলেৱ পোকা খায।
আঙুল জোড়া তাই।

ৱাজহংস নামটি যেন
সোনাৱ ডিমেৱ গল্প আছে
দিন ফুৱোলো আকাশ যে তাই
হৃতুম পেঁচায় বড় চেঁচায়
জেদ ধৰেছে ছোট ছেলে
ঘৰ ছেড়েছে তাই প্যাঁচানী
চোখ দুটোৱও জোৱ বেড়েছে
প্যাঁচার ঘৰে জমবে আসৱ
ব্যস্ত সবাই আপন কাজে
ৱাত ফুৱালেই কাটবে আঁধাৱ
চোখ ধাঁধাঁবে চুকবে যখন
সারবে আসৱ চট জলদি
যাক ফুৱালো কাব্য কথা
এদেৱ পাশে আমৱা যেন
সমাজ জুড়ে সকল পাশে
আমৱা আছি এদেৱ সাথে

ভেবোনা কম ভাই।
ভুলে গেছ তাই।
অন্ধকাৱে সাজে।
মন বসেছে কাজে।
খাবাৱ এখন চাই।
খাবাৱ কোথায় পাই।
যেই হয়েছে রাত।
পড়বে রকম পাত।
লাগিয়ে বুকেৱ জোৱ।
আসবে আবাৱ ভোৱ।
ভোৱেৱ আলো ঘৰে।
মধ্য রাতেৱ পৱে।
আসল কথা কই।
সকল ভাৱে রই।
দেখতে এদেৱ চাই।
এৱাও আছে তাই।



বিজয়া

সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর যাবে বিসর্জন

কিছুই যে আর ভাল্লাগেনা, সদাই খারাপ মন
ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সারাক্ষণ
সর্বক্ষণ চোখেতে জল, দেয়না কিছুই মুখে,
হ্যাঁরে খুকি, কি হয়েছে, কে বকেছে তোকে?
স্কুলের কোনো পরীক্ষাতে ফেল করেছিস – নাকি
দিদিমণি কান মলেছে – দিস বলে তুই ফাঁকি?
দুষ্টুমিতে প্রথম যে তুই – এই তো ছিল জানা
গোমড়া কেন মুখটারে তোর, কোথায় হাসিখানা?

আজ নবমী শেষ যে মাগো, কালকে ভাসান হবে
ঢাক-ঢোল সব চুপ করবে, আলোও নিভে যাবে,
আরও বারো মাসের পরে দুর্গাপুজো হবে
আবার একটা বছর গেলে পুজোর ছুটি হবে।
কেমন করে কাটাব এই একটা বছর মা!
কি যে করি কিছুই যে আর ভালো লাগছে না।
মন খারাপের বাজনা বুকে বাজছে সারাক্ষণ –
কেমন করে হাসি, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

মা তুই থাকবি কতক্ষণ

মা তুই থাকবি কতক্ষণ...
বোকা ঢাকি বাজায় ঢাকে –
ও তোরা শোন রে তোরা শোন।

মা কখনো যায় কি ছেড়ে –
মা যে সাথে সাথে ফেরে,
হৃদয় মাঝে জাগে মায়ের
মেহ সারাক্ষণ।

বৃথাই ঢাকি বাজায় মা তুই
থাকবি কতক্ষণ।

মা বুঝি ঐ খড়-মাটিতে
আটকা পড়ে থাকে
ভাসিয়ে দিয়ে জলে তোরা
ফেরাতে চাস মাকে।

মা যে ফেরে এই আঙ্গিনায়
ফুলের শোভা হয়ে।
বাতাস আনে মায়ের খবর
ফুলের সুবাস বয়ে।

মা আছে ঐ দূর গগনের
লক্ষ তারার চোখে,
মা চেয়ে রয় তোদের পানে
আঁধার রাতের বুকে।
জেগেও তোরা ঘুমাস তবু
চিনলি না কেউ মাকে।

নদীর জলে ভাসিয়ে এসে
জ্বাললি না দীপ ঘরে,
বাহির থেকে বিদায় নিয়ে
আসবে মা অন্তরে।

ছড়া

সুদীপ্তি বিশ্বাস

মেঘের মেয়ে

সেদিন যখন বিকেল বেলা

ফিরছি আমি বাড়ি

মেঘের মেয়ের সঙ্গে আমার

ভাব জমল ভারি।

লুকোচুরির কায়দা কানুন

সবই দিল বলে

আসবে আবার, কথা দিয়েই

হঠাতে গেল চলে।

সেই থেকে সেই মেঘের মেয়ে

বেড়াই আমি খুঁজে

তাকেই খুঁজি দিনের আলোয়,

রাত্তিরে চোখ বুজে।

নদীর কছে যেতেই নদী

বলল আমায় ডেকে,

‘মেঘের মেয়ে দেখতে কেমন,

দেখাও ছবি এঁকে’।

ঝর্ণা বলে, ‘আমি তো জানি

কিন্তু ব্যস্ত আজ

যেতে হবে অনেক দূরে

আমার নানান কাজ’।

ইশারাতে পাহাড় বলে

তার সবই জানা

কিন্তু কিছু করার তো নেই

কথা বলতে মানা।

চাঁদের কাছে যেতেই চাঁদের

হাজার অজুহাত

দিনের বেলা ঘুমান বাবু,

ব্যস্ত সারা রাত।

কি যে করি কোথায় যে যাই
কোথায় গেলে মেঘ মেয়ে পাই

একা একাই থাকি বসে
মুখটি করে চুন
আমার এত দুঃখ দেখে
বাতাস হেসেই খুন।

বাতাস বলে, মেঘের মেয়ের
পায়ের তলায় সর্বে
এই খেয়ালে একটু থামে
আবার চলে জোরসে।

যখন তখন ইচ্ছে মতন
বদলে ফেলে রূপ
ইচ্ছে হলেই বৃষ্টি হয়ে
ঝরে টাপুর-টুপ।

ইচ্ছে হলেই বাঞ্চ হয়ে
আমার ডানায় ভাসে
চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
ইচ্ছে মতন হাসে।

মেঘের মেয়ে রাগলে পরে
তৈরি হয় ছায়া
মেঘ মেয়ের সব কিছু তাই
মিথ্যে এবং মায়া।

মেঘ মেয়ের কথা ভুলে
ফেটাও মুখে হাসি
নতুন নতুন মজার দেশে
চলো বেড়িয়ে আসি।

লোকাল ট্রেন

আমি রোজ সকাল সকাল
ধরি রানাঘাটের লোকাল
সাতটা তিরিশ তখন বাজে ঠিক।
বিকবিকিয়ে ট্রেনটা চলে
কেউ চুপ কেউ বকেই চলে
কেউ বা ছোটে ভুলেই দিগবিদিক।
কারো মাথায় বিশাল ঝুড়ি
কারো বা ব্যাগ গেছে চুরি
চিংকারেতে কানটা পাতাও দায়।
পড়েছি যেন ইঁদুর কলে
এমন সময় কে যে বলে
‘একটু দেখি, একটু চাপুন ভাই’।
‘চাপব কোথায়?’ বলি আমি
দর দর দর করে ঘামি
কখন যে ছাই আসবে দমদম –
মাছের মত খাচ্ছি খাবি
হকার ভাই করছে দাবি
ওজনে তার একটুও নেই কম।
চাই বাদাম, চাই মলম
দশ টাকায় সাতটা কলম
অফিস বাবু জমিয়ে খেলেন তাস
বিকবিকিয়ে ট্রেনটা চলে
ছারপোকারা হঠাতে বলে
লোকাল ট্রেনে তাদেরও বসবাস।
‘আমলকির হাজার গুণ’,
‘হাই প্রেশারে কমান নুন’
জ্বানের কথা শুনেই বেশি ঘামি।
হজম করে হাজার গুঁতো
ছিঁড়ল জামা ছিঁড়ল জুতো
অবশ্যে সেই দমদমে নামি।

পরীর দেশে

সেদিন যখন ঘুম ভাঙল
তখন অনেক রাত
বাবা তখন ঘুমে কাতর
মাও ঘুমে কাত।
চোখ মেলে চেয়ে দেখি
জানলা দিয়ে চাঁদ
আকাশপটে পেতেছে এক
রহস্যময় ফাঁদ।
সেই লোভতে চুপি চুপি
খাটের থেকে নামি
আলতো করে দরজা খুলে
ছাদে এলাম আমি।
উপরদিকে চেয়ে দেখি
আকাশ জুড়ে মেলা
মেঘের সাথে চাঁদ তারাতে
বেশ জমেছে খেলা।
তারা বলে আমায় দে হস
মেঘ বলছে টুকি
খিলখিলিয়ে উঠছে হেসে
পরীর মেয়ে খুকি।
রাজপুত্রুর নীলপরী আর
পক্ষীরাজ ঘোড়া
নাম না জানা নতুন গ্রহে
বেড়াতে গেল ওরা।
লাল তারাতে নীল তারাতে
দারুণ মনের মিল
চাঁদের আলোয় যাচ্ছে ভেসে
পুরু-বাড়ি-বিল।
হাজার হাজার তারার দেশে
মন চলেছে ভেসে
হঠাত শুনি মায়ের গলা
মা ডাকছেন এসে।
মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙতেই
চোখটি মেলে দেখি
পরীর দেশে নেই তো আমি
বিছানাতেই একি!



শেষের সেই ডাক

অনুবাদঃ শুক্রি দত্ত

রূমানিয়ার উপকথা থেকে গৃহীত [Fairy Tales and Legends of the World, by Mae Broadley]

আজ যে লোকটার গল্প তোমাদের বলব, সে থাকত রূমানিয়া বলে এক দেশে। সে এতো ধনী ছিল যে সে যদি একটা পুরো সপ্তাহ ধরে তার সমস্ত টাকা পয়সা দিনরাত গুনতে থাকত তবুও সে সব কিছু গুনে শেষ করতে পারত না। তোমরা ভাবছ, যে এতো অর্থ যার, সে নিচ্যই খু—ব সুখী। কিন্তু না, সে খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাত। ভাগ্যদেবী তাকে এতো আশীর্বাদ দেলে দিয়েছেন, রাশি রাশি ধন দিয়ে সে তো জীবনের কতো আনন্দ উপভোগ করতে পারতো; কিন্তু তার বদলে সে সর্বদাই মৃত্যুচিন্তায় কাতর থাকতো। সমস্ত ধন-সম্পত্তি পেছনে ফেলে মরে যাওয়াটা তার কাছে ভয়াবহ মনে হত।

শেষ পর্যন্ত সে আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারল না। সে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এমন একটি দেশের সন্ধানে বের হল যে দেশে কেউ কখনো মরেনি। বহু বছর ধরে সে ঘুরে বেড়ালো; অনেক বিচ্ছিন্ন দেশে সে গেলো। কত লোকে তাকে হেনস্থা করল; যারাই তার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য শুনল, তারাই তাকে নানা ভাবে ঠাট্টা করতে লাগল। কিন্তু সে দমল না। অবশ্যে সে এমন এক দেশে আসলো যেখানে মৃত্যু শব্দের অর্থটাই অজানা ছিল। সে তো তার ভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। এরকম একটা দেশের অস্তিত্ব যে থাকতে পারে — সেই আশাটাই তো সে হারিয়ে ফেলছিল। সে লোকজনদের জিজ্ঞাসা করল,

“কিন্তু এখানে যদি কেউ না মরে, তবে তো তোমাদের দেশে সবসময়ই আরো, আরো লোকের ভীড় বাড়ছে।”

“একদমই নয়,” তারা উত্তর দিল, “কোন একটা সময় আমাদের প্রত্যেকেই শোনে একটা স্বর তাকে ডাকছে। যখন কেউ সেই স্বরকে অনুসরণ করে, সে আর ফিরে আসে না।”

“তাই নাকি!” ধনী লোকটা ভাবল, “আরে, আমি ওদের মত এতো বোকা কখনও হবনা। আমি একটা সাধারণ স্বরকে কখনই অনুসরণ করবো না।”

এই দেশটাকে পেয়ে সে এতো খুশী হল যে সেই দেশে সে পরিবার নিয়ে থাকতে শুরু করল। এতদিনে সে মৃত্যুকে ফাঁকি দেবার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে তার একটু অস্বস্তি রয়েই গেল; তার মত বুদ্ধি যদি ওদের থাকত! তাই সে তাদের বারবার সাবধান করে হ্রকুম করল, যদি তারা শোনে কোনো স্বর তাদের ডাকছে, তারা যেন কোনোমতেই সেই স্বরকে অনুসরণ না করে।

বছর গড়ায় আর লোকটা ধীরে ধীরে ভাবতে শুরু করে যে সে মৃত্যু থেকে নিরাপদ। তারপর একদিন রাত্রে তারা সবাই যখন আগনের পাশে গোল হয়ে বসেছিল, হঠাৎ তার স্ত্রী নিজের চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; তার কোল থেকে হাতের সেলাই মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠে সে বলল, ‘ঠিক আছে, আমি আসছি, আমি আসছি!’ আর দেয়ালের আংটা থেকে নিজের ফার-কোট্টা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে তখন বরফ-ঝারা দারুণ শীতের রাত্রি।

লোকটা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “একী, তোমার মনে নেই তোমায় আমি কী বলেছিলাম?” ভয়ে তার গলাটা কাঁপছিল। “যদি মরতে না চাও, তবে যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়াও।”

মহিলাটি বলল, “তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না একটা স্বর আমাকে ডাকছে? এক মিনিটের জন্য বাইরে গিয়ে যদি দেখতে পেতাম কে আমাকে এত ব্যাকুলভাবে ডাকছে।” স্বামীটি অনেক যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে এটা হল মৃত্যুর নতুন করে আরেকটা শিকার জোগাড় করার ফন্দী। কিন্তু স্ত্রী মানল

না। সে দেখল স্বামীর সঙ্গে এতো তর্ক করে লাভ নেই; সে বলল, “আমি তোমার কথাই মানলাম। আমাকে আমার ফারকোট্টা পড়তে দাও, কারণ হঠাতে আমার হাড় পর্যন্ত হিম করে শীত করছে।”

যাক, শেষ পর্যন্ত সে বৌ-এর হঁশ ফেরাতে পেরেছে, এই ভেবে লোকটি স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলে কোট্টা তার হাতে দিল। কিন্তু কোট্টা পড়েই বৌটা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তার স্বামী সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে দৌড়ে গিয়ে তার কোট্টা ধরে ফেলল, কিন্তু কোট্টা রয়ে গেল স্বামীর হাতে আর বৌটি মিশে গেল অন্ধকারে। লোকটি শুধু তার চিংকার শুনতে পেল, “আমি আসছি, আমি আসছি।” শীতাই মহিলাটির গলা নৈঃশব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল আর কেউই তাকে কোনোদিনই দেখতে বা তার গলা শুনতে পায়নি।

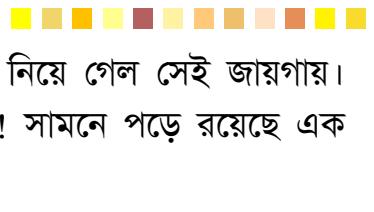
ধনী লোকটি তার বৌকে খুবই ভালোবাসত। তাই সে কিছুদিন বেশ বিষণ্ণ হয়ে রইল। একা হলেই সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতো, “এতোবার করে সাবধান করলাম, এতো অনুনয় করলাম, তবু বৌটা আমার কথা কিছুতেই শুনল না! বোকা মেয়েটা নিজের দোষেই বেঘোরে প্রাণটা হারাল। কিন্তু মৃত্যু আমায় এতো বোকা বানাতে পারবে না।”

দিনতো কারো জন্য বসে থাকে না। ধনী মানুষটিরও দিন ভালোভাবেই গড়িয়ে যেতে লাগল। ছেলেমেয়েরা মনের মত করে বড় হয়েছে, লেখাপড়া করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে ধন সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তা বল্গনে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ত্রী-বিয়োগের কষ্ট বাদ দিলে এখন সে একজন সফল তৃপ্ত মানুষ। প্রতি সকালে সে প্রাতরাশ শেষে নাপিতের জন্য অপেক্ষা করে। নাপিত এসে তার চুল-দাঢ়ি কেটে পরিষ্কার করে দিলে সে স্নান করে কাজে বেড়িয়ে পড়ে।

সেদিনও সে তার চেয়ারে বসেছিল আর নাপিতও তৈরী হচ্ছিল; হঠাতে দেখা গেল ধনী লোকটির মুখ রাগে আর ভয়ে লাল হয়ে উঠছে। সে লাফ দিয়ে উঠে চিংকার করে বলতে লাগল, “আমি আসব না, কখনই আসব না!” নাপিতটি অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল, একি, ঘরে তো কেউ কোথাও নেই! লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, “আমি তোমায় শেষবারের মত বলছি আমি যাব না। তাই বেরোও এখান থেকে।” হঠাতে সে নাপিতের হাত থেকে খোলা ক্ষুরটা ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। সকলে শুনল সে দৌড়াতে দৌড়াতে চিংকার করছে, “যতই তুমি ডাকো না কেন, আমি আসব না। কিন্তু দাঁড়াও, আমি তোমায় ধরবই। আর এমন শিক্ষা দেব যে বাকি জীবনের জন্য তুমি আমার কাছে আর আসবার সাহসই পাবে না।”

খোলা ক্ষুর হাতে পাগলের মত চিংকার করতে করতে লোকটা দৌড়ে পার হয়ে যেতে লাগল শহরের রাস্তা-ঘাট এবং তারপর বরফ বিছানো পাহাড়গুলি। আর তার পিছনে দৌড়াতে লাগল সেই নাপিতটা কারণ ক্ষুরটা যে তারই। দুজনের মধ্যে ব্যবধান যখন বেশ কমে এসেছে হঠাতে ধনী লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। নাপিতটি কোনোরকমে নিজেকে সামলে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে উঁচু পাহাড়চূড়া থেকে লোকটা পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, আরেকটু হলে তারও ওই একই দশা হত। সে অবশ্য গুঁড়ি মেরে উঁকি দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লোকটা একেবারে অদৃশ্য। কোথাও তার এতেটুকু চিহ্নমাত্রও নেই।

স্থ পায়ে নাপিত ফিরে এল শহরে তার দোকানে। শহরের লোককে সে সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে লাগল। সকলেই ঘাড় নাড়ল, কারণ এটা তো জানা কথাই যে সেই রহস্যময় স্বরকে যে-ই অনুসরণ করেছে, সে-ই মাটির এক অতলস্পর্শী খাদে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু, কৌতুহল বড় বিষম ব্যাপার। এটা মোটামুটি সকলের মধ্যেই থাকে, কিন্তু কারো কারো কৌতুহল আবার অন্যদের থেকে কিঞ্চিৎ বেশী। তাদের খালি মনে হতে লাগল, যে জায়গাটা তাদের শক্র-মিত্র এতো বিপুল পরিমাণ লোককে গিলে ফেলেছে, না জানি সে জায়গাটা কেমন! তারা নাপিতকে ধরে পড়ল সেই জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য।



নাপিত তো সেই জায়গাটা চেনে। তাই সে খুব প্রত্যয়ের সঙ্গেই তাদেরকে নিয়ে গেল সেই জায়গায়।
কিন্তু ও হরি! একদল মানুষ পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখল কোথায় গহুর, কোথায় কি! সামনে পড়ে রয়েছে এক
দিগন্তবিস্তৃত সমতলভূমি।

সেইদিন থেকে রূমানিয়ার মানুষজন, ঠিক যেভাবে অন্য সব জায়গায় লোকেরা সাধারণতাবে মরে,
সেভাবেই মৃত্যুবরণ করতে লাগল।

আব্রতি

সৌরজিৎ মিত্র মুস্তফী

মুস্বাই-এর টাটা ইন্সটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ থেকে পদাৰ্থবিদ্যায় ডক্টোৱেট ডিগ্রীপ্ৰাপ্ত সৌরজিৎ পেশাগতভাৱে একজন উদীয়মান বিজ্ঞান-গবেষক, কাজ কৰেন জৈবপদাৰ্থবিদ্যা বিষয়ে, নিউ ইয়ার্ক রাজ্যের উত্তৱভাগে অলবানী-শহৱৰ্ষিত নিউ ইয়ার্ক রাজ্যের স্বাস্থ্য দণ্ডৰে। কিন্তু গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে সৌরজিতেৰ নেশা হল নাট্যাভিনয় এবং আব্রতি। পালকিৰ জন্য তিনি উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৱেৱেৰ ‘শেষেৱ কবিতা’, এবং সেচি উৎসর্গ কৰেছেন তাঁৰ শৈশবেৱ বিদ্যালয়-শিক্ষিকা ‘উমা মিস’কে।

সৌরজিতেৰ পৱিবেশনায় সহযোগ দিয়েছেনঃ

শব্দগ্রহণে, টালীগঞ্জ ফিল্ম পৱিষ্ঠেৰাৰ শ্ৰী রাজীব মুখাজ্জী

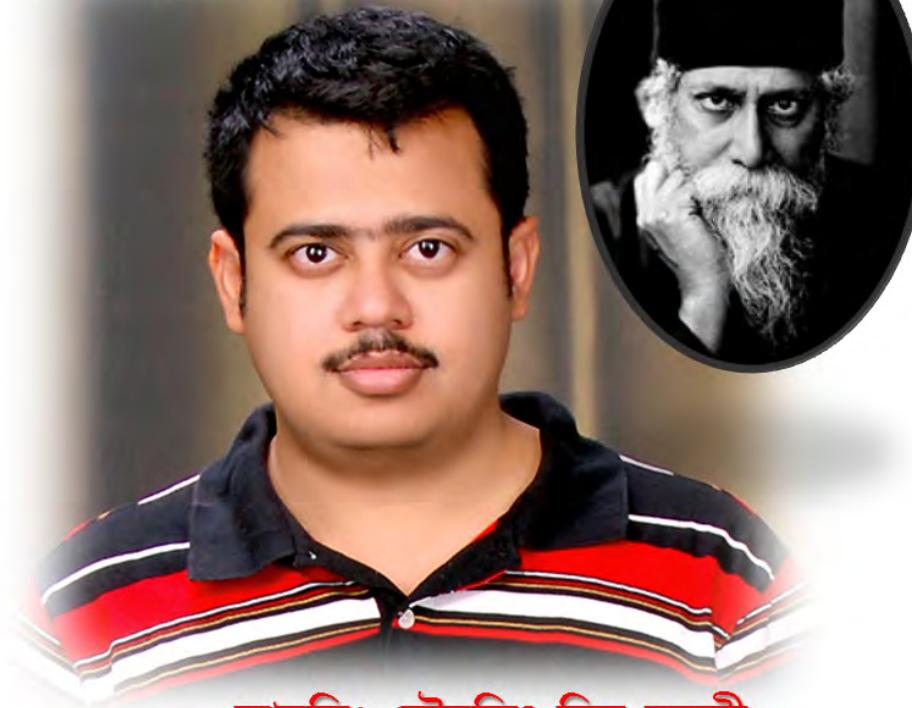
শ্ৰী গৌতম বোস (পিন্টুদা)

শ্ৰীমতি পিয়ালী ভট্টাচার্য

সৌরজিতেৰ আব্রতি শ্ৰতিগোচৰ হবে পালকিৰ ওয়েবসাইট-এ আব্রতিৰ পাতায়।

<http://calcuttans.com/palki>

শেষেৱ কবিতা



আব্রতি: সৌরজিৎ মিত্র মুস্তফী



লেখক পরিচিতি

Contributors to Palki 12



স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রাক্তন ছাত্র ও পেশাগতভাবে অ্যানালিটিক্সের নির্মম জগতে কর্মরত অভিষেক মুখোপাধ্যায় এক সাংবাদিক ঘরকুনো আর কলকাতাতেই আবদ্ধ আদ্যোপান্ত নিরীহ খাদ্যরসিক। বই পড়া আর সিনেমা দেখার পাশাপাশি নতুন নেশা বলতে নেহাঁই অপেশাদার লেখালেখি, যদিও তার ব্লগের খ্যাতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে বললে বিশেষ ভুল হবে না।



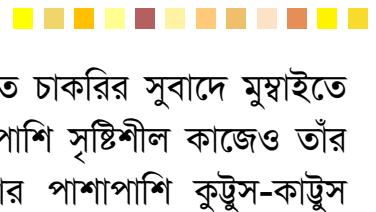
অমিত কুমার মাঝি একজন পদার্থবিদ। তিনি বেঙ্গালুরুর আই.আই.এস.সি.তে গবেষণারত। আর গবেষণার কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি একটু লেখালিখি করতে পছন্দ করেন – কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প বা উপন্যাস।



অনিবার্য সেন বর্তমানে মুম্বই-এর প্রথ্যাত টাটা ইন্সটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এ সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার। শব্দবিজ্ঞানের ওপর তাঁর গবেষণাকর্ম আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত; মুম্বই-এর অনেক বঙ্গীয় সংস্থা ও পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, এবং বাংলা ও ইংরেজী, দুই ভাষাতেই সাহিত্যরচনায় তাঁর গভীর ঝোঁক। তাঁর গল্প, ‘এ উইন-উইন গেম’, ২০০৭-এর কমনওয়েলথ অডকাস্টিং এসোসিয়েশন আয়োজিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে। সম্প্রতি ‘আশানদী’ নামে একটি বাংলা ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশ করেছেন।



হগলী নিবাসী বিনোদ ঘোষাল চাকরির পাশাপাশি নিয়মিত নানা পত্রপত্রিকায় গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধ লেখা চালিয়ে যান। তাঁর প্রথম ছোটগল্প ২০০৩ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর সম্প্রতি ‘ডানাওয়ালা মানুষ’ নামে তাঁর একটি ছোটগল্প সংকলন মুদ্রিত করেছেন। এর সাথেই তাঁর শখ ছবি আঁকা বা বেড়ানো।



দেবাশিস ভট্টাচার্য বর্তমানে যশরাজ ফিল্ম স্টুডিওতে চাকরির সুবাদে মুস্থিতে অবস্থিত। কিন্তু টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপারের পাশাপাশি সৃষ্টিশীল কাজেও তাঁর ভারি উৎসাহ। চরৈবতি বলে একটি ব্লগ চালানোর পাশাপাশি কুটুস-কাটুস বলে বিশেষভাবে শিশুদের জন্যই বানিয়েছেন আরেকটি ব্লগ।



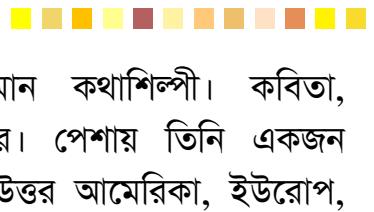
প্রায় ষাট বছরে পৌঁছে যাওয়া হিমান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রাক্তন ইংরাজি শিক্ষক। তিনি ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলা নাট্য-আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সংশ্লিষ্টক দলের মাধ্যমে। নাটক রচনা, অভিনয় আর নির্দেশনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু রাজনেতিক কারণে থিয়েটার ছেড়ে গ্রাম বাংলায় শ্রতিনাটকের মাধ্যমে নাট্যরস প্রচার করা করেন। ‘বৃহস্পতি’ নামের সেই দলের চারটি ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর গত ২০০৯ সাল থেকে বাংলা গল্প আর উপন্যাস রচনা শুরু করেন। একাধিক ই-ম্যাগাজিনে তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়।



শিলিঙ্গড়িতে জন্ম এবং কলকাতায় বেড়ে ওঠা হিমান্তি শেখর দত্ত এখন সপরিবারে বাস করেন আমেদাবাদে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ভূ-তত্ত্ববিদ্যায় শিক্ষা নিয়ে তিনি ও.এন.জি.সি.তে যোগদান করেন। চাকরির কারণে বহু স্থান ঘুরেছেন, শিখেছেন অসমীয়া ও গুজরাটি ভাষা। ক্ষুলজীবন থেকেই লেখালিখি করে আসছেন; অন্তত তাঁর লিখিত প্রেমপত্রগুলি যে উচ্চমানের হয় সে বিষয়ে সাক্ষী তাঁর স্ত্রী। সম্পত্তি জোরকদমে লিখতে শুরু করেছেন ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানাকিছুই। আত্মজীবনী লেখার কাজেও হাত দিয়েছেন। অবসরগ্রহণের পর এসবেই পুরোদমে নেমে পড়তে চান।



কলকাতার বাঙালসন্তান কৌন্তভকে কয়েক বছর হল তুষারাকীর্ণ বস্টনে ডেরা ফেলতে হয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব-রাশিবিজ্ঞানে গবেষণার দায়ে। পালকির সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলে পালকির জন্য এটা-সেটা লেখা, সাক্ষাৎকার নেওয়া, প্রচন্দচিত্রণ, সম্পাদনা বা ই-প্রকাশনা অনেক কিছুরই দায়ভার তার উপর চাপানো হয়ে থাকে। এতসবের ফাঁকে খানিক সময় পেলে একটু এটা-ওটা লেখার অপচেষ্টা বা ছবি তোলার শখ জাগে। বান্ধবীর মন জোগানোর পেছনে ছুটবার দায় নেই বলেই হয়ত সেই সময়টুকু মেলে।



মেশাররফ খান বাংলাদেশের জনপ্রিয় উদীয়মান কথাশিল্পী। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস তাঁর লেখালেখির প্রিয় চতুর। পেশায় তিনি একজন কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ। শিক্ষা ও কর্ম উপলক্ষে উভয় আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক বিচরণ করেছেন। বর্তমানে পাকিস্তান টেলিকম্যুনিকেশন কর্পোরেশনে ক্রয় ও লজিস্টিক্স বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন।



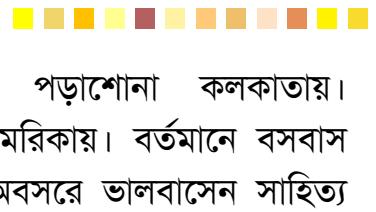
প্রতাপ সেন চৌধুরী অল্প কিছুদিন আগে দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের তড়িৎ-প্রকৌশলীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। কলেজ-জীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার অভ্যাস ছিল, অবসরের পর তাতে মন দেবার বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন। এর সঙ্গে শখ রয়েছে ফোটোগ্রাফি। আর পছন্দ করেন একটু ইন্টারনেটে সময় কাটাতে।



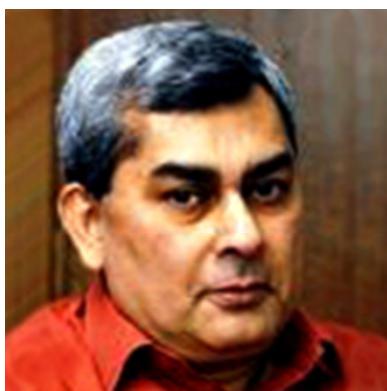
রবীন্দ্রনাথের ভাতুসুত্রী প্রথ্যাত চিত্রকর সুনয়নী দেবীর কনিষ্ঠতমা পৌত্রী শ্রীমতি সাত্তনা চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই লেখেন নিয়মিত। শিশুপাঠ্য কবিতার বই ভাবনা তাঁর সাম্প্রতিক বই। প্রায় তিনি দশক ধরে ভারতের ইনসিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস্-এ কাজ করার সুবাদে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ম্যাডহাউস নামে একটি ছোটগল্পের সংগ্রহ প্রকাশ করেন, যার অনেকগুলিই ফেমিনা, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দা টেলিগ্রাফ ও স্টেটসম্যানে আত্মপ্রকাশ করেছে।



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈবরসায়নে শিক্ষা নিয়ে ক্যাম্পারের উপর গবেষণা করতে শাশ্বতী ভট্টাচার্য এখন মার্কিনদেশে প্রবাসী। যদিও, তিনি মনে করেন, নতুন করে শুরু করতে পারলে তিনি বাংলা সাহিত্যেরই ছাত্রী হতে চাইতেন।



সুব্রত মজুমদারের জন্ম, বড় হওয়া এবং পড়াশোনা কলকাতায়। ইঞ্জিনিয়ারিং'রে ডিগ্রি নিয়ে পাঠি দেন উত্তর আমেরিকায়। বর্তমানে বসবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলিনায়। কাজের অবসরে ভালবাসেন সাহিত্য চর্চা করতে, এবং দীর্ঘসময় প্রবাসে কেটে যাবার পরও জীবনে বাংলা ভাষার প্রতি গভীর টান অনুভব করেন।



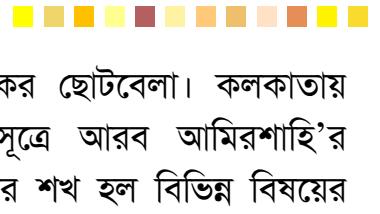
মুহাইয়ের টাটা ইনসিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের প্রফেসর সুগত সান্যাল কম্পিউটার সাইন্সের উপর গবেষণা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.আই.টি. খড়গপুর থেকে পাশ করে তিনি ১৯৭৩ সালে সেখানে যোগ দেন। আই.টি. বিশেষজ্ঞ ড: সান্যাল নতুন নতুন সৃষ্টিতে মেতে থাকতে ভালবাসেন।



প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত পঞ্চাশোর্ধ এই লেখিকার নিবাস দক্ষিণ কলকাতায়; একসময়ের আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠানে নিয়মিত বঙ্গ শ্রীমতি দত্ত বর্তমানে বহুপ্রকার সৃষ্টিধর্মী ও সমাজচেতনা-মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, এবং প্রাণের সাড়া পান রবীন্দ্রসঙ্গীতে।



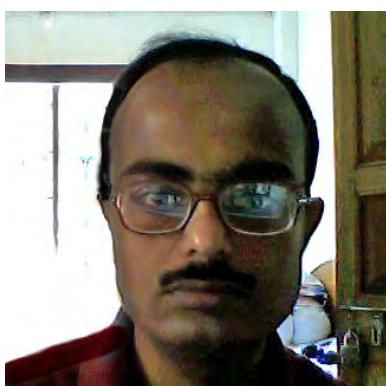
আয়কর-বিভাগের চাকরিজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর, দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাদে, তাপসকিরণ রায় আবার লেখালিখি শুরু করেছেন। পনের বছর বয়স থেকে পত্রিকায় লেখা দিয়ে শুরু; একসময় কালি ও কলম, আসর, যুগান্তর ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। প্রথমে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টে শিক্ষকতা করতেন, প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যাবার পর আয়কর-বিভাগের পদে চলে যান। কর্মসূত্রে মধ্যপ্রদেশের জৰুলপুরে নিবাস। তাই বেশ কিছু হিন্দী পত্রপত্রিকাতেও কবিতা লেখেন, বেতারেও অনুষ্ঠান করেছেন।



হুগলী জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে কেটেছে অভীকের ছোটবেলা। কলকাতায় উচ্চশিক্ষা ও চাকরির পর বর্তমানে তিনি কর্মসূত্রে আরব আমিরশাহি'র দুবাইতে বাস করেন। তাঁর নেশা হল সাহিত্য, আর শখ হল বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া, গল্প লেখা, ছবি আঁকা, ছবি তোলা ইত্যাদি।



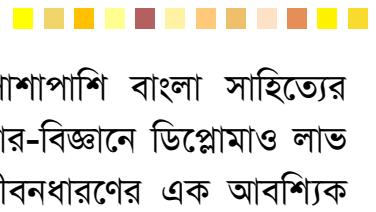
কলকাতার আকাশলীনা শিক্ষাবিদ্যায় স্নাতক। কবিতা লেখা তাঁর প্রধান; তিনি সময়বিশেষে বাংলা নাটক ও ছোট পর্দায় অভিনয়ও করে থাকেন।



জলপাইগুড়ি জেলার বীরপাড়ায় অর্ণব চক্রবর্তীর নিবাস। তিনি সেখানের কলেজে বাংলার শিক্ষক। লেখকের বদলে তিনি নিজেকে পাঠক বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। এবার তিনি প্রথম পালকির সওয়ারি হলেন।



ধাতুবিদ্যায় প্রকৌশলী শ্রীমতী বন্দনা মিত্র ইস্পাতের জগতের বাইরেও সমানভাবে দক্ষ – ধাতুর পাশাপাশি মানবমনের গভীরের খবরও তাঁকে রাখতে হয়, নানা আন্তর্জাল পত্রপত্রিকায় লেখালিখি করার জন্য। তিনি বর্তমানে পাটনায় স্বামী-কন্যাসহ বাস করেন।



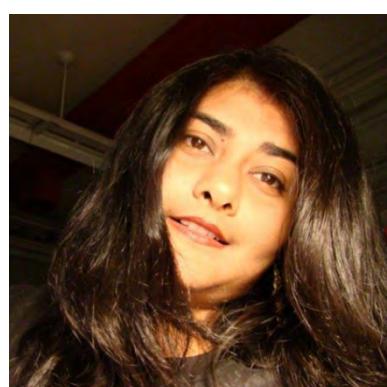
হৃগলি জেলার বাসিন্দা দীপা পান শিক্ষকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের উপর স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ্যরতা। ইতিপূর্বে কম্পিউটার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাও লাভ করেছেন। তাঁর মতে, কবিতার চর্চা তাঁর কাছে জীবনধারণের এক আবশ্যিক অঙ্গ। প্রথম প্রকাশ স্কুল ম্যাগাজিনে, সেই থেকে এখনও বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন, ই-ম্যাগাজিন, এবং দেশ পত্রিকায় তাঁর লেখা স্থান করে নিয়েছে।



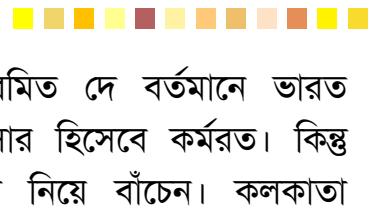
জ্যোতিক্ষ'র ছেলেবেলায় শখ ছিল শাহুরখ খান অথবা উড়োজাহাজের পাইলট হবেন, বলাই বাহুল্য কোনোটাই হন নি; পর্দার সামনে থেকে পিছনেই তাই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, নাটক কবিতা এবং গল্প লেখেন এবং লোককে ধরে ধরে দেখতে বা পড়তে বাধ্য করেন; শখ পুরোনো চিঠি পড়া আর অজানা জায়গায় হারিয়ে যাওয়া, অবসর সময়ে গবেষণা করেন পারদু ইউনিভার্সিটিতে, বিষয় রাশিবিজ্ঞান; স্পু একদিন সব ছেড়েছুড়ে জটাজুটধারী সন্ধ্যাসী হওয়া....



করতোয়া নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন বাংলার রাজধানী পুন্ড্রনগরের ঐতিহ্যবাহী শহর বগুড়ায় কৃষ্ণ কুমার গুপ্তের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে বিএসসি করেছেন। বর্তমানে ঐ একই বিষয়ে এমএসসি করছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাই তাঁকে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থাকার অপার সন্তাননা তৈরী করে দিয়েছে। পত্রিকা এবং বিভিন্ন ম্যাগাজিনে টুকটাক লেখালেখি করেন। ব্লগিং তাঁর একটা নেশা। আরো ভাল লাগে গান শুনতে, ছবি আঁকতে আর মাঝেমাঝে গিটারে টুংটাং করতে। আর বই সবসময়ই সাথে থাকে একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে।



কলকাতার মেয়ে ময়ূরী বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসোরীর অধিবাসিনী। ব্যস্ততার পাশাপাশি ভ্রমণ, লেখালেখি, আব্রত্তি, গান ও বই পড়তে ভালবাসেন।



হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে জন্ম ও নিবাস, রমিত দে বর্তমানে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকে সহকারী অ্যাকাউন্টেন্স অফিসার হিসেবে কর্মরত। কিন্তু নেশা তাঁর কবিতা; কবিতা ভালবাসেন, কবিতা নিয়ে বাঁচেন। কলকাতা বইমেলায় এ বছর ‘মারাসিম’ নামে একটি কবিতা-সঙ্গীত প্রকাশও করেছেন। পচন্দ করেন সাহিত্য, চিত্রকলা, সৃষ্টিধর্মী চিন্তাধারা; জনহিতকর কর্মে ব্যাপ্ত মানুষের গুণমুক্ত রমিত মনে করেন সমাজসেবামূলক কাজ সমাজের কাছে ঋণশোধের উপায়।



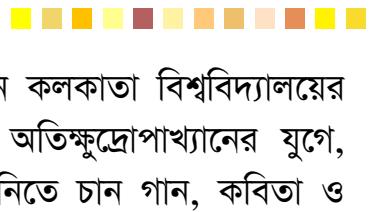
রামপ্রসাদ করের জন্ম ১৯৬৩'তে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার করঞ্জী গ্রামে। বর্তমানে আন্দুল-মৌড়ী অঞ্চলের দুইল্যা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে কর্মরত, ডালহৌসি পাঠ্য। ২০০৪ সাল থেকে তাঁর লেখালেখি শুরু। প্রথম কবিতা বের হয় ‘কলেজস্ট্রীট’ পত্রিকাতে। আরো নানা পত্রিকাতে ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে।



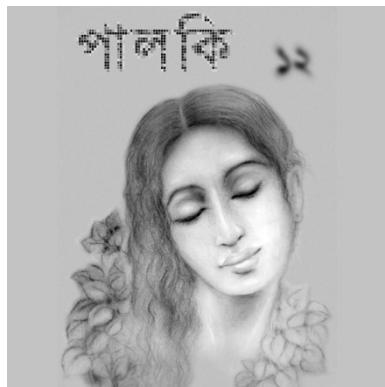
সৈকত গোস্বামী গত বছর কম্প্যুটার সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েশন করে এ বছর কলকাতার IISWBM এ পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে মাস্টার্স করেছেন। ক্লাস শুরুর আগের গ্রীষ্মকালীন অবসর সময়ে কবিতাই তাঁর একমাত্র সঙ্গী। ইতিমধ্যে তাঁর কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও ই-ম্যাগাজিনে। তাঁর প্রিয় কবি রবি ঠাকুর ও জয় গোস্বামী। কবিতা লেখা বা পড়া ছাড়াও তিনি ফেসবুক ও ট্যুইট করতে ভালবাসেন।



শন্মুনাথ কর্মকার একজন সরকারি কর্মচারী, কিন্তু তাঁর আসল পরিচয়, তিনি একজন শখের কবি। তাঁর সাকিন নদীয়া জেলার ফুলিয়ায়।



পালকি ১২



ছবিপ্রকাশে অনিচ্ছুক সর্বজয়া মুখোপাধ্যায় বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের একজন গবেষিকা। বর্তমানের অতিক্ষুদ্রোপাখ্যানের যুগে, তিনি তাঁর সৃজনশীলতার জন্য বিকল্প পথ খুঁজে নিতে চান গান, কবিতা ও ফোটোগ্রাফির মাধ্যমে।



শিবকালী গুণ্ঠ বর্তমানে কম্পিউটার বিজ্ঞানে এম.টেক. সমাপ্ত করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক। একই সাথে তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞানে ডক্টরেটও করছেন।



সুদীপ্ত বিশ্বাসের নেশা হল কবিতা। কবিতা লিখছেন তিনি প্রায় পনের বছর ধরে। দিগন্তপ্রিয় নামের একটি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রকৃতির প্রতিও গভীর আকর্ষণ সুদীপ্ত। ভালবাসেন হিমালয় পর্বত, নর্মদা নদী; উপভোগ করেন রাতের আকাশ। যদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এ. করে তিনি এখন ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত।



সুমন্ত পালের আদি বাড়ি মুর্শিদাবাদ। তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাস্টার্স করেছেন। গত কয়েক বছর ধরে লিটল ম্যাগাজিনে অনুবাদ আর আড়ডাই হল তাঁর জীবনের পরিধি। জীবিকা কেন্দ্রীয় শুল্ক দণ্ডের হলেও এই পরিধির ভরকেন্দ্রে আছে সাহিত্যচর্চা। তিনি নিজে গল্প ও কবিতা লিখতে চান না, কারণ চাকরিবাকরি করে সাহিত্যচর্চার সামান্য বরাদ্দ সময়টুকু অন্য কোন খাতে ব্যয় করতে নারাজ। ভালো লেখক হওয়ার চেয়ে ভালো পাঠক হওয়াই আড়ডাসঙ্গত, ফলতঃ জীবনসঙ্গত মনে করেন। তবুও, ই-পত্রপত্রিকায় মৌলিক প্রয়াসের সূত্রপাত ঘটাতে তিনি উৎসাহী হয়েছেন এক বন্ধুর প্রেরণায়।



স্বাগতাও একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্রী। কলকাতার মেয়ে হলেও তিনি নিজেকে বিশ্বাগরিক হিসাবে দেখতেই পছন্দ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গল্প-কবিতা লেখায় আগ্রহ। স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিনে তাঁর নানা লেখা প্রকাশিতও হয়েছে। নানা লেখকের বইয়ের স্বাদগ্রহণ করতে তিনি আগ্রহী, যেমন উৎসাহী নানারকম খাবারের সাথে এক্সপ্রেশনেট করতেও।



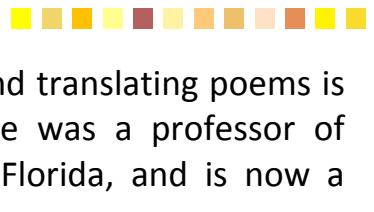
কলকাতার মেয়ে স্বাতী সংসারসমুদ্রে নাও বাইতে কানাডার তীরে এসে তরী বেঁধেছেন। ওই কুলের পিছুডাক তবুও এই কুলে ঢেউ তোলে এখনও; স্কুলে থাকতে যে লেখালিখির হাতেখড়ি হয়েছিল মায়ের কাছে, সেই অভ্যাস এখনও তাই কারণে-অকারণেই কয়েক কলম বাংলা লিখিয়ে নেয় তাঁকে দিয়ে। মন খারাপ হোক কি আনন্দ, স্বাতী লিখতে ভালবাসেন। এমনই কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছে নানা লিটল ম্যাগাজিন ও সোনাবুরি ওয়েবজিনে।



Barnali Saha is a creative writer currently living in Gurgaon, Haryana. Her writings have been featured in The Statesman, The Indian Express, and DNA-ME. She has also written for some leading American E-zines like Pens on Fire and Many Midnights. She recently published her first book, Figments of Imagination. Apart from creative writing, her hobbies include painting and photography.



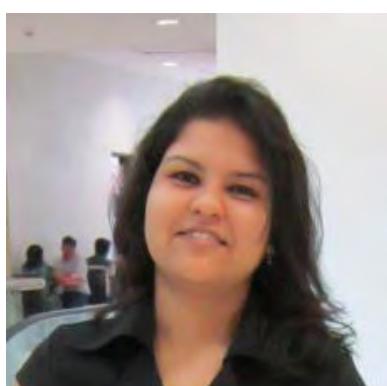
Dr. Ratanlal Basu, a PhD in Economics and resident of Birati, recently retired from the post of Reader in Economics and Teacher-in-charge, Bhairab Ganguly College in Kolkata. He has authored and edited several scholarly books on Economics. His hobbies include Himalayan treks and adventure in dense forests, singing the songs of Rabindranath Tagore, and also writing travelogues and fiction in Bengali and English.



While a mathematician at heart, writing and translating poems is the hobby of Dr. Arunava Mukherjea. He was a professor of mathematics at the University of South Florida, and is now a professor at the University of Texas.



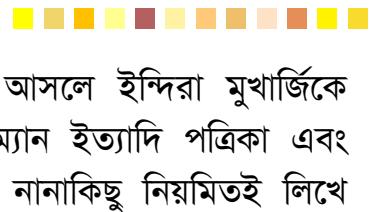
Indrajit Sensarma is an engineer by profession. He considers himself socially unfit, and so spends most of his time by his own, reading books or listening to music. But whenever a like-minded person is around, he never misses the chance to have a chat. For about a year, he has been working in Nigeria, and started enjoying tennis. With a son of eight years, he is leading a happily married life. This is his first venture to express his thoughts in written form instead of spoken.



After earning her B.Tech in Applied Electronics and Instrumentation Engineering from Haldia Institute of Technology, Shoumika Ganguli is now working at Cognizant Technologies. She pursues tennis as a hobby. In addition, she finds time to write poems and articles for various webzines.



এক জীবনে কত রকমের অভিজ্ঞতা হতে পারে, তার চমৎকার উদাহরণ শ্রী অরূপ চৌধুরী। তিনি পেশায় কলকাতায় স্কুলশিক্ষক, কিন্তু অনেকদিনের নেশায় লেখক, ভাস্কর, চিত্রকর, এবং সর্বোপরি পক্ষিতত্ত্ববিদ। তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ঝুলি যেন জাদুকরের টুপি, তিনি হাত ঢুকিয়ে বার করে আনতে পারেন কখনো প্রকৃতি-পশুপক্ষীর কথা, কখনো বা অখ্যাত এবং খ্যাতনামা বহু মানুষজনের কথা।



কলকাতার গৃহবধু, এই পরিচয় দিতে চাইলেও আসলে ইন্দিরা মুখার্জিকে একজন লেখিকা বলাই শ্রেয় হবে। তিনি স্টেটসম্যান ইত্যাদি পত্রিকা এবং নানা ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি নানাকিছু নিয়মিতই লিখে থাকেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘মোর ভাবনারে’ প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। ‘সোনার তরী’ বলে একটি ঝুগও চালান। তিনি আবার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির পোস্ট গ্রাজুয়েটও বটে। এসবের সাথে সাথেই চলে গান, রান্না বা গৃহসজ্জা।



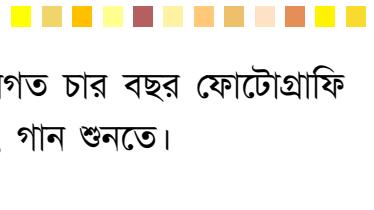
সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় আসানসোলের ছেলে হলেও বর্তমানে রাশিবিজ্ঞান নিয়ে ডক্টরেট করার জন্য কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনসিটিউটে আছেন। ‘নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র’ শুনলেই যে ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠে, সব্যসাচী আসলেই তার সঙ্গে অনেকটা মিলে যান। শান্তশিষ্ট লাজুক এই তরুণ এই প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে কিছু লেখালিখি করা শুরু করলেন। তবে গান্টাও কিন্তু তিনি খারাপ করেন না।



After a career full of experiences at the Indian Air Force, Kumar Som has started taking up writing seriously. He likes writing stories and articles, in both English and Bengali. His work has been published in various magazines.



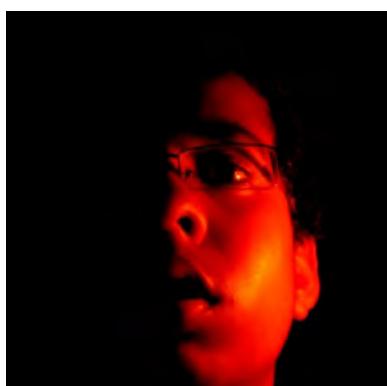
Prabir Ghose is a reputed blogger who found mention in the Limca Book of Records 2007; his blog is ‘Rediscovering India’ at Indiatimes Blogs. He is a Citizen Journalist of Merinews, New Delhi; writes in Bengali under the penname of Kali Kinkar Karmakar; published a Bengali quarterly magazine Naba Nalanda from Nashik; and participated in several Kolkata Book Fairs.



কলকাতা নিবাসী গণিতবিদ্যার গবেষক অভীরুক বিগত চার বছর ফোটোগ্রাফি চর্চা করছেন। এছাড়া পচন্দ করেন সিনেমা দেখতে, গান শুনতে।



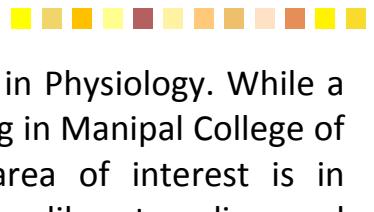
স্বামীর কর্মসূত্রে কলকাতার চিত্রলেখা সরকার অল্প কয়েকমাস ধরে আমেরিকার টেক্সাস প্রবাসী। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. করার পর ফাইন আর্টস-এ ডিপ্লোমাও লাভ করেছেন। তাই বলাই বাহুল্য, তাঁর ছবি আঁকতে ভালো লাগে। ভালোবাসেন গান শুনতেও। পালকির নিয়মিত পাঠিকা শ্রীমতি সরকার এই প্রথমবার আমাদের তাঁর আঁকা ছবি পাঠালেন।



মুখচোরা, লাজুক, কলকাতার ছেলে পাবলো একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। শহরের মানুষ হয়েও প্রকৃতির ছবি তোলা তাঁর নেশা। তেমনই, ইংরাজি মাধ্যমের ছাত্র হয়েও ক্রমে বাংলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ণ হয়েছেন তিনি, অল্পস্থল্পে কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে।



Parthasarathi Mitra spent his childhood and youth in Kolkata, which he likes to refer to as the City of Joy. But he had to eventually move out of his dear city, and currently he is working in the USA, as a software engineer. While away from the office, he indulges in Tagore's poems and songs. Mr. Mitra has written, acted in and directed many plays for various Bengali societies in USA. As with most other compatriots, he finds cricket to be his favorite sport.



Tirthankar Ghosh is an assistant Professor in Physiology. While a resident of Kolkata, he is at present working in Manipal College of Medical Sciences, Pokhara, Nepal. His area of interest is in Occupational ergonomics. As a hobby, he likes traveling and photography.



মুম্বাই-এর টাটা ইন্সিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ থেকে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত সৌরজিৎ পেশাগত ভাবে একজন উদীয়মান বিজ্ঞান-গবেষক, কাজ করেন জৈবপদার্থবিদ্যা বিষয়ে, নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তরভাগে অলবানী-শহরস্থিত নিউ ইয়র্ক রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে। কিন্তু গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে সৌরজিতের নেশা হল নাট্যাভিনয় এবং আবৃত্তি।